ভারতের নারী

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাভূষণ)
প্রণীত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২
১৩৬১

"হে ভগবান্, তুমি চেয়েছ আমাদের বিশ্বাস কি ধরণের তা পরীক্ষা করতে, তোমার কষ্টিপাথরে আমাদের আন্তরিকতা কষে দেখতে। ভগবান্, এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে আমরা যেন উঠে আসতে পারি উন্নততর, শুদ্ধতর হয়ে।"

—শ্রীমা (পণ্ডিচেরী)

প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

"হে ভারত, ভুলিও না! তোমার নারীজাতির আদর্শ—:
সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না তোমার সমাজ—:
বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।"

—বিবেকানন্দ

আসামের একমাত্র পরিবেশক:
বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
কলেজ হোষ্টেল রোড, গৌহাটী।

মুদ্রাকর: শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

হেথা হ'তে কতদূর অজ্ঞাত সে ভূমি,
দেহাতীতা মা আমার, যেথা আছ তুমি
স্নেহময়ী সে' মূরতি করিয়া স্মরণ
ভক্তিতে 'ভারত-নারী' করিনু অর্পণ।

"সংযত হয়ে শান্তভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে খুলে দাও, সে শক্তির কাছে সম্মতি দাও, নিম্ন প্রকৃতির প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান কর।"

—শ্রীঅরবিন্দ

"শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি—কিন্তু যেখানে শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না, সঙ্কীর্ণতা-ক্ষুদ্রতা আসে, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ মনে-প্রাণে প্রেমের স্থান নাই।"

—শ্রীঅরবিন্দ

ভূমিকা

জগদ্ধাত্রী জগদম্বার অর্চ্চনায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ উৎসর্গ-মানসে আর্য্য-কন্যাগণের জন্য 'ভারতের নারী' প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমানকালে শাস্ত্রানুবাদ, আদর্শ ও উচ্চভাব লইয়া অনেক পুস্তক নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট আলোচনা নাই। আমি এই পুস্তকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক অবশ্যপালনীয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং অধুনাপ্রচলিত আচার-ব্যবহারের যথাসম্ভব দোষগুণ আলোচনা করিয়াছি। পরিশেষে ভারতের দশটী আদর্শ নারীর পুণ্যচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনের যে অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সামাজিক ও নৈতিক দুই একটী জটিল প্রবন্ধ লিখিতে ভাষা ও ভাব অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়াছে। আমার ভরসা স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব গৃহলক্ষ্মীকে এই পুস্তক অধ্যয়নে সহায়তা করিবেন।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বঙ্গদেশের বর্ত্তমান মনীষিগণের মধ্যে অনেককে দেখাইয়াছিলাম, তাঁহাদের উৎসাহেই পুস্তকখানি প্রকাশে সাহসী হইলাম।

আমার অন্যতম অগ্রজ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্নাকর মহাশয় প্রবন্ধগুলি সর্ব্বতোভাবে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য জীবনী-সঙ্কলনে সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের যত্ন ও সহানুভূতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ-সমক্ষে বাহির করা অসম্ভব হইত। ইতি—

আড়িয়াদহ
মহালয়া, সন ১৩২৬ সাল। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

মায়ের কৃপায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই মৎপ্রণীত 'ভারতের নারী'র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান নাটক-উপন্যাস-প্লাবিত 'সবুজ সাহিত্যের' যুগে কুলললনা ও গৃহলক্ষ্মীদের নিকট এই ধরণের পুস্তকের আদর যে আজও কমে নাই, তাহা 'ভারতের নারী'র পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। তথাপি ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত নই যে, ইহাতে আমার নিজের কিছু আনন্দ বা কৃতিত্ব নাই। সুদীর্ঘ জীবন-পথের সঙ্কটময় যাত্রার সময়ে একদা যাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নারীসমাজের ঐকান্তিক মঙ্গলের জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছিল, স্বদেশে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য তিনিই করাইয়া লইতেছেন। তাই এ বিশ্বাস আমার আজও আছে যে, এই পুস্তকপাঠে ভবিষ্যৎ নারীসমাজ ভারত নারীর সনাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নারীত্বের হৃত-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে।

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য অনেক দিক্ দিয়া পরিস্ফুট। ইহা ঠিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ নহে। অনেক বিষয় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, আবার বাহুল্যবোধে স্থানে স্থানে বহু অংশ পরিমার্জ্জিতও হইয়াছে, এবং আধুনিক যুগপ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া অনেক নূতন বিষয়ও সংযোজিত করিতে হইয়াছে। 'বিবাহ' ও 'সংসার' প্রবন্ধ দুইটী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'ভারতের নারী-পরিচয়' অধ্যায়ে কতিপয় সতী-সাধ্বী ও প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। 'নারীর আদর্শ' শীর্ষক সুললিত কবিতাটী প্রসিদ্ধ কবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'দীপা' নামক কবিতা-পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে আমাদের কয়েকজন মনীষীর অতীত ও বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই সংস্করণকে সকল দিক্ দিয়া সুন্দর ও শোভন করিয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পরমাত্মীয় ও বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম.-এ. পি.-আর.-এস্, বেদান্ততীর্থ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, বি.-এ, বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমান্ মণিভূষণ বাগ্‌চি মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অযাচিত সাহায্যের জন্য আমি ইহাদের নিকট বিশিষ্টভাবে

কৃতজ্ঞ। ভরসা আছে, পূর্ব্বাপর সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের 'ভারতের নারী' সুধীসমাজ ও কুললক্ষ্মীগণের নিকট অধিক আদর-যত্ন পাইবে। ইতি—

আড়বালিয়া.
২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১ সাল। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সপ্তম সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি এবং দুই একখানি নূতন ছবিও সংযোজিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের গৃহিণীগণের জন্য কবিরাজ আচার্য্য ইন্দুশেখর তর্কাচার্য্য-ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত কতকগুলি টোট্কা ঔষধের তালিকা ও ব্যবহার-বিধি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। গৃহিণীগণ এই সব টোট্কা ঔষধ ব্যবহারে উপস্থিত ক্ষেত্রে সামান্য সামান্য বিপদের হাত হইতে অনেককে রক্ষা করিয়া গৃহস্থের অনেক উপকার সাধন করিতে পারিবেন—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা 'ভারতের নারী'র বর্ত্তমান সংস্করণ গৃহলক্ষ্মীদের নিকট অধিক আদৃত হইবে।

আড়বালিয়া
জন্মাষ্টমী, ১৩৪৫ সাল। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নবম সংস্করণের ভূমিকা

আজকাল কাগজের অভাবে পুস্তকখানির মুদ্রণ ইচ্ছানুরূপ করা যাইতেছে না; এদিকে প্রত্যেক সংস্করণে ইহার কলেবর-বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইতেছে। নানা অসুবিধাসত্ত্বেও এই সংস্করণে সামান্য কয়েকটী নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কলেবর-বৃদ্ধির জন্য মূল্যবৃদ্ধি করা হইল না। আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণ সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিক আদৃত হইবে। ইতি—

বাদুড়বাগান
১৩।১, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা।
লক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৩৫১ সাল। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা

'ভারতের নারী' যে ভারতের নারীত্ব-গৌরব ও তাহার মহিমাকে নূতন করিয়া এ যুগের নারীদিগের নিকট তুলিয়া ধরিয়া তাহাদিগের সম্মুখে একটী আদর্শকে স্থাপনা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে—'ভারতের নারী'র বর্ত্তমান সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশের বহু শিক্ষিতা নারী স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক নানারূপ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। স্থানাভাববশতঃ আমরা সেগুলি আমাদের পুস্তকে পুনর্মুদ্রণ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার না দিতে পারায় দুঃখিত। সম্প্রতি বিখ্যাত 'কেশরী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় মেয়েদের লেখা যে সব ছোট ছোট প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহার কয়েকটী আমরা 'ভারতের নারী'র পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম। আশা করি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের 'ভারতের নারী' সকলের নিকট অধিক আদৃত হইবে।

কলিকাতা
রথযাত্রা, আষাঢ়,
১৩৫৯ সাল। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ষোড়শ সংস্করণের ভূমিকা

এই নূতন সংস্করণটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ বলিলেও চলে, কেবলমাত্র এই সংস্করণে শ্রীমতী সবিতা চৌধুরী বিলিখিত 'গৃহলক্ষ্মী' প্রবন্ধটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হইল। ইতি—

কলিকাতা
দোলযাত্রা, ফাল্গুন,
১৩৬১ সাল। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভারতের নারী

বিষয় সূচী

প্রথম ভাগ

অবতরণিকা ও প্রবন্ধসমূহ

১। ভারতের শিক্ষা-মন্ত্র ... ১
২। ভারতের অবদান ... ২
৩। নারীর আবশ্যকতা ... ৫
৪। নারীর আদর্শ (পদ্য) ... ৬
৫। আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্ম ... ৭
৬। স্ত্রীশিক্ষা ... ৯
৭। বিবাহ ... ১১
৮। সংসার ... ১৯
৯। সংসার-সম্রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য ... ২২
১০। স্বামী-দেবতা ... ২৫
১১। পত্নীত্ব ... ২৭
১২। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য ... ৩০
১৩। ভাসুর ও অন্যান্য পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য ... ৩৩
১৪। প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য ... ৩৭
১৫। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য ... ৩৮
১৬। সন্তান পালন ... ৪০
১৭। সন্তানের শিক্ষা ... ৪৩
১৮। রোগি-পরিচর্য্যা ... ৫০
১৯। স্বাস্থ্য-রক্ষা ... ৫২
২০। আত্মার পবিত্রতা রক্ষা ... ৫৪
২১। রূপ ... ৫৬
২২। সহিষ্ণুতা ... ৫৭
২৩। সংযম ... ৫৮
২৪। সুশৃঙ্খলা ... ৬০
২৫। বিলাসিতা ... ৬২
২৬। অলসতা ... ৬৩
২৭। ক্ষমা ... ৬৪
২৮। স্নেহ-মমতা ... ৬৪
২৯। বিনয় ... ৬৬
৩০। স্বাধীনতা ... ৬৭
৩১। লজ্জা ... ৬৮
৩২। সরলতা ... ৬৯
৩৩। গাম্ভীর্য্য ... ৭১
৩৪। আত্ম-সন্তোষ ... ৭৩
৩৫। অর্থসম্পদের সদ্ব্যবহার ... ৭৮
৩৬। আমোদ-প্রমোদ ... ৭৯
৩৭। একান্নবর্ত্তিতা ... ৮১
৩৮। গৃহ-বিবাদ ... ৮৩
৩৯। দানপ্রার্থীর প্রতি কর্ত্তব্য ... ৮৭
৪০। অতিথিসেবা ও ধর্ম্মকার্য্য ... ৮৮
৪১। ব্রত-নিয়ম-পালন ... ৯১
৪২। সতীত্ব ও সহমরণ ... ৯৩

দ্বিতীয় ভাগ

সতী-কথা

১। সতী ... ৯৯
২। পার্ব্বতী ... ১০২
৩। সাবিত্রী ... ১০৫
৪। অনসূয়া ... ১০৯
৫। অরুন্ধতী ... ১১০
৬। সীতা ... ১১৪
৭। শৈব্যা ... ১১৯
৮। দময়ন্তী ... ১২২
৯। শকুন্তলা ... ১২৭
১০। দ্রৌপদী ... ১৩১
১১। দ্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ ১৪৩
১২। গান্ধারী ... ১৪৬
১৩। চিন্তা ... ১৫১
১৪। বেহুলা ... ১৫৫

তৃতীয় ভাগ

ভারতের নারী-পরিচয় ... ১৬১—১৭৬

চতুর্থ ভাগ

পরিশিষ্ট

১। 'বিবাহ ও পাতিব্রত্য'—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ... ১৭৯
২। 'অরবিন্দের পত্র'—শ্রীঅরবিন্দ ... ১৮০
৩। 'জননী ও জায়া'—সরোজিনী নাইডু ... ১৮৪
৪। 'মা ভৈঃ'—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ... ১৮৫
৫। 'বাবা মেয়ে'—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী .. ১৮৭
৬। 'নারী-মঙ্গল'—শ্রীউষানাথ সেনগুপ্ত ... ১৮৯
৭। 'সমাজে স্ত্রী-সমস্যা'—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ... ১৯২
৮। 'বর্ত্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্ত্তব্য'—অনুরূপা দেবী ... ১৯৮
৯। 'নারীর-স্থান—অতীতে ও বর্ত্তমানে'—প্রবর্ত্তক ... ২০৩
১০। 'ভারতের নারীত্বের আদর্শ'—শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী ... ২০৭
১১। 'বর্ত্তমান যুগে নারীর দায়িত্ব'—শ্রীমালতী ভট্টাচার্য্য ... ২০৯
১২। 'নারী-বন্দনা'—শ্রীমতী সুচারুমঞ্জরী দেবী ... ২১১
১৩। 'নারীর অধিকার'—শ্রীমতী সুষমা সেন ... ২১৩
১৪। 'নারীর আদর্শ'—শ্রীমালতী ভট্টাচার্য্য (মুঙ্গের) ২১৪
১৫। 'গৃহলক্ষ্মী'—সবিতা চৌধুরী ২১৬
১৬। 'নারী-প্রগতি'—শ্রীইন্দিরা দত্তগুপ্ত ... ২১৮
১৭। 'রন্ধনশালায় নারী'—শ্রীমতী গীতারাণী পাল ... ২২০
১৮। 'নারী সমস্যা'—শ্রীমা ... ২২২
১৯। 'ভারতের নারী' (পদ্য) —শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল ... ২২৫
২০। কয়েকটী টোট্‌কা ঔষধ ... ২২৭

ভারতের নারী

(১)

অবতরণিকা

ও

প্রবন্ধ-সমূহ

মঙ্গলাচরণ

"বন্দে মাতরম্"

জয় দুর্গে জগন্মাতঃ প্রণমামি শ্রীচরণে,
ভক্তি দাও পদাম্বুজে জনমে, মরণে, রণে।
শক্তি দে মা শক্তিরূপা অবলারে দে মা বল,
অবলা-কলঙ্ক লয়ে বাঁচিয়া মা নাহি ফল।
আত্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, সমাজের রক্ষা তরে
দেহ, মন, বাহুতে মা বল দেগো দয়া ক'রে।
কৌমারী রূপ সংস্থানে কন্যারূপে সেবাব্রত
পালন করিয়া ধন্য হই যেন মনোমত।
রূপ দাও, স্বাস্থ্য দাও, দাও স্বাস্থ্যরক্ষা-মতি ;
স্বাস্থ্যরক্ষা-উদাসীনা ভারত-নারী-দুর্গতি।
যশ দাও, ভাগ্য দাও, দাও মনোমত বর ;
পতি-মনোমত হ'তে শক্তি দে মা তারপর।
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম পালি' যেন ধন্য হই ;
কখনও ভুলেও যেন পতি-প্রতিকূলা নই।
সন্তান-পালন-শক্তি গণেশজননি দে মা ;
দেশারাতি মারি রণে, সে শকতি দে মা শ্যামা।
জননী জনমভূমি মায়ের অধিক মাতা,
স্বর্গাদপি গরিয়সী— না ভুলি যেন সে কথা।

ভারতের শিক্ষা-মন্ত্র

সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রলয়ের পরবর্ত্তী অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ; একমাত্র স্থিতিকালেই প্রতিভাত হয়,—যেন "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" স্থিতিকালের স্মৃতিও সুস্পষ্ট নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ ও ধ্বংস দুর্জ্ঞেয়। স্থিতিকাল ব্যক্ত হইলেও রহস্যজালে আবৃত।

স্থিতিকালের সত্তা সৃষ্ট-জগতের প্রকৃতি-নিচয়ের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইয়া বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া আপনাকে বহুধা পরিস্ফুরণ করিতেছে। বিশ্ববিমোহিনী প্রকৃতি ও মানবাত্মা—এতদুভয়ের আধারভূতা সত্তারূপে সে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে।

নিখিল প্রকৃতি এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য ভেদ করিয়া, আধারভূতা সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে জানিবার জন্য অনন্ত অবিশ্রাম প্রবাহে, আপনার অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে, গন্ধে এবং শোভায় বিকশিত করিয়া একভাবে আবহমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ অবদান মানব-আত্মাও এই রহস্য-জাল ছিন্ন করিয়া অনন্ত তপস্যা দ্বারা এই সত্তাকে জানিবার জন্য আবহমানকাল ছুটিয়া চলিয়াছে। অমোঘ বীর্য্য, অমিত সাহস এবং অনন্ত তপস্যা দ্বারা ইহাকে পাইতে ব্যর্থকাম হইয়া, নিজের খর্ব্বতা-স্বল্পতা বুঝিতে পারিয়া, মানব-মন অতি দীন আকুলস্বরে বলিতেছে—"অন্তরাত্মা প্রকাশিত হও।"

জ্যোতিঃসম্পদ্ মানব-মনের এই পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনে তুষ্ট হইয়া, পুনঃপুনঃ জনন-মরণের সঞ্চিত বেদনা দূরীভূত করিয়া অন্তরের গভীরতলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বলিতেছেন—"আত্মস্থ হও, আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, আপনার দিক্ হইতে সকলের দিকে ফের।"

মানব-মন পরিপূর্ণভাবে এই নির্দ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাকে ব্রাহ্ম-ভাগবত করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় রত হইল; এবং এইরূপে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ে নিজের চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া আত্মস্থ হইল।

এই কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনাই আমাদের শিক্ষা-মন্ত্র,—আমাদের দীক্ষা-মন্ত্র। আজ আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্রবে আসিয়া আমাদের দেশের সেই সাধনা ভুলিয়া

গিয়াছি। জননীগণ, এই দুর্দ্দিনে আপনারা কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানের সাধনায় আমাদের দেশকে পুনরায় পূত ও ভাগবত করিয়া তুলুন।

ভারতের অবদান

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য আছে, তাহা এখনও মানুষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। সকলেই একটী পৃথিবী, একটী সূর্য ও একটী চন্দ্র ও কতকগুলি গ্রহ-নক্ষত্র দেখিয়াছে। আবার আমাদের এই পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র কতটুকু কাজ করে, তাহাও কেহ এখনও বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নহে। তবে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহার তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল; এরূপ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে, এবং উহাকে নূতন ও প্রাচীন নামে অভিহিত করা গিয়াছে। প্রাচীন ভাগে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কয়টী মহাদেশ। এই এসিয়া মহাদেশেই আবার অনেকগুলি দেশ আছে। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ একটী। এই ভারতবর্ষই আমাদের দেশ।

ভরত রাজার নাম হইতেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'। আমাদের দেশের মত দেশ পৃথিবীতে কোথাও নাই। কোন দেশেই হিমালয়ের মত সুন্দর ও সু-উচ্চ পর্ব্বত নাই; কিম্বা সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, গোদাবরী ও সরস্বতীর মত সুন্দর সুন্দর নদ-নদীও নাই। প্রাকৃতিক দ্রব্যসম্ভারে সম্পত্তিশালী ভারতের মত স্থান কোথাও নাই। ভারতে যাহা নাই, তাহা পৃথিবীর কোথাও নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যায়। এই ইতিহাস-পাঠে আমরা আমাদের দেশের সংস্থান সম্বন্ধে এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও সতী-সাধ্বীগণের সম্বন্ধে সব কথাই জানিতে পারি।

উত্তরে মণিময় পর্ব্বত-রাজ হিমালয় ভারতমাতার মুকুটস্বরূপ বিরাজমান, দক্ষিণে

অনন্তরত্নাকর নীলাম্বু ভারতমহাসাগর তাঁহার চরণ বিধৌত করিতেছে। পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর যেন তাঁহার চরণারবিন্দে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়াছে। মধ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে; সেই মেখলায় যেন তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত উত্তর ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিণাত্য বলে। মনে হয়, প্রকৃতিদেবী নিজের মনের মত করিয়া ভারতমাতাকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী করিয়াছেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস—ভারতীয় সভ্যতার আদিপুরুষ আর্য্যগণ ভারতে পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে প্রথমে বাস করেন। তাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত। সেই হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র নিজ সভ্যতালোক বিকীর্ণ করিলেন। লোক-বৃদ্ধির সহিত সংসার ও সমাজের সুবিধার জন্য তাঁহারা চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মচিন্তা করিতেন এবং সকলের মধ্যে ভগবান্‌কে মূর্ত্ত করিয়া, সকলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া জগৎকে সচ্চিদানন্দের অধিকারী করিতে লাগিলেন, এবং ত্যাগ ও জ্ঞানের বলে দেশকে ভাগবত করিয়া তুলিলেন, তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। সমাজে ইঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মশিক্ষা দান, সকলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন, সমাজের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনা, তপস্যা ও শক্তির নিয়োগ। যাঁহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ বাহু-স্বরূপ, যাঁহারা রাষ্ট্র ও সমাজকে অনার্য্যের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন, যাঁহারা স্ব স্ব বীর্য্য ও জীবন দান করিলেন, দেশ-রক্ষার্থে যাঁহারা ক্ষত্র-সম্পদে দেশকে ধনী করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল ক্ষত্রিয়; যাঁহারা এই আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকস্থিতির জন্য সমাজের পুষ্টিসাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং অর্থ-সম্পদে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল বৈশ্য। আর তিন জাতির কর্ত্তব্যের প্রতিদান করিয়া ভূমানন্দের অধিকারী হইবার জন্য ইঁহাদের সেবায় যাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের নাম হইল শূদ্র। তখন চতুর্ব্বর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের সেবা করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকেও হীন বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

ভারতের নারী

হিন্দুগণই প্রথমে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করেন আর জগৎকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন। ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি-জননী—ত্যাগ-সাধনার পীঠভূমি। ভারতের বিদ্যা, ভারতের সাধনা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ভারতের সতী-ধর্ম্মের কীর্ত্তি-সুক্ত সর্ব্বত্র বিঘোষিত—জয়শ্রীমণ্ডিত। ভারতের রমণী "অজ্ঞান-তমঃ খণ্ডনী, সুক্ত-জননী, ব্রহ্মবাদিনী, ঋষ্যগুল-মণ্ডনী"।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, ধর্ম্মরক্ষা প্রভৃতি কর্ত্তব্য-সাধনের কাহিনী জগতের ইতিহাসে দ্বিতীয় নাই। শ্রীরাম-পত্নী সীতা সতীত্ব-ধর্ম্ম দ্বারা জগৎকে পরিপূত করিয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে বাঁচাইলেন—ভারত ভিন্ন জগতে কে কোথায় এ দৃশ্য দেখিয়াছে? কোন্ দেশে বেহুলা গলিতপ্রায় স্বামীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছে? কোন্ দেশের 'সতী' স্বামি-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন? কোন্ দেশে মূর্ত্তিমতী-সতী 'সতী' নিজের দেহখানি বায়ান্ন খণ্ড করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া সমগ্র দেশকে এক পুণ্য গণ্ডীর ভিতর রাখিয়াছেন—পাছে পাপ স্পর্শ করে! দময়ন্তী, লীলা, চূড়ালা, রন্তিদেবী, দ্রৌপদী, চিন্তা প্রভৃতি রাজকন্যা হইয়াও স্বেচ্ছায় কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন! স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারীদেবী চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। রাজপুতনার বীর রমণীগণের 'জহরব্রতের' কথা, স্মিতবদনে স্বামী ও পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের কাহিনী কে না জানে? বিধাতার আশীর্ব্বাদে, তাঁহাদের পুণ্য-মহিমায় এদেশ সতীর খনি। কতক কালমাহাত্ম্যে, কতক আমাদের শিক্ষার দোষে, এখন সে ভাব বিরল হইলেও সতীর অঙ্গস্পর্শে পুণ্য পীঠস্থানের পবিত্র ধূলি ভাগীরথীর পবিত্র সলিলের মত চিরদিনই সমস্ত কলুষ ধৌত করিতেছে; ধর্ম্মজগতে এবং কর্ম্মজগতে ভারতের অবদান অপূর্ব্ব।

নারীর আবশ্যকতা

বিশ্বসৃষ্টির সকল আদর্শের সারভূতারূপে ভগবান্ নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা জগদ্‌বন্ধনের সমুদয় উপাদান নারী-জাতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্বজগতের বন্ধন; নারীর অন্য নামও প্রকৃতি। বিশ্ব-প্রসবিনী আদ্যাশক্তির অংশরূপে তাঁহাদের জন্ম, সেইজন্য জগৎ স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখে। জগতে সর্ব্বসন্তাপ হরণ করিতে মায়ের ন্যায় কে আছে? মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর হইতে মায়ের জীবিত-কাল পর্য্যন্ত আমরা অশেষ প্রকারে তাঁহার যত্নে রক্ষিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হই। কবির চক্ষে অনেক সময়ে স্ত্রীজাতিকে সৌন্দর্য্যের সারভূতারূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া কেবল তাহার মাধুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; পুষ্পকে বিশ্ববিটপীর বীজরূপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। ক্রোড়ে কমনীয়কান্তি শিশু রমণীর যে শোভা বর্দ্ধন করে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্য তাহার শতাংশের একাংশও বাড়াইতে পারে কি না সন্দেহ! সংসার-জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্যপালনের সহিত তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপযোগিতার তুলনায় শেষোক্তটি একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে নারীই সংসারকে মধুর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। নারীকে কুমারীরূপে পার্ব্বতী, যুবতীরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, মাতৃরূপে জগদম্বা, প্রৌঢ়ারূপে জগৎপালিকা ও বৃদ্ধারূপে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী বলা হয়। রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, অভাবে, অভিযোগে,—মানবের সর্ব্ববিধ অশান্তিতে নারীই একমাত্র শান্তিপ্রদায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভিন্ন ভিন্ন মহিমার কথঞ্চিৎ আলোচনাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

নারীর আদর্শ

"কল্যাণি, তব কল্যাণ হোক,
কল্যাণে পূরো গৃহ;
সকলের তুমি প্রিয় হও,
হোক্ সকলে তোমার প্রিয়।

তব সীমন্ত-শুভসিন্দুর
প্রভাতসূর্য্য-তলে,
সংসার থাক্ শতদল সম
বিকশিয়া শতদলে।

* * * *

ক্ষুধিত তৃষিত তব দ্বার হ'তে
না যেন ফিরে গো ক্ষুণ্ণ,
শান্তোজ্জ্বল ছল-ছল আঁখি
করুণায় থাকে পূর্ণ।
শিশুদের তুমি 'শিশু-সাথী' হও
বধূ সহকর্ম্মিণী,
ননন্দৃ-সখী শ্বশ্রূ-দুহিতা
স্বামী-সহধর্ম্মিণী।
ধৈর্য্যে হও ধরিত্রীসমা
সীতাসমা ত্যাগ-তৃপ্তা,—
প্রলোভীর আগে দাঁড়াইও তুমি
দ্রৌপদীসমা দৃপ্তা।
অশুভ হইতে ফিরাবে স্বামীরে
সাবিত্রীসমা দৃঢ়া,—
বীর্য্যের সাথে আভরণ হ'য়ে
জড়াইয়া থাক ব্রীড়া।"

আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্ম

আজ এই দুর্দ্দিনেও ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভারতের নারী এখনও ধর্ম্মবিচ্যুতা হন নাই। এখনও ভারতের নারী সর্ব্বত্র পূজিতা। ভারতের অধিকাংশ পুরুষ এখনও নারীকে দেবীভাবে পূজা করেন বলিয়াই তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বাসনার বিষয়ীভূত করিতে চাহেন না। পাছে পাপস্পর্শে পুণ্যপ্রতিমা কলুষিত হয় এই ভয়ে স্ত্রীলোকের জন্য নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। অন্য দেশ প্রকৃত নারীপূজা জানে না। যাঁহারা নারীপূজার দাবী করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন, একটু অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাঁহারা নারীপূজার নামে সর্ব্বত্রই নারীত্বের অবমাননা করিতেছে। ভারতের মুনি-ঋষিগণ জগতের আদর্শস্বরূপ নরনারীর আচরণীয় যে সকল নিয়ম শাস্ত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা একবার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—পুরাকালে হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাস্তবিক হিন্দুগণ স্ত্রীজাতিকে যেরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও গৌরবের আসন দিয়াছিলেন, সেরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে এযাবৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীর পাতিব্রত্যের এরূপ গৌরবের বিষয় অন্য জাতি ধারণায়ও আনিতে পারে না।

আমাদের দেশ যে আজ তাহার সেই পুরাতন আদর্শ হইতে পিছাইয়া পড়ে নাই, তাহা বলিতেছি না। এই অধঃপতনের মূল কি, তাহা আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব। কুশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন, গুরুজনে ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরাই তাহাদের স্ত্রীকে বিলাসের পুত্তলি করিয়া তুলে, সেই সঙ্গে দেবীপ্রতিমা বিলাসের সংস্পর্শে কলুষিত হয়। তাহারা দেবীপূজা জানে না; তাহাদের দেবীপূজায় মন্ত্র নাই, তাহারা দেবীপূজায় যে ধূপধুনা জ্বালায়, তাহা হইতে নরকের পূতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে দেবীপ্রতিমা থাকে না; থাকে কেবল তামসিক ভোগের লীলা।

প্রাচীন আদর্শ কি, তাহা অষ্টম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কয়েকটী বচন হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

মনু বলেন :—"যে বংশে রমণীগণের পরম সমাদর বা সম্মান হয়, সে বংশের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন থাকেন আর যেখানে রমণীর আদর নাই, সম্মান নাই, সে বংশের যাগযজ্ঞাদি কার্য্যও নিষ্ফল হয়। যে বংশে দম্পতী পরস্পরের প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট সেখানে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।"

"সাধ্বী স্ত্রী আদরগৌরবে হর্ষোৎফুল্ল থাকিলে সমস্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর স্ত্রীলোকের অবমাননা হইলে সে বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না ; যেখানে গভীর রাত্রে স্ত্রীলোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সে স্থান অচিরাৎ শ্মশানে পরিণত হয়। রমণীগণ অশেষ মঙ্গলের আস্পদ। রমণী গৃহের শোভা, সংসারের লক্ষ্মী। শ্রীতে ও স্ত্রীতে কোন প্রভেদ নাই। যে মূঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোকদিগকে অবমাননা করে, সতী পার্ব্বতী পদে পদে তাহার অমঙ্গল করেন।"

"স্বামী রুষ্ট হইলেও পত্নী সর্ব্বদা হৃষ্টা থাকিবেন, গৃহকর্ম্মে দক্ষা হইবেন, গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং ব্যয়বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিবেন। পতি সদাচারবিহীন, অন্য স্ত্রীতে আসক্ত, বিদ্যাবিহীন হইলেও সাধ্বী-স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিবেন। সাধ্বী-স্ত্রীর সন্তান না হইলেও তিনি স্বর্গে যাইবার অধিকারিণী।"

"স্ত্রীলোক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলে সমাজে নিন্দনীয়া হয়, শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কুষ্ঠাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় ক্লেশ পায়। যিনি সর্ব্বপ্রকারে পতির বশীভূতা থাকেন, তিনি স্বর্গে স্বামীর সঙ্গ প্রাপ্ত হন।

স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে **বিষ্ণু সংহিতার মত :**—"পতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী কোন স্থানে যাওয়া-আসা কিংবা বেশভূষা করিবেন না, গবাক্ষপথে দাঁড়াইবেন না, কোন কার্য্যই স্বামীর আজ্ঞা ব্যতীত করিবেন না।"

শঙ্খ বলেন :—"স্ত্রীলোক, কোন স্থানে যাইতে হইলে, গুরুজনের আদেশ লইয়া যাইবেন, পরপুরুষদের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না।"

বহ্নিপুরাণ বলেন :—"রমণী প্রাতে পতিকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে উঠিবেন। বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া স্নান করিবেন। পরে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে পূজা করিয়া দেবতার প্রণাম করিবেন। তৎপরে রন্ধন করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন এবং অতিথি ও অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া নিজে খাইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য পালন কিংবা সহগমন করিবেন।"

লক্ষ্মী (বিষ্ণুপুরাণে) বলেন :—"যে নারী সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, সত্যভাষিণী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রবতী, দেবতাগণের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জন-তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, ধর্ম্মরতা ও দয়ান্বিতা হয়, আমি তাহাতে বাস করি।"

কৌশল্যাদেবী সীতাদেবীকে বনগমন-সময়ে **বলিয়াছিলেন :**—"বৎসে! যে নারী

প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামীসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সেই-ই ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময়ে সুখভোগ করে এবং বিপদ উপস্থিত হইলে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরাগ বলিয়া অল্প কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থির-চিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন-ভূষণে বশীভূত হয় না, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ দেখাইয়া দিলে অস্বীকার করে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন বলিয়া মনে করেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্ন হউন, তুমি ইঁহাকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।"

স্ত্রী-শিক্ষা

স্ত্রী-শিক্ষা কখনও দোষের নহে, কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অনুরূপ হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান সংস্কারের যুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমাত্র আদর্শ-স্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ জগৎ শিক্ষাকেন্দ্র; মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া একান্ত শিক্ষা-সাপেক্ষ। কতকগুলি পুস্তক পাঠ করা বা সীমাবদ্ধ রীতি-নীতি আলোচনা করাই শিক্ষা শব্দের একমাত্র লক্ষ্যস্থল নহে। যে যে-বিষয়ের উপযুক্ত, তৎসম্বন্ধে তাহার পূর্ণজ্ঞান লাভ করাই শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বিলাসবহুল সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন না করিলে যে তাঁহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে। একজন সুবিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যদি সেক্স্‌পিয়ার বা বাইরনে অনভিজ্ঞ হন, তথাপি তাঁহাকে অশিক্ষিত বলা যাইতে পারে না। সেইরূপ সংসারধর্ম্মে অভিজ্ঞা, সন্তানপালনরতা ও স্বামি সেবাপরায়ণা, সাধ্বী-রমণী নিরক্ষরা হইলেও তাঁহাকে অশিক্ষিতা বলা যায় না। তবে একটি কথা উঠিতে পারে—গ্রন্থাদি পাঠ-ব্যতীত

উক্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে স্ত্রীজাতি স্বাধীনা নহেন; সর্ব্বসময়ে তাঁহারা পুরুষের অনুবর্ত্তিনী; সুতরাং শিক্ষিত চরিত্রবান্ স্বামী সচেষ্ট হইলেই সহজে সে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হইবেন।

আজকাল আমরা দেখিতে পাই, অনেক সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পুরস্ত্রীগণ সংসার-কর্ম্মে নিতান্ত অপটু হইয়া উঠিতেছেন। একদিন পাচক-ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত হইলে স্বামি-পুত্রকে উপবাসী থাকিতে হয়। ইহা কি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় নহে? মনুষ্যের উন্নতি চিরস্থায়ী নহে; চিরদিন পাচক ও দাসদাসীর দ্বারা সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ না-ও হইতে পারে; সে-ক্ষেত্রে সংসার-কার্য্যে অনভিজ্ঞা রমণীর অবস্থা যে কত শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের গৃহিণীগণ কার্য্যনিপুণা না হইলে সংসারধর্ম্ম পালন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে হিন্দুরমণীগণ সহিষ্ণুতার আধার বলিয়াই বর্ত্তমান দুর্দ্দিনেও হিন্দুসমাজ অটুট রহিয়াছে। হিন্দুরমণীগণের সংসারপালন-প্রথা স্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বিস্মিত না হইয়া থাকিতেই পারেন না। আজ যদি আমাদের ব্যবস্থার দোষে, আমাদের রুচির বিকারে, সে-পথ হইতে তাঁহাদিগকে বিচলিত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিবে।

স্ত্রী-শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষাশিক্ষা বা সাহিত্যচর্চ্চা নহে। নারীর কর্ত্তব্য, নারীর আচরণীয় কার্য্যাবলী শিক্ষা করাই স্ত্রীজাতির প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। সংসার-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ শিক্ষিতা একজন নারী আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম্.এ. পাস পুরুষ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। কতিপয় পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষালয়ে যাইয়া তদনুরূপ লিখিয়া আসিতে পারিলেই এম্.এ. পাস করা সম্ভব হয়; কিন্তু সংসারসম্রাজ্ঞী হইতে হইলে বিবাহকাল পর্য্যন্ত সংসারের সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অপরিচিত শ্বশুরকুলে যাইতে হয়। লজ্জা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, স্নেহ, দয়া, সরলতা, ও সতীত্বের সৌন্দর্য্যে আপনাকে বিভূষিত করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে প্রস্তুত হইতে হয়। তবে সংসারের হিসাব-নিকাশ, সদগ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যাদি চর্চ্চা করিতে শিখিবার জন্য যত অধিক জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, ততই সমাজের ও সংসারের মঙ্গল।

বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অক্ষর-পরিচয় প্রায় সকল স্ত্রীলোকেরই হইতেছে; তাহাতে যে সকলেই সুশিক্ষিতা হইতেছেন, এমন কথা বলা যায় না। আবার অক্ষর পরিচয় না থাকিলেও শিক্ষিত হওয়া যায়, একথা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি। পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোকেরই অক্ষর-পরিচয় ছিল না, তথাপি তাঁহারা অনেকেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। জীবনে সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া, মানুষ নানাভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া শিক্ষা লাভ করে। আমাদের মাতৃজাতি, আমাদের মা, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা, দিদিমা,—যাঁহাদের ক্রোড়ে আমরা লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যাঁহাদের মুখে মুখে রামলক্ষ্মণ-কর্ণার্জ্জুনের বীরত্ব-কাহিনী, সীতা-সাবিত্রী-বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের পুণ্য-আখ্যানের কথা শুনিয়া আমাদের মর্ম্মে তাহা গাঁথা হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা দেশের বালকবালিকাদিগের জীবনপথে অমূল্য পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন, সেই মাতৃজাতির অক্ষর-পরিচয় ছিল কিনা সন্দেহ! এক্ষেত্রে আমরা কি তাঁহাদিগকে অশিক্ষিতা বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারি? নিশ্চয়ই না। শিক্ষার পরিচয় হয় ভদ্রব্যবহারে; শিক্ষার সার্থকতা হয় চরিত্র-সাধনে, শিক্ষার পরিপূর্ণতা হয় আদর্শজীবনে। কাহারও অক্ষর-পরিচয় না থাকিলেও যদি তাঁহার চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বাঙ্গীণ, সুনিয়ন্ত্রিত ও কল্যাণদায়ক হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেই আমরা শিক্ষিত বলিব।

বিবাহ

বিবাহ—বর ও কন্যার অপূর্ব্ব প্রাণের সম্বন্ধ, অচ্ছেদ্য প্রেমের বন্ধন। কোন কোন দেশে বিবাহ শুধু চুক্তিমাত্র, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র ধর্ম্মবন্ধন। চুক্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ধর্ম্মবন্ধন অবিনশ্বর। পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ অনন্তকালের সম্বন্ধ। হিন্দু-পত্নী ভাবেন—আজ যিনি আমার পতি, তিনি অনন্তকাল আমার পতি; ইনি

অতীতেও আমার পতি ছিলেন এবং পরকালেও থাকিবেন। পতি ভাবেন, আজ যিনি আমার পত্নী, ইনি জন্মে জন্মে আমার পত্নী।

বিবাহের সময় স্বামী সুপবিত্র বেদের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নি-সাক্ষী করিয়া বলেন :—"তোমার প্রাণের সহিত আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সহিত আমার অস্থি, তোমার মাংসের সহিত আমার মাংস এবং তোমার চর্ম্মের সহিত আমার চর্ম্ম মিশাইয়া লইলাম; মনে, প্রাণে ও দেহে তুমি আর আমি এক হইলাম।"[১] কি পবিত্র মহান্ ভাব!

স্ত্রী বলেন—"ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্" হে ধ্রুব (নক্ষত্র), তুমি যেমন অচল-অটল, আমিও যেন পতির কুলে তেমনি অচল-অটল হইয়া থাকি।

আবার স্বামী বলিতেছেন—"এই যে তোমার হৃদয়, উহা আমার হউক। এই যে আমার হৃদয়, ইহা তোমার হউক।"[২] [অগ্নি সাক্ষী করিয়া] "সত্যরূপ গ্রন্থিবন্ধন দ্বারা আজ তোমার মন ও হৃদয়কে (আমার মন ও হৃদয়ের সহিত) বন্ধন করিলাম।"[৩] "তুমি আমি একপ্রাণ, একমন ও একচিত্ত হইলাম।" "আমার ব্রতে (কর্ম্মে) তোমার হৃদয় নিহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক, তুমি একমনে আমার বাক্য পালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার করিয়া দিউন।"[৪]

(১) প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধানি,
অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসান্, ত্বচা ত্বচম্।

(২) যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥

(৩) বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।

(৪) মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু,
মম চিত্তমনুচিত্তং তেঽস্তু
মম বাচমেকমনা জুষস্ব.
প্রজাপতি ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

পত্নী বলিতেছেন,—"হে অরুন্ধতি! আমি তোমারই মত যেন আমার পতিতে, কায়মনোবাক্যে অবরুদ্ধা হইয়া থাকিতে পারি।"[১]

হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহধর্ম্ম কিরূপ পবিত্র, ধর্ম্মমূলক ও মর্ম্মস্পর্শী, তাহা উপরিলিখিত বিবাহ-মন্ত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিবাহ-মন্ত্র এইরূপ উচ্চভাবপূর্ণ নহে।

ভারতীয় ধর্ম্মে বিবাহিতা নারীর আসন অতি উচ্চে। সাধারণ কথায় লোকে বলে, অমুক ব্যক্তির গৃহিণী নাই, অতএব তার গৃহই নাই। "ন গৃহ গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" গৃহের সাম্রাজ্ঞী গৃহিণী। এই রাজ্যে স্বামীর আধিপত্য নাই, পুরুষের স্বাধীনতা নাই। এই রাজ্যে পত্নী স্বাধীনা, এখানে নারীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব। বিবাহের সময় মন্ত্র বলা হয় "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব, ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী।" অর্থাৎ শ্বশুরের রাজ্যে তুমি সম্যক্‌প্রকারে বিরাজমানা হও, শাশুড়ীর হৃদয়রাজ্য তুমি জয় কর, ননদের উপরেও তোমার স্নেহের রাজ্য বিস্তৃত হউক!

বাহিরের রাজ্যে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র, গৃহের রাজ্যে গৃহিণীর। আমাদের দেশে স্ত্রীবাচক যতগুলি শব্দ আছে, তাহার অধিকাংশই গৃহরক্ষার পক্ষে শৃঙ্খলাযুক্ত অর্থ বহন করে। যথা—সীমন্তিনী, সহধর্ম্মিণী, পত্নী, পাণিগৃহীতা, ভার্য্যা, জায়া, সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা, পুরন্ধ্রী, অন্তঃপুরচারিণী, সুচরিত্রা, গৃহিণী, নারী ইত্যাদি।

প্রথমতঃ, চারিবর্ণের ব্যবস্থা দ্বারা সমগ্র জাতিতে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের ব্যবস্থা দ্বারা মানবজীবনের ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা-স্থাপন সহজ হইয়াছে। এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিলে মানব সমুন্নত, সমৃদ্ধ ও কর্ম্মে মহীয়ান্ হইতে পারে।

জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পালনে জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হইলে দ্বিতীয় ভাগে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। জীবনের দ্বিতীয় ভাগে কেহই অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি এই,—"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্ত

---

(১) "অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি।" মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী নক্ষত্রলোকে অবস্থিতা। সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটী নক্ষত্রের অতি নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ইহাই অরুন্ধতী। এই দুইটী নক্ষত্রকে যুগ্মতারকা (double star) বলা হয়।

ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।" কোন মানবই আশ্রমহীন হইয়া থাকিবে না। সকল মানবকেই অধিকারক্রমে উক্ত চারি আশ্রমের যে-কোনও আশ্রমে থাকিতে হইবে। অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোক চিত্তস্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যলাভ করিতে সক্ষম হয় না। শুদ্ধ-চরিত্রের হইলেও অনেক সময় অনেকে তাঁহাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গার্হস্থ্য আশ্রম (বিবাহ) করিতেই হইবে। জার্ম্মাণী প্রভৃতি ইউরোপের কতক দেশে সেই কারণেই এখন আইন প্রণয়ন করিয়া, শাস্তির ভয় দেখাইয়া নর ও নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হইতেছে। কোনও কোনও দেশে সহস্র সহস্র যুবক-যুবতীর বিবাহের ভার স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট বহন করিতেছেন। উদ্দেশ্য—সামাজে শৃঙ্খলা-স্থাপন।

পুরুষের পক্ষে বিবাহ যেমন অপরিহার্য্য, নারীর পক্ষেও বিবাহ তেমনি অপরিহার্য্য। সংসারে পণ্ডিত ব্যক্তি, নারী এবং লতা আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না।[১] আশ্রয় ভিন্ন উহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় না। গুণী বা ধনীর নজরে না পড়িলে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য বিকশিত হয় না। বৃক্ষ বা অপর কোনও অবলম্বন না থাকিলে লতার জীবন যেমন চলিতে পারে না, তেমনি বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের আশ্রয়ে না থাকিলে নারীর নারীত্ব ফুটিয়া উঠে না।[২] অতএব, সংসারে স্বামীর আশ্রয় স্ত্রী, স্ত্রীর আশ্রয় স্বামী।

কেহ কেহ বলেন—বিবাহে স্বামীর যেমন অধিকার, স্ত্রীরও তেমনি অধিকার, অর্থাৎ বর যেমন কন্যাকে বিবাহ করে, কন্যাও সেইরূপ বরকে বিবাহ করে। কিন্তু হিন্দুর চিন্তাধারার ইহা অতি আধুনিক, অথচ ইহা বৈদেশিক অনুকরণ। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, বিবাহের বর স্বয়ং কর্ত্তা, কন্যা কর্ম্ম এবং সম্প্রদানকারী কন্যাদাতা। সম্প্রদাতা হইতে বর কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কারলেন। পাত্রী পাত্র কর্ত্তৃক গৃহীতা হইলেন এই কারণেই পত্নী পাণিগৃহীতা; পাশ্চাত্ত্য দেশেও বরই কন্যার বিবাহকর্ত্তা কারণ

(১) "বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠেন্তুঃ পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।"

(২) পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

বিবাহের পরেই পাত্রীর উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়া পতির উপাধিতে পরিণত হয়। গতকল্য যিনি ছিলেন মিস্ এমেলিয়া (Miss Emelia), অদ্য তিনি মিসেস্ টমসন্ (Mrs. Thompson)। আমাদের দেশেও গতকল্য যিনি ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয়া, বিবাহের পর তিনি হইলেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয়া; গতকল্য যিনি ছিলেন মিস্ রায়, (Miss Roy), আজ তিনি মিসেস মজুমদার (Mrs. Mazumder)। অতএব দেখা যাইতেছে সকল দেশেই পত্নীর আশ্রয় পতি।

এরূপ পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও, আমাদের দেশের নারীর মর্য্যাদার তুলনা হয় না। হিন্দুর যে কার্য্যে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না, সে কার্য্য বিফল; যে কার্য্যে নারী সম্মানিতা হন, সেই কার্য্যে দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়।[১]

আমাদের দেশে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা; কিন্তু মা পিতা অপেক্ষাও গরীয়সী, যেহেতু তিনি গর্ভে ধারণ করেন ও পালন করেন।[২] মাতার স্নেহের তুলনা নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর একমাত্র গুরু পতি। পুত্রের পক্ষে মাতাপিতা মহাগুরু, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীই মহাগুরু, স্বামীই সর্ব্বস্ব। আবার স্বামীর পক্ষেও স্ত্রী শ্রেষ্ঠতম সখা এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূল।[৩] মহাকবি কালিদাসের উক্তিতে গৃহিণী মন্ত্রণাদানে মন্ত্রী, পরস্পর অবস্থান সময়ে প্রিয়তমা সখী, ললিতকলাতে প্রিয়শিষ্যা।[৪]

পতি-পত্নীর প্রধান লক্ষণ এই যে, সদৃশ পতি সদৃশী পত্নী গ্রহণ করিবেন। পতি হইবেন অবিপ্লুত ব্রহ্মচারী, অর্থাৎ যাঁহার ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয় নাই, যিনি আজ পর্য্যন্ত কখনও অসংযমের পরিচয় দেন নাই। আর পত্নী হইবেন কুমারী অর্থাৎ অপুরুষপৃষ্টা

---

(১) যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ (মনু)

(২) "গর্ভধারণপোষাভ্যাং তাভ্যাম্মাতা গরীয়সী।"
"পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।"

(৩) অর্দ্ধাং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য যঃ সভার্য্যঃ সবন্ধুমান্॥

(৪) গৃহিণীঃ সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্য ললিতো কলাবিধৌ।

কোনও কোনও দেশে কচিৎ দেখা যায়, পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা অনেক বেশী; কিন্তু আমাদের দেশে বর ও কন্যার বয়স নিয়মিত আছে। পাত্র চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিবে, তারপর বিবাহ করিবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন—তেইশ বৎসর তিন মাসের পরেই গর্ভাবস্থানের নয়মাস সহ চব্বিশ বৎসর ধরিতে হয়। কন্যার বয়স নানা রকম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বয়সই ঋষিদের অভিপ্রেত। "অত উর্দ্ধং রজস্বলা" এই বাক্যদ্বারা রজস্বলা কন্যার বিবাহ নিন্দিত হইয়াছে। যৌবন-বিবাহের বিষময় ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশ জর্জ্জরিত ও অনুতপ্ত। কালস্রোতে আমাদের দেশেও সেই বিষ সংক্রামিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই আট প্রকার বিবাহ। তন্মধ্যে রাক্ষস-বিবাহে বা পৈশাচিক বিবাহে বয়সের বিচার নাই, কালাকাল জ্ঞান নাই, পাত্রপাত্রীর সাদৃশ্য দেখা হয় না। ইহাতে যথেচ্ছ আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার মাত্র পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই ধর্ম্মের দেশে, পুণ্যের দেশে ঋষিশাসিত এই ভারতবর্ষে অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই বর্ত্তমান কালের উপযোগী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়া আসিতেছে। পিশাচের ন্যায় মতিগতি যাহাদের তাহাদের দ্বারাই পৈশাচিক বিবাহ সংঘটিত হয়।

অধুনা যাঁহারা উন্নত ও শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করেন, সেই সকল সমাজে পণের টাকার দাবীতে কন্যার বিবাহ 'কন্যাদায়' রূপে বিভীষিকাময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু বাদ-প্রতিবাদে জনহিতকর নানা সভার অনুষ্ঠানে পণপ্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে বটে, কিন্তু অতি দ্রুত ইহার সমূল উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়—সংস্কারের ছলে হিন্দুসমাজের নানা দিক্ হইতে নানা রকমের বিপ্লব ঘটিতেছে; কিন্তু প্রকৃত গলদ যেখানে তাহার তো কোন প্রতিকার হইতেছে না। পবিত্র কল্যাণপ্রদ বিবাহব্যাপারে ঘরে বাহিরে উৎপীড়ন! তথাপি আমরা যেন ইহাকে মনে প্রাণে চিরকাল পবিত্রই মনে করি।

সংসার

সংসার বলিতে আমরা দুইটী অর্থ বুঝি ; প্রথম অর্থ—গৃহ, দ্বিতীয় অর্থ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। গৃহ শব্দের প্রধান তাৎপর্য্য যে গৃহিণী, ইহা আমরা 'বিবাহ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। সংসার বলিতেই যে গৃহকে বুঝায়, তাহার একটু ব্যাপক অর্থও আছে। অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র পরিবারই সংসার।

বিবাহের পর পতি ও পত্নীর যে 'ঘরকন্না' আরম্ভ হয়, তাহাতেই সংসারের সূত্রপাত হয়। যে সংসারে ভার্য্যা দ্বারা ভর্ত্তা সন্তুষ্ট, ভর্ত্তা দ্বারা ভার্য্যা সন্তুষ্ট, সেই সংসার কল্যাণের মন্দির, সুখের আলয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যসমূহ যথাযথ প্রতিপালিত হইলে সংসার স্বর্গের ন্যায় সুখের স্থান হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রের বিধিপ্রণয়নের উদ্দেশ্য সামাজিক ও জাগতিক কল্যাণ-সাধন। সেই শৃঙ্খলাবন্ধনের দিক্ দিয়া বুঝাইতে হইলে সংসারকে বলিতে হয় গার্হস্থ্য আশ্রম। এই 'আশ্রম' শব্দটির উল্লেখে হিন্দুর মনে স্বভাবতঃই একটী পবিত্র ভাব জাগিয়া উঠে। এই সংসারের সকল কার্য্যই যেন পবিত্রভাবে সম্পন্ন হয়, ইহাই সংসারী লোকের কামনা।

সংসারাশ্রমে প্রবেশের পর পুত্রকন্যার মুখদর্শন ধর্ম্মের অঙ্গ। পুত্র ইহকালের অবলম্বন এবং পরকালের সহায়। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু জন্মান্তর বিশ্বাস করে, কাজেই পুত্রের নিকট হইতে পিণ্ডপ্রাপ্তির ভরসা রাখে।[১]

সংসারে যাবতীয় কাজই সন্তোষের সহিত অতিশয় সংযতভাবে সম্পন্ন করিতে হয়—তবেই সুখ, তবেই সংসারীর আনন্দ। অসন্তোষের সহিত অসংযত অবস্থায় দিন যাপন করিলেই পরম দুঃখ।[২]

আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক সংস্কার জন্মিয়াছে ;—তাঁহারা বিবাহ বা সংসার করিতে ইচ্ছুক নন। তাঁহারা পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা সম্বন্ধে

(১) পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্।

(২) সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষঃ সুখমূলং হি দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

অজুহাত দেন। আর্য্যধর্ম্মের আদর্শ—সুখ ভোগে নহে, সুখ সংযমে ; শান্তি—ঐশ্বর্য্যের ভোগ লালসায় নহে, ত্যাগে ; ধর্ম্মলাভ—সুরম্য হর্ম্ম্যে নয়, সুপবিত্র কুটীরে, অর্থাৎ আশ্রমে।

সংসারাশ্রম অতি কঠোর। এখানে সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা সকলই কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। সংসারী মানব পাঁচটী ঋণের ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিনটী প্রধান। ব্রত-পার্ব্বণ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা ও উপবাসাদির দ্বারা দেবঋণ পরিশোধ হয়। নিজের যে বিদ্যাটী ভালরূপ আয়ত্ত আছে, সেই বিদ্যা অপরকে দান করিলে ঋষিঋণ শোধ হয় ; কোন বিদ্যা না থাকিলে ধনী ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার উৎকর্ষের নিমিত্ত ধনদান দ্বারাও ঋষিঋণ শোধ হয়।[১] পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ শোধ হয় ; এই পুত্র পিতৃপিতামহের তৃপ্তিসাধন করিবে, অসম্পূর্ণ পিতৃকার্য্য সম্পূর্ণ করিবে, তর্পণ করিবে।[২]

উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, অসদাচারী, পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন পুত্র পিতামাতার বা সমাজের কাহারও তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। এরূপ স্থলে একাধিক পুত্র প্রয়োজন।[৩] সৎপুত্র কুলের ভূষণ। সৎপুত্র দ্বারা পিতৃপুরুষ তৃপ্ত হন, বংশ সমুজ্জ্বল হয়। এইরূপ পুত্রই মাতাপিতার সুখের কারণ।

অধুনা কাল-প্রভাবে এবং বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ধনী, মানী, গুণী অথচ সম্পত্তিশালী গৃহস্থ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানের পিতা হইতে অনিচ্ছুক এবং তাহাদের পত্নীগণও সন্তানের জননী হইতে নারাজ। অবশ্য এই শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। কতক নারী সন্তানের জননী হইতে পছন্দ করেন না। তাঁহারা ভোগ বা বিদেশের ঘৃণ্য অনুকরণ পছন্দ করেন।

(১) পঞ্চঋণ—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নরঋণ, ভূতঋণ। সাংসারিকগণের প্রত্যহ পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চঋণের শোধ হয়।

(২) "পুৎ" নামে একটী নরক আছে। মৃত্যুর পর পিতার সেই নরকে পতনের সম্ভাবনা থাকে। পুত্র যথাবিধি পিতৃকার্য্য করিলে পিতার সেই অধোগতি হয় না। পুৎ + ত্রৈ ধাতু + ড = পুত্র।

(৩) এষ্টব্যা বহবাঃ পুত্রাঃ যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেচ্চৈবাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥

পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত নিঃস্ব ব্যক্তির গৃহে প্রার্থনার অতিরিক্ত পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নাই তবু আশাতীত সন্তান। অশিক্ষিত মাতাপিতার দীন-দরিদ্র সহস্র সন্তানে দেশ পরিপূর্ণ হইবে, আর শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তির একটী সন্তানও দেশোজ্জ্বল করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিবে না! ইহাই কি সংসারাশ্রমের উদ্দেশ্য বা বিধাতার অভিপ্রেত?

যৌথ পরিবারের সকলেই একান্নবর্ত্তী থাকায় সংসারের বন্ধন দৃঢ় দেখা যায়, আর যেখানে শুধু স্বামী ও স্ত্রীকে লইয়া সংসার, সেইখানে ব্যষ্টিগত সুখ-শান্তি থাকিলেও সমষ্টির সুখ নাই, গোষ্ঠীর আনন্দ নাই; আছে শুধু বেকার-সমস্যার, তীব্র হাহাকার, সমস্যা-সমাধানের ব্যর্থ আন্দোলন।

হিন্দু গৃহস্থের পরিজনবর্গ গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গো, গয়া ও গদাধর এই ছয়টী বিষয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখিলে সংসারাশ্রমের মধুর ফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। গঙ্গা বলিতে ভারতবর্ষের পবিত্রসলিলা নদীর প্রতি শ্রদ্ধা। গীতা—সর্ব্ব বেদ-বেদান্তের সার,—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গায়ত্রী অর্থে সন্ধ্যা-উপাসনা, ফল আত্মশুদ্ধি, মনঃস্থিরতা। গো—সপ্ত মাতার এক মাতা। গয়া বলিতে যে কোনও তীর্থে বিশ্বাস। গদাধর অর্থে ভগবানে বিশ্বাস, আস্তিকতা। সংসারী ব্যক্তির প্রথম কর্ত্তব্য—রক্ষা,—মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, স্ত্রী ও আত্মরক্ষা, পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা।

সংসার শব্দের দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় হইলে পরে সেই বিরাট্ সংসারের সন্ধান লইতে হয়। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" যাঁহারা উদার চরিত্র, তাঁহাদের নিকট মাতা পার্ব্বতী দেবী, পিতা স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর, সংসারে যত সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাঁহারাই বান্ধব এবং তিন ভুবনই সংসার (বা স্বদেশ) রূপে সম্মানিত হয়।[১]

আজকাল নীতিবাদীদিগের চক্ষে আপন স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান স্বার্থপরতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। পরসেবা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মহান্ আদর্শের

(১) মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

অনুসরণে লোকচক্ষে সংসার-পালন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও যে সংসারের মহাব্রতেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। সৃষ্টির সহায়তার জন্যই মানব-সৃষ্টি, একথা স্বীকার করিলে যে-কোন প্রকারে—স্বীয় পুত্রকন্যা রূপেই হউক, অথবা যে-কোন রূপেই হউক—জগৎ পালন করাই ভগবৎ উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানব ভগবদ্দত্ত শক্তি লইয়াই সংসারকার্য্য করিয়া থাকে। তিনি যাহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, সে সেই প্রকার কার্য্যই করিবে। সুতরাং যে পোষ্যগণ পূর্ণ-মুখাপেক্ষী, সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

সংসার-সম্রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য

আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনে সাংসারিক কার্য্যের বিধি-ব্যবস্থা একমাত্র স্ত্রীজাতির উপর নির্ভর করে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সকল সংসারেই গৃহিণীপনা করা একটী সাম্রাজ্যপালনের দায়িত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক নববধূ তাঁহার কিশোর জীবনেই উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিতা হন। পৃথিবীর সাম্রাজ্য পালন করিবার জন্য সকল দেশে সকলেই যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট্ অথবা সম্রাজ্ঞীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং সেই অভিষিক্তকে তাঁহাদিগের ভাবী সুখ-দুঃখের বিধাতা বলিয়া মনে করেন, হিন্দুগণও সেইরূপ বিবাহ-উৎসবরূপ অভিষেকে নববধূকে সংসারের ভাবী কর্ত্রীরূপে পরমাগ্রহে বরণ করিয়া গৃহে লয়েন। যেমন রাজ্যের অধিবাসিগণ তাঁহাদের অভিষিক্তা সম্রাজ্ঞীর অভিষেককালীন সামান্য আচরণ হইতেই তাঁহার ভাবী কর্ত্তব্যপালনের বিষয় স্থির করিয়া লয়েন, সেইরূপ নববধূ বালিকা অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যখন শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করেন ও যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে থাকেন, তাঁহার সেই কয়দিনের সামান্য সামান্য আচার-ব্যবহার দেখিয়া গৃহস্থগণ তাঁহার ভাবী গৃহিণীপনার বিষয় বুঝিতে

পারেন। সম্রাজ্ঞীর যেমন নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-কৌতুক বিসর্জ্জন দিয়া আশ্রিত প্রজাগণের উন্নতি ও সুখবিধান করা একমাত্র কর্ত্তব্য, সংসার-সম্রাজ্ঞীরও সেইরূপ নিজের সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়া একমনে সমগ্র পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন, অনুগত অভ্যাগত, সকলেরই তৃপ্তিসাধন করা একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংসারের লোক কেবলমাত্র নববধূর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন না, তাঁহার আচরণ, কথাবার্ত্তা, চালচলন, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও বিরক্ত হন। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহাকে যে পথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই তাঁহার সে বিষয়ে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষালাভ করা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পিতৃগৃহে অবস্থানকাল হইতে সংসারের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির গৃহকর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গীণ নিপুণতা লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ, আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত গৃহকর্ম্মে অনভ্যস্ত থাকিলে এবং আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাইলে চলে না, বিবাহান্তে সংসারের গুরুভার-বহনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা পিতৃগৃহে পূজনীয়গণের নিকট হইতেই বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হয়। শ্বশুরগৃহে শাশুড়ী প্রভৃতি পূজনীয়াগণের নিকট হইতে সমুদয় শিক্ষালাভ করিবেন সেরূপ সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সকলের না ঘটিতে পারে; শাশুড়ীশূন্য বা কর্ত্রীহীন গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে পারে; সুতরাং পিতৃগৃহ হইতেই এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করা সকলেরই উচিত।

প্রত্যেক বালিকারই জ্ঞানবিকাশের পর হইতে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেমন সংসারের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করা উচিত সেইরূপ বিবাহের পরও সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করা উচিত। নববধূ ভাবিবেন, "বিবাহের সময়ে সকলে যেমন বড় আশায় হাসিমুখে আমাকে বরণ করিয়া লইবেন, আমার আচরণে তাঁহাদের সে হাসি যেন জীবনে না ফুরায়; যে আশায় আমাকে সংসারে বরণ করিবেন, আমার অসদাচরণে তাঁহাদের সে আশা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়। শ্বশুরগৃহে আগমন করিলে যখন সকলে মুখ দেখিবার জন্য আসে, তখন আমার যেমন মনে হয়, আমার এ মুখখানি যেন সকলের নিকটেই সুন্দর হয়, সেইরূপ আমার সমগ্র জীবনে আমার মুখ, আমার আচরণ, আমার স্মৃতি যাহাতে সকলের নিকট তুল্য তৃপ্তিপ্রদ থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে হইবে। পাঁচটী লইয়া সংসার; সংসারের পাঁচজন পাঁচরকমের হইতে পারে; তাহাদের আদর্শ

লইয়াই আমার জীবন গঠন করিলে চলিবে না। অপরের আচরণ বা ব্যবহার যেরূপই হউক না কেন আমার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য আমায় পালন করিতেই হইবে।"

সংসার অনুসারে সংসারের কাজের ব্যবস্থা নানারূপ হইলেও আমরা সংসারের মোটামুটী কয়েকটী কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিতেছি :—

প্রত্যূষে অন্যান্য পরিজনবর্গের উঠিবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সংসারের পূজনীয় বা পূজনীয়াগণ যেন কোনক্রমেই তোমাকে সূর্য্যোদয়ের পরে নিদ্রিতা দেখিবার অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনাদি মার্জ্জনান্তে স্নান করিয়া শ্বশ্রূ বা গৃহকর্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার আদেশমত রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে ও বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সহিত রন্ধন-কার্য্যাদি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। আহারকালে সকলকে যথাযোগ্যরূপে পরিবেশন ও ভোজনান্তে তাঁহাদের আবশ্যকমত দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য শেষ করিবে; সর্ব্বশেষে নিজে আহার করা কর্ত্তব্য। আহারান্তে গৃহের দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া শ্বশ্রূমাতা ও গুরুজনদের প্রীতির জন্য সেবা দ্বারা তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবে এবং তাঁহাদিগের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিবে; অথবা তাঁহাদের নিকট বসিয়া সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য। মোটের উপর সংসারের সমুদয় লোক তোমার কাছে যাহা আশা করেন, তোমার সাধ্যমত তাঁহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সংসারের সমুদয় সুখ-শান্তি নিজের সুখ-শান্তি বলিয়া মনে করিও। বিশেষতঃ আশ্রিত ও অনুগতগণ তোমার ব্যবহারে যেন মনঃকষ্ট না পান। আদর্শ গৃহিণী হইতে হইলে পরিশ্রম-কাতরা হইলে চলিবে না; পরিশ্রম না করিয়া কে কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? তোমার যখন আবার পুত্রবধূ হইবে, সংসার সম্বন্ধে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া, তাঁহারই হাতে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, তোমার শাশুড়ীর ন্যায় তুমিও নিশ্চিন্ত মনে পরিণত বয়সে ভগবদারাধনা করিতে পারিবে।

স্বামী-দেবতা

হিন্দুরমণীর ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও গতি স্বামী। স্বামীই রমণীর সর্ব্বময় দেবতা, একথা আর্য্যসভ্যতার আদিযুগ হইতে নানা ভাবে, নানা স্থলে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গ-পরিহাসমূলক গ্রন্থাদিতেও ভূয়োভূয়ঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অদ্যাপি হিন্দুমাত্রেই তাঁহাদের স্ব স্ব কন্যা, কনিষ্ঠা ভগিনী ও অন্যান্য বয়ঃকনিষ্ঠা প্রতিপাল্যাগণকে একথা শতাধিকবার বলেন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের এ প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন কেন? তাহার উত্তরে আমরা এই বলি—প্রাচীন যুগে কুশাগ্রমতি আর্য্যঋষিগণ অনেক গ্রন্থে মূলসূত্র মাত্র রচনা করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কালবিপর্য্যয়ে আমাদের এত অল্পমেধা যে, ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত এখন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না বা নিজে নিজে বুঝিতে গিয়া কদর্থ করিয়া বসি। এস্থলেও "স্বামী সর্ব্বময় দেবতা" এই মূলসূত্রের টীকার প্রয়োজন হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতে মানব-শিশুর সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করা যায়, তাহা প্রকৃতিগত ধর্ম্মানুসারে আমরণ তাহার চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়। আদিযুগে আর্য্যগণ সর্ব্বদা দেবভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যহ দেবতার সান্নিধ্য লাভ করিতেন, তখন দেবতা ও মানবে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। কিন্তু কালধর্ম্মে দেবতা ও মানবের মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান আসিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ দেবতাকে যে চক্ষে দেখিতেন, বা দেবতা সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ধারণা ছিল, তাহা বর্ত্তমানকালের হিন্দুগণের ধারণা হইতে অনেক ভিন্ন। অধুনা দেবতা ও ভগবানের নাম উচ্চারণে মানব-মনে যে ভাবের উদয় হয়, পূর্ব্বযুগে সে ভাবের উদ্দীপনা হইত না। ইহার কারণ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কালে কালে আমরা দেব-চরিত্র ও দেব-আদর্শ হইতে এত পিছাইয়া পড়িয়াছি যে, দেবতার নামে আমাদের প্রীতি ও আনন্দের পরিবর্ত্তে ভীতি ও কুণ্ঠার উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং সরলচিত্তা অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাগণকে দেবতা কথাটার অর্থ সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে। কারণ, আজকাল যে অর্থে ও আদর্শে 'দেবতা' শব্দ ব্যবহৃত হয়, 'স্বামী দেবতাস্বরূপ' একথা

বলিলে বালিকার মনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও ঐকান্তিক প্রীতির পরিবর্ত্তে অজানিত শঙ্কা ও অপরিসীম কুণ্ঠার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

দেবতা শব্দের তাৎপর্য্য—যিনি জীবনে মরণে একমাত্র সহায়; বিপদে সম্পদে একমাত্র অবলম্বন, পার্থিব সর্ব্বকার্য্যে একমাত্র শুভকামী; যিনি আশীর্ব্বাদ করিতে জানেন, অভিশাপ করিতে জানেন না, যিনি সর্ব্বসঙ্কোচ, সর্ব্বপাপ দূর করিয়া চিত্তকে নির্ম্মল করেন; যিনি আমাদের নিতান্ত আপনার; যিনি আমাদের কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না; যিনি আমাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্তিমার্গের প্রদর্শক ও ক্রীড়ামার্গের সঙ্গী; যিনি আমাদের অন্তরে-বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তিনিই দেবতা; তাঁহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু নাই, লজ্জার কিছু নাই, সঙ্কোচের কিছু নাই। আমরা বিপথে গমন করিলে তিনি বারণ করেন ও আমাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দেন; বিপদে পড়িলে বুকে টানিয়া লন; ডাকিলে বা না ডাকিলে তাঁহার পবিত্র বাহুর দ্বারা সর্ব্বদা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। তিনি একাধারে আমাদের গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও ক্রীড়ার সাথী: এমন আত্মীয়, এমন স্বজন, এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জগতে আমাদের আর কেহ নাই; আমরা দোষ করিলে তিনি রোষ করেন না, অপরাধ করিলে তিনি আমাদিগকে পায়ে ঠেলেন না; এরূপ দেবতাই হিন্দুরমণীর স্বামী। এ দেবতা শুধু পূজা-পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া নিষ্ক্রিয় থাকেন না, ত্রুটি-অপরাধ ধরিতে ব্যস্ত থাকেন না, এ দেবতা শুধু ধ্যানের দেবতা নহেন। অভাবে-অভিযোগে, শুভে ও অশুভে, কর্ম্মে ও অকর্ম্মে ইনি আমাদের নিত্যসঙ্গী, নিত্যসহায়!

পত্নীত্ব

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে হিন্দুরমণীর স্বামী-দেবতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে তাঁহার পূজার মন্ত্র ও সেবার বিধি অর্থাৎ তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয় কিছু বলিব। তৎপূর্ব্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ-নির্ণয় আবশ্যক। এক কথায় সংসার-জীবনে—শুধু সংসার-জীবনে কেন—ধর্ম্মজীবনে, ইহকাল ও পরকালে সকল অবস্থায় এবং সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের যে অচ্ছেদ্য ও অবিনশ্বর চিরসম্বন্ধ ইহাই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি হইতে রাধা অন্তর্হিতা হইলে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না। আবার কৃষ্ণশূন্য রাধার অস্তিত্বও নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও পরস্পরে এরূপ অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্ম সম্বন্ধ; সুতরাং স্বামী যদি দেবতা হন, পত্নীও দেবী। অতএব পূজা-পদ্ধতি শুধু সেব্য-সেবিকা ভাব লইয়া নহে; ইহার মধ্যে আনন্দ ও প্রীতির বিকাশ থাকা চাই। মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই, তুমি যেমন স্বামীর নিষ্ঠাবতী সেবিকা, সেইরূপ তুল্যরূপে তাঁহার আনন্দ ও প্রীতির পাত্রী। ইহা কতকটা অধ্যাত্ম উচ্চভাবের কথা হইল। এক্ষণে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার-জীবনের কার্য্যাবলী লইয়া আলোচনা করা যাউক। কুমারী অবস্থায় 'সৎস্বামী' লাভের জন্য শিব-পূজার বিধি আছে। আমাদের মনে হয় উহা 'সৎস্বামী' লাভের জন্য নয়—'সুপত্নীত্ব' লাভের জন্যই উপাসনা। মা পার্ব্বতী যেমন শৈলশিখরে একাত্মমনে উপাসনায় সর্ব্বত্যাগী জটাবল্কলধারী শিবকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া সুপত্নীত্বের চরমাদর্শ দেখাইয়াছেন সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দু-কুমারী 'স্বামী যেরূপ অবস্থাপন্ন হউন না, তাঁহাকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার তুষ্টিবিধানে যত্নবতী হইয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার সহিত মিলিত থাকেন'—কুমারীর শিবব্রতের ইহাই চরম লক্ষ্য।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জন্ম-জন্মান্তরে একই স্বামী ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট পত্নীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুর শিক্ষার এমনই উৎকর্ষতা যে, স্বামী যেরূপই হউন না কেন, পত্নীর নিকট তিনি বরেণ্য হইবেনই। সুতরাং স্বামী ভাল হউন কিংবা মন্দ হউন, কুমারীর এ চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। শুভদৃষ্টির পবিত্র মুহূর্ত্ত হইতে স্বামীর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা রাখাই হিন্দুরমণীর একমাত্র কাম্য।

বাসর-ঘর হইতে স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনের প্রথম সূত্রপাত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাসর-ঘরে পরিহাস-কৌতুক চলিয়া আসিতেছে; তাই বলিয়া সে কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহিতা বালিকার কর্ত্তব্য নহে। সম্পূর্ণরূপে প্রগল্‌ভতা বর্জ্জন করিয়া সে কৌতুক লক্ষ্য করিতে হইবে। অনেকক্ষেত্রে এমন হয়, প্রথম মিলনে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে নানা কথা শুনিবার বাসনা করেন। কিন্তু স্ত্রী যদি প্রগল্‌ভা বা লজ্জাহীনার ন্যায় অসঙ্কোচে তাঁহার সব কথার উত্তর দান করে, সেটাও কিন্তু স্বামীর নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না। সুতরাং লজ্জা ও ধীরতার সহিত তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করাই যুক্তিযুক্ত।

পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রথম আগমনে নববধূর সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই স্বামীর আরাধ্য দেবী শ্বশ্রূমাতার অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসারের গৃহিণীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদন আবশ্যক; কারণ, তাঁহাদের মুখে পত্নীর সুখ্যাতি শুনিলে স্বামীর আনন্দ হইবে সন্দেহ নাই। নববধূ শ্বশুরগৃহের সকলের সন্তোষ বিধান করিতে সকল সময়েই ব্যস্ত থাকিবেন। কথাবার্ত্তা, চালচলন এবং কার্য্য-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিনীত ও ভদ্রভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; স্বীয় স্বার্থের কোন গন্ধ থাকিবে না। সর্ব্বস্থলেই মনে রাখিতে হইবে—পরিজনবর্গের শান্তিতে আমার শান্তি তাহাদের সুখেই আমার সুখ।

নূতন বিবাহের পর উপহারাদি-প্রদান বর্ত্তমানে একটী প্রথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। স্বামীর অবস্থা সচ্ছল বা অসচ্ছল হউক, নিজের জন্য কোন দিন কোন জিনিস মুখ ফুটিয়া চাহিতে নাই। তিনি নিজে হাতে করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে যাহা দিবেন, আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। সকলেরই স্বামী যে অবস্থাপন্ন হইবেন তাহা আশা করা যায় না। যদি অদৃষ্টচক্রে স্বামী দরিদ্র হন, সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার দরিদ্রতার অংশ গ্রহণ করাই পত্নীর প্রধান কর্ত্তব্য; ধনী পত্নীও যেন বিলাসিতায় মগ্ন না হন। স্বামী বিদ্বান, চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক হইলে পত্নীর আনন্দের কথা সন্দেহ নাই; স্বামী যদি চরিত্রহীন ও 'বদ্‌রাগী' হন তাহাকেও পত্নীর ভয়ের কিছুই নাই; তখন একমাত্র অবলম্বন—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করা নববধূর কর্ত্তব্য নহে। যত্ন, আদর, সেবা ও শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহার মনকে এমন বশীভূত করিতে হইবে, যেন

তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার মন বিষয়ান্তরে উৎক্ষিপ্ত হইবার অবসর না পায়। দুই একদিনে সাফল্য-লাভ না-ও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। দীর্ঘ সাধনায় সফলতা-লাভ অবশ্যম্ভাবী। স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা কোন দিন জিজ্ঞাসা করিবে না; শুনিবার আকাঙ্ক্ষাও যেন কোন দিন না হয়। কেহ যদি তাঁহার পরিচয় দিতে আসে, তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বামী যে-কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে কোনক্রমে তাঁহার সহিত তর্ক করিবে না। নীরবে তাঁহার ঈপ্সিত কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবে। পরে রাগ পড়িলে, মিষ্ট কথায় –তাঁহার যদি ভ্রম হইয়া থাকে—বুঝাইয়া দিবে।

কোন্ কোন্ বস্তু স্বামীর প্রিয়, কোন্ কোন্ খাদ্য স্বামীর বাঞ্ছিত, দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে তাহা কৌশলে জানিয়া লইবে। যে-কোন কার্য্য আদেশের পূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায়মত সম্পন্ন করিলে স্বামী অতিশয় আনন্দিত হইবেন। দৈনিক কার্য্যশেষে শ্রান্তদেহে স্বামী গৃহে আসিলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করার ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে যদি সংসারের কেহ অসন্তুষ্ট হন বা কিছু বলেন, নীরবে তাহা সহ্য করিবে। যতক্ষণ তিনি সুস্থতা অনুভব না করেন, ততক্ষণ কার্য্যান্তরে গমন করিবে না। গৃহ হইতে যখন স্বামী বহির্গত হইবেন তখন তাঁহার আবশ্যক জিনিষ-পত্র যথাযথ গুছাইয়া দিবে এবং কোন দ্রব্য লইতে ভুলিয়া গেলেন কিনা তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

কদাচ স্বামীর কোন অন্যায় কার্য্যের বিষয় সঙ্গিনী বা অপর কাহারও সহিত আলোচনা করিবে না। যদি কেহ তোমার সাক্ষাতে তোমার স্বামীর নিন্দা করে, স্বামী প্রকৃত দোষী হইলেও প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিতা হইও না। নিন্দাকারী যদি গুরুজন হন সেখান হইতে সরিয়া যাইবে; সাংসারিক কার্য্যের চিন্তা হইতে স্বামীকে যতদূর সম্ভব অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিবে। ক্লান্ত অবস্থায় অথবা বিবাদগ্রস্ত অবস্থায় কদাচ কোন দুঃসংবাদ বা অপ্রিয় কথা তাঁহাকে শুনাইবে না। স্বামীর প্রতি তোমার যে দৈনন্দিন কাজ তাহা চাকর-চাকরাণী বা অন্য কাহারও উপর ভার না দিয়া যতদূর সম্ভব নিজ-হাতে সম্পন্ন করিবে। সম্ভব হইলে স্বামীর আহারের পূর্ব্বে কদাচ আহার করিবে না এবং যতদূর সম্ভব গুরুজনের অসাক্ষাতে তাহা সম্পন্ন

করিবে। স্বামী যতক্ষণ নিদ্রিত না হন, শরীর সুস্থ থাকিলে ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে না, তাঁহার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর পদধূলি গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের সমুদয় আয়োজন করিয়া দিবে। আবশ্যক গৃহকর্ম্ম এবং স্বামীর প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন না করিয়া কোনরূপ আমোদ বা উৎসবে যোগদান করিবে না; বিশেষ আবশ্যক হইলে তাঁহার অনুমতি লইবে, এবং যত সত্বর পার প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে। সন্তানাদি হইলে তাহাদের লালন-পালনের মধ্যে স্বামিসেবাটুকু যেন ডুবিয়া না যায়। স্বামীর সর্ব্বকার্য্যে পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করা সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীর আদেশসত্ত্বেও কদাচ লজ্জাহীনতার কোন কার্য্য করিবে না। এক কথায় স্বামীর চরিত্র, মনোভাব ও প্রকৃতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনের চেষ্টা করিতে পারিলেই জগতের সর্ব্বজনপ্রশংসিত পত্নী হওয়া যায়।

শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

কুমারী-জীবনের পর স্বামীগৃহে আগমন স্ত্রী-জীবনে একটী সম্পূর্ণ নূতন অঙ্ক। বহু যুগ-যুগান্তর হইতে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় বর্ত্তমানে অনেকটা সহজ ও সরল হইয়া আসিয়াছে; তথাপি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এ একটী বড় গুরুতর সমস্যা। সংসার জ্ঞানানভিজ্ঞা, সরলচিত্তা বালিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত এবং বহু বিষয়ে পিত্রালয় হইতে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন প্রথাযুক্ত পরিবারের মধ্যে আসিয়া অত্যল্প দিনের মধ্যে পরমাত্মীয়-পরিজনে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন, তাহা চিন্তা করিলেও চক্ষে জল আসে। উক্ত বিষয়ে হিন্দুজাতির মধ্যে এমন সহজ সমাবেশ দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রীভগবানের যে অনন্ত করুণা আছে, তাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। জানি না প্রজাপতির কোন্ শুভ আশীর্ব্বাদে

এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ় হয়, যেখানে অন্যদেশে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর 'পূর্ব্ব-পরিচয়' সত্ত্বেও মিলনভঙ্গের আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। অবশ্য আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, এদেশে স্ত্রীমাত্রেই স্বয়ং-সিদ্ধা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সংসার-জীবনে অশেষবিধ গুণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ দেওয়া ও পন্থা নির্দ্দেশ করা বিশেষ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ প্রবন্ধে আমরা নারীজাতির পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

বধূ প্রথম শ্বশুরগৃহে আসিবার পূর্ব্বে প্রায়ই শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার সুযোগ পান না। সুতরাং রূপে ও লাবণ্যে তাঁহার মনঃপূত হওয়া নববধূর পরম ভাগ্য। আজও পাড়াগাঁয় এমন দেখা যায়, বধূ কুরূপা হইলে শাশুড়ী মঙ্গলাচরণ ও হুলুধ্বনি ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতেও কুণ্ঠিতা হন না। অথচ সেজন্য নববধূর কোন অপরাধই নাই। কারণ, দেহ বা রূপ ভগবদ্দত্ত, আত্মকৃত নহে। যাহা হউক সেক্ষেত্রে বালিকাকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, শাশুড়ীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ধীর ও করুণ ভাবে তাঁহার পদধূলি লইতে হইবে ও এমন ভঙ্গীতে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে হইবে এবং সুযোগ হইলে এমন কাতরতার সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন তাঁহার স্ত্রীসুলভ করুণ হৃদয় গলিয়া যায়। প্রথমবারে যে কয়দিন শ্বশুর গৃহে বাস করিতে হইবে, সে কয়দিন যতদূর সম্ভব শাশুড়ীর কাছে থাকিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি মনের ক্ষোভে তিনি কোন কটুকথা কহিয়া ফেলেন, না কাঁদিয়া অথচ বিশেষ কাতর হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী থাকিবে; কদাচ অন্যত্র চলিয়া যাইবে না। এই অল্পকাল মধ্যে যতদূর সম্ভব তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইয়া সেই মত চলিতে চেষ্টা করিবে। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রিয়কার্য্যগুলি অনুষ্ঠান করিয়া ও অপ্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পার, সে বিষয়ের সূত্রপাত প্রথম যাত্রায় করিয়া আসিবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ 'আত্মীয়তা'কে বড় ভালবাসেন; সুতরাং সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্বক্ষণ সেই 'আত্মীয়তা' যতদূর দেখাইতে পার, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এ সময়ে নববধূর সর্ব্বদাই মেয়েদের মধ্যে থাকিতে হয়, সুতরাং

শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ অবসর হয় না। সাক্ষাৎ হইলে কন্যার ন্যায়, অথচ লজ্জার সহিত আলাপাদি করিবে।

পিত্রালয়ে আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত গৃহের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিতে বিস্মৃত হইও না। তাঁহাদের কোন অপ্রিয় আচরণের কথা পিত্রালয়ে আসিয়া, এমন কি পিতামাতার নিকটও প্রকাশ করিবে না।

প্রথম ঘর-সংসার করিতে গিয়া বহু পরিচিতা-কন্যার ন্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া যতদূর সম্ভব প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতার সহিত তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে। শাশুড়ীর হাতের কাজ তাঁহার নিষেধ-সত্ত্বেও হাসিমুখে সর্ব্বদা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং তাঁহার দৈহিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যথাসময়ে জলখাবার গুছাইয়া দেওয়া, বিছানা পাতিয়া দেওয়া, কাপড় কাচিয়া দেওয়া এবং শুকাইয়া তাহা যথাস্থানে রাখা, তাঁহার পূজাদির আয়োজন করিয়া এবং দেওয়া অবসরমত কাছে বসিয়া তাঁহার হাত-পা টিপিয়া দেওয়া ও রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া শুনান—ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য যত্নের সহিত সম্পন্ন করিবে। যাহাতে তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া সেই কার্য্য করিতে পার, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিবে। এইরূপ শ্বশুর মহাশয়েরও আবশ্যক কার্য্যাদি যথানিয়মে সম্পন্ন করিবে।

আমাদের সমাজে আজও 'বউকাঁটকি' অপবাদ শাশুড়ীদিগের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের মনে হয় স্ত্রীর প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ ও শাশুড়ীর প্রতি বধূর আংশিক উপেক্ষা তাহার একমাত্র কারণ। আজকাল দেখা যায়—অনেক স্থলে মাতাপিতা জীবিত থাকিতেও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইয়া অর্জ্জিত অর্থ স্ত্রীর নিকট রাখিতে কুণ্ঠিত হন না এবং স্ত্রীও সেটাকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন এবং একটু 'দেমাকে'র সহিত তাহা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে মাতা বিশেষ শিক্ষিতা বা উন্নতচরিত্রা না হইলে পুত্র ও পুত্রবধূর এ আচরণ সহ্য করা সহজ নহে। সুতরাং স্বামী তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ তোমার নিকট রাখিতে আসিলেও, তিনি যাহাতে উহা তাঁহার মাতাপিতার কাছে রাখেন, সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। তবে যদি তাঁহারা স্বেচ্ছায় তোমার নিকট রাখিবার অনুমতি করেন

তুমি রাখিবে। কিন্তু কদাচ উহা নিজ সম্পত্তি বলিয়া মনে করিও না। দ্বিতীয়তঃ, নিজের জন্য কোন দ্রব্য তাঁহাদের অগোচরে বা অনুমতি না লইয়া ক্রয় করিবে না। যত দিন তাঁহারা জীবিত থাকেন তাঁহাদিগের অভাব সর্ব্বাগ্রে পূরণ করিয়া তবে নিজের অভাব দূর করিবে। বৃদ্ধবয়সে স্বভাবতঃ লোকে লোভপরবশ হইয়া পড়েন; সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের রুচিকর খাদ্যের আয়োজনে যত্নবতী হইবে। সংসারে অন্যান্য পরিজনের খুঁটিনাটি দোষক্রটির কথা কদাচ তাঁহাদের কাণে তুলিও না। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে শয়ন করিও না। প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাব ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের। অতএব তাঁহাদের স্বভাবে যদি কোন অস্বাভাবিক ভাব থাকে, সে বিষয়ে কথনও প্রতিবাদ করিবে না। বধূরূপে সর্ব্বদা কন্যার ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করিবে এবং তুমি যে তাঁহাদের একান্ত আশ্রিতা এবং তোমার কিছুই স্বাতন্ত্র্য নাই, এভাব যেন তোমা হইতে লুপ্ত না হয়। তোমার যেমন কন্যা-স্নেহ তাঁহাদের নিকট প্রার্থনীয়, তাঁহাদের প্রতি তোমার ভক্তি তদনুরূপ হওয়া উচিত। তাঁহারা শুধু তোমার পূজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপূজ্য স্বামীরও পরমপূজনীয়—এই জ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবে।

ভাসুর ও অন্যান্য পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে কয়েকটী কুপ্রথা দেখা যায়। কবে এবং কিরূপে এ সব প্রথা আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব না। এ সব প্রথার দোষগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব মাত্র।

ভাসুর এক্ষণে পূজ্যপাদ পিতার স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অস্পৃশ্য অনাত্মীয়রূপে পরিণত হইয়াছেন। যিনি ভ্রাতৃবধূকে মাতৃসম্বোধন করেন, তাঁহার ছায়াস্পর্শ এখন কলঙ্ক ও পাপের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না—কোন্ যুক্তি ও ভিত্তির উপর

এ প্রথা স্থাপিত। এই প্রথা ভ্রাতৃবধূকে ভাসুরের কন্যা-স্নেহ হইতে দূরে রাখে বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুরাণ ও পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান প্রথার কোন সূত্রই পাওয়া না। আমাদের মনে হয়—ভাসুরের প্রতি কন্যোচিত সভক্তি ব্যবহার প্রদর্শন করাই ভ্রাতৃবধূর কর্ত্তব্য।

শ্বশুর ও ভাসুর পিতৃতুল্য হইলেও উভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। শ্বশুর বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানবৎসল ও ক্ষমাশীল; পুত্রবধূর যে-কোন অপরাধ, যে-কোন ত্রুটি তিনি সহজেই ক্ষমা করিতে পারেন এবং পুত্রবাৎসল্যে বধূমাতার কোন অন্যায় ব্যবহার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ভাসুর পিতৃতুল্য হইলেও কনিষ্ঠের উপর সর্ব্বদা অগ্রজত্বের দাবী রাখেন; অনুজ তাঁহার প্রতিপাল্য হইলেও তাহার পালনে তাঁহার একটু শ্লাঘা আছে; সুতরাং কনিষ্ঠের ত্রুটি তাঁহার একটু অভিমান জাগাইয়া দিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যদি কোন কারণে তাঁহার অপ্রিয়া হন বা মনোব্যথা দেন, তাঁহার আর ক্ষোভের স্থান থাকে না। যিনি কনিষ্ঠকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া, লালন-পালন করিয়াছেন, যিনি বড় আদরে মাতৃসম্বোধনে ভ্রাতৃবধূকে ঘরে আনিয়াছেন, আজ যদি সেই ভ্রাতৃবধূ তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করে, তবে তাঁহার দুঃখের সীমা থাকে না। মনে হয় হিন্দুসমাজ এই মনঃপীড়ার ভয়ে ভীত হইয়াই ভ্রাতৃবধূকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যাহা হউক এই প্রথা যেন আমাদের প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র মনঃকষ্টের কারণ না হয়, এরূপভাবে চলিতে হইবে। ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কখন কথান্তর বা মতান্তর হয়, সে সম্বন্ধে কোন কথাই কহিবে না; সাংসারিক কার্য্যে বিরক্ত হইয়া যদি তিনি কোন রূঢ় কথা বলেন অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিবে, কোন প্রতিবাদ করিবে না। তাঁহার পরম যত্নের, পরম স্নেহের কনিষ্ঠ তোমার সংস্রবে আসিয়া পর হইয়া যাইতেছেন, এ কলঙ্ক কোন দিন যেন তোমায় স্পর্শ করিতে না পারে। আদর বা আব্দার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত না হইলেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সেবা করিতে যত্নবতী হইবে।

অধুনা গৃহস্থ সমাজে ভাজ ও দেবরের সহিত যেরূপ ব্যবহার ও আচরণ চলিতেছে তাহাও বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যে জাতির আদর্শ সীতা ও লক্ষ্মণ, সে জাতির

ভিতর প্রচলিত প্রথা কিরূপে সম্ভবে? দেবর সন্তানস্থানীয়—সর্ব্ববিধ সন্তানস্নেহ তাহার প্রাপ্য, তাহার সহিত রহস্যালাপ কোনরূপে যুক্তিযুক্ত ও ভদ্রতাসিদ্ধ হইতে পারে না। দেবর বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত বধূ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত স্বাধীন আলাপ না করাই ভাল; করিতে হইলেও তাহা বিশেষ সাবধানতা ও শিষ্টাচারের সহিত হওয়াই উচিত। তাই বলিয়া তাঁহার দূরবর্ত্তিনী থাকাও কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বদা সন্তানবোধে যত্ন ও স্নেহ করা কর্ত্তব্য। দেবর শিশু হইলে পুত্রবৎ তাহাকে সর্ব্বদা লালন-পালন করিবে।

ননদিনীগণ সাধারণতঃ একটু অভিমানিনী হইয়া থাকেন, সুতরাং ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হইলেও তাঁহাদিগকে একটু সম্মান করাও উচিত। এ ভাব কখনও দেখাইও না যে, তাঁহাদের ভ্রাতা তোমার একান্ত অনুগত হইয়াছেন। অন্যবিধ রহস্যালাপ তাঁহাদিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাদের সম্মুখে বলা উচিত নহে। তাঁহাদের বেশবিন্যাস বিষয়ে সর্ব্বদা সহায়তা করিবে এবং সখীভাবে আনন্দে রত থাকিবে। কোন গুরুজনের দোষত্রুটি সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবে না। শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাদিগকে পিতৃগৃহে আনিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবে এবং গৃহে আনিয়া মাতৃস্নেহে স্বর্গগতা জননীর দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। ক্রিয়া-কর্ম্ম বা পূজা-পার্ব্বণাদি উপলক্ষে তাঁহাদিগের যথাসম্ভব তত্ত্বতাবাসাদি করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবে। মাতৃবিয়োগের সহিত তাঁহাদের পিত্রালয়ের সম্বন্ধ যেন ঘুচিয়া না যায়। দুর্ভাগ্যবশে যদি কোন ননদিনী বিধবা হইয়া তোমার স্বামীর প্রতিপাল্যা হন, সর্ব্বদা প্রাণপণ যত্নে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবে এবং সাংসারিক সমুদয় কার্য্যে তাঁহাকে অভিভাবিকা ও গৃহিণীর স্থান দিবে এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে স্বীয় পুত্র-কন্যা-নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও পালন করিবে। সন্তানহীনা হইলে, নিজের একটী শিশু-সন্তানকে তাঁহার অনুগত করিয়া দিয়া তাঁহার সন্তানের অভাব ও মনঃক্ষোভ দূর করিবে। সংসার-খরচের অর্থাদি তাঁহার হাতে থাকাই ভাল; তাহাতে তাঁহার মনে অনেকটা শান্তি থাকিতে পারে। তিনি গলগ্রহস্বরূপ—এ ভাব যেন কখনও মনে না আসে।

সংসারের দাসদাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুত্র-কন্যা বা ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিবে। তাহারা যে তোমার 'হুকুমের চাকর' এ ভাবটি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিও না। পরিবারস্থ পরিজনের ন্যায় গণ্য করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালন করিবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সদ্ব্যবহারে দাসদাসী পরমাত্মীয়রূপে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের দৈহিক ও মানসিক সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আহার-কালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবে। তাহাদের সাধারণ ভোজ্যপানীয় তোমাদের হইতে যেন স্বতন্ত্র না হয়, কারণ তা'রাও মানুষ, তা'রাও তোমাদের সন্তান। বিপদে, সম্পদে তাহাদিগকে স্বগৃহে যাইতে দিবে। নিজের কষ্ট হইলেও সংসার-জীবনের সুখ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। উৎসবাদিতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে নব বস্ত্রাদি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন দেখা করিতে আসিলে তাহাদের সম্মান করিয়া ইহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিবে। তাহাদের সামান্য দোষত্রুটিতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার বাসনা যেন তোমার মনে না জাগে।

সর্ব্বোপরি পারিবারিক জীবনে একটী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে পদে পদে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা। বর্ত্তমানকালে পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে মন্থরার অভাব নাই। ইহারা নানা ছলে সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হইয়া তোমার হিতকারিণীরূপে দেখা দিবে। হঠাৎ ইহাদিগকে চিনিতে পারিবে না! তবে এইটুকু যেন সর্ব্বদা তোমার মনে থাকে যে, শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, স্বামী, দেবর ইত্যাদি যত অপ্রিয়কারীই হউক না কেন, জগতে তাঁহাদের মত আপনার জন তোমার আর কেহ নাই; তাঁহাদের ন্যায় আপনার কেহ আর থাকিতে পারে না। সুতরাং উহাদিগের বিরুদ্ধাচারিণী কোন প্রিয়বাদিনীর মিষ্ট মিষ্ট কথায় কখনও কর্ণপাত করিবে না। একবার প্রশ্রয় দিলে ইহারা তোমাকে এমন মোহিত করিয়া ফেলিবে যে, তোমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে না। সংসারে শান্তিস্থাপন উহাদের উদ্দেশ্য নহে, সংসারে অশান্তি-বীজ বপনই উহাদের জীবনের ব্রত। ঘরের কোন কথা উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না। উহারা ঘুণাক্ষরেও কোন কথা জানিতে পারিলে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। তোমার সুখ হোক্, দুঃখ হোক্, তাহা যেন আত্মীয়ের নিকট

থাকিয়াই পাইতে পার এরূপ করিবে, কখনও অনাত্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষিণীর নিকট কোন সুখের আশা করিও না। আমাদের সমাজে যত সংসার ভাঙ্গে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার মূলে একটী না একটী মন্থরা আছেই আছে, এবং যাঁহারা তাহার মন্ত্রণায় ভুলিয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহাদিগকে যত্ন করিবে না—অযত্নও করিবে না। ইহারা প্রশ্রয় না পাইলে আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য

প্রতিবাসী গৃহস্থের নিকটতম বন্ধু। আকস্মিক আপদ-বিপদে প্রতিব সর্ব্বপ্রথম অযাচিতভাবে মিত্ররূপে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বতোভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু উহাদের সহিত সদ্ভাব না থাকিলে মিত্রতার পরিবর্ত্তে শত্রুতাই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই মানবের সাধারণ ধর্ম্ম এবং ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। সুতরাং ব্যবহার-দোষে যাহাতে অসন্তোষ উৎপন্ন না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। প্রতিবেশীর আমোদ-উৎসবে সহযোগিতা, বিপদে সাহায্য, শোকে সহানুভূতি-প্রকাশ এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকার করিলেই তাহারা একান্ত আপনার হইয়া উঠে। প্রতিবাসী নীচ, সজ্জন, ধনী বা দরিদ্র হউক না কেন, তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করা উচিত। প্রতিবাসীর দ্বারা কখনও কখনও ক্ষতি হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর হইলে তাহাদের কৃত সামান্য সামান্য ক্ষতি সহ্য করিয়া ক্ষমা করিতে পারিলে তাহাদের সেই শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয়। আর এক কথা, পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় যত অধিক শত্রু সৃষ্টি হয়, এত আর কিছুতেই হয় না। প্রবাদ আছে—"বোবার শত্রু নাই।" এই পরচর্চ্চার আগ্রহটা পুরুষদের অপেক্ষা রমণী-সমাজেই অধিক লক্ষ্য করা যায়। স্নানের ঘাটে, বন্ধুবান্ধবগৃহের নিমন্ত্রণে বা অন্য কোন কারণে দুই চারিজন সমবেত হইলেই এইরূপ

চর্চ্চা চলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত আছে, তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারে না। অনেক স্থলে এমন দেখা গিয়াছে যে এইরূপ সামান্য ব্যাপার হইতেই মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়া উভয় সংসারকেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় না, তাঁহারা যদি পরচর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন, তবে এই সব অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া পড়ে না। যে সব গৃহস্থের প্রতিবাসীর সহিত সদ্ভাব থাকে না, তাঁহারা ধনী হইলেও কখনও শান্তিতে বাস করিতে পারেন না। শত্রু-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের সুখলাভ সুদূরপরাহত। গৃহলক্ষ্মীগণ রসনা সংযত রাখিয়া প্রতিবাসীর সহিত সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিতে পারিলেই সংসারের বন্ধুবল বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহারা যদি স্বীয় দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবাসিনীর সহিত সহজ অনাড়ম্বরভাবে মেলামেশা করেন এবং তাহাদের মধ্যে দুঃস্থগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কার্পণ্য প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে প্রতিবাসীর দ্বারাই ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাইবেন।

দেশের প্রতি কর্ত্তব্য

মানব মাতৃগর্ভ হইতে যে দেশের মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং যাহার অন্নজলে পরিপুষ্ট হয়, সেই মাতৃ বা মা জন্মভূমির নিকট সে সর্ব্বতোভাবে ঋণী। এই ঋণমুক্ত হইবার জন্য দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। কারণ—কতকগুলি ব্যক্তি লইয়া একটী পরিবার, কতকগুলি পরিবার-সমবায়ে একটী সমাজ, কতিপয় সমাজ লইয়া একটী গ্রাম এবং গ্রাম-সমুদয়ে দেশ সীমাবদ্ধ। সুতরাং দেশের সহিত প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পরিজন-বর্গের প্রতিপালনেই কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করা ভুল। গ্রাম, সমাজ, দেশ ইহাদের প্রত্যেকের নিকট কোন না কোন প্রকারে সাহায্য না পাইলে আমাদের জীবনধারণ

পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিত। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আমরা যে ঋণী, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। এখন এই ঋণ কি প্রকারে শোধ হইতে পারে তাহাই আলোচ্য। আমরা যেমন নিজেদের ও পরিজনবর্গের কায়িক, বাচিক, আর্থিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত্নবান্ হইয়া থাকি, তেমনি স্বসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এইরূপে সম্ভবপরমত সামাজিক উন্নতির পরে গ্রামের উন্নতিবিধানে মনোযোগ দিতে হইবে এবং তাহার পরে উহা সম্প্রসারিত করিয়া দেশের উন্নয়ন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য যাহার যেমন শিক্ষা-দীক্ষা ও শক্তি-সামর্থ্য, তিনি সেইভাবেই করিবেন। 'আমি ক্ষুদ্র, আমি অসহায়, আমি মূর্খ, আমি অবলা, এ বিষয়ে আমি কি করিতে পারি'—ইহা ভাবিয়া নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। একজন দশ বৎসর বয়স্ক বালক বা অসহায়া রমণীও যথাশক্তি দেশের বা দশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। দেশের কাজ করিতে হইলে যে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তাহা নহে, দেশের কাজ অর্থাৎ দেশের দুর্গতদিগের দুঃখমোচন, শিক্ষাবিস্তার, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি সংসারে থাকিয়াও করা যাইতে পারে। ধনী অর্থ বিনিময়ে, নির্ধন শারীরিক সামর্থ্যের দ্বারা, জ্ঞানী উপদেশ-দানে, চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা, এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিতে পারেন; কর্ত্তব্যবোধ থাকিলে সামর্থ্যেরও অভাব থাকে না। আমাদের জননীগণ হয়ত ভাবিবেন যে, আমরা কুলবধূ, আমরা বাহিরের কাজে কি করিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারি? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য নহে। দেশের ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান, ইহা তাঁহারাও করিতে পারেন। রোগশয্যায় শুশ্রূষা, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাদান প্রভৃতি কার্য্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁহাদের আছে। কেবল এবিষয়ে উদ্যম ও আন্তরিকতা থাকিলেই হইল। তাঁহারা যে সময়টা আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেন, সেই সময়টা যদি প্রতিবাসী ও স্বদেশবাসীর উপকারার্থে ব্যয় করেন, তবে সময়েরও সদ্ব্যবহার হইবে, নিজেরাও আদর্শস্থানীয়া হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

সন্তান-পালন

নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে সন্তান-পালন অন্যতম। সুসন্তানের জননীই নারীসমাজে বরণীয়া। অধুনা সমাজের দোষেই হউক বা শিক্ষাবিপর্য্যয়ে হউক, এ বিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহীনা হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মতে 'কাঞ্চন ফেলিয়া আঁচলে গেরো' দেওয়ার ন্যায় প্রধান কর্ত্তব্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অকিঞ্চিৎকর শিক্ষায় মনোনিবেশ করা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনভাবে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। সন্তান-পালন সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিতে গেলে প্রসূতির গর্ভসঞ্চার হইতে সন্তানের প্রাপ্তবয়সকাল পর্য্যন্ত আলোচনা করাই কর্ত্তব্য।

প্রসূতি গর্ভসঞ্চারকাল হইতে সর্ব্বদা শুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালযাপন করিবেন। কারণ, গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থা ও বৃত্তি প্রায়শঃ সন্তানে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ের উদাহরণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং চিকিৎসা গ্রন্থে বহুলভাবে পাওয়া যায়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বীরবালক অভিমন্যু শৌর্য্যশীল পিতার ব্যূহভেদবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, একথা বোধ হয় কেহ অবিশ্বাস করিবেন না। সুতরাং পরিজনবর্গের বিশেষতঃ প্রসূতির গর্ভধারণকালে দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্বামীর কর্ত্তব্য—সহধর্ম্মিণীকে সদা প্রফুল্ল রাখা ; সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য কদাচ কাহারও অপ্রিয়ভাজন না হওয়া। নিরর্থক কলহ, অনর্থক ক্রন্দন, অযথা খেদ, অসংযত ব্যবহার সর্ব্বদা পরিহার্য্য। প্রসূতি প্রথম গর্ভবতী হইলে স্বতঃই পরিজনবর্গের আনন্দবর্দ্ধিনী হন, তাই বলিয়া এই সুযোগে তাঁহারা যেন কদাচ আলস্য-পরায়ণা না হন। শ্রমরতা রমণীরাই সুখপ্রসবের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। সর্ব্বদাই এমন বিষয়ের আলোচনা, শ্রবণ বা চিন্তা করিবেন, যাহাতে মানসিক সদ্‌বৃত্তিগুলি সহজে ফুটিয়া উঠে ও গর্ভস্থ সন্তান তাহার ফলভাগী হয়।

বর্ত্তমানকালে হিন্দুশাস্ত্র মূলমন্ত্র হারাইয়া নারীজাতির হস্তে 'শুচিবাই'এ পরিণত হইয়াছে। তাই আজ আঁতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা! সাধারণতঃ বাটীর নিকৃষ্ট

ঘরটি আঁতুড়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সদ্যোজাত শিশু জীবনের প্রথম প্রভাতে দেখে—একটী অন্ধকূপ, শ্বাস গ্রহণ করে—পূতিগন্ধময় রুদ্ধ বায়ু, তাহার পরিচ্ছদ—ছিন্ন বস্ত্র, শয্যা—জীর্ণ কন্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার প্রত্যেকটী যে কত বিষময়, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। যে শিশুর জন্মে আমরা বংশগৌরবের কামনা করিয়া থাকি, সেই শিশুর প্রতি আমরা এইরূপ জঘন্য ব্যবহার করিয়া থাকি। যে স্থানে যে পরিচ্ছদে, যে শয্যায়, একটি সবলদেহ, সুস্থকায় যুবক পীড়িত হইয়া পড়ে, আমরা অন্ধ হইয়া এই নবনীত-কোমলকায় কুমারকে সেই অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা করি। আমাদের মনে হয়—বঙ্গদেশে অত্যধিক শিশুমৃত্যুর ইহাও অন্যতম কারণ। ভ্রূণহত্যায় যদি পাপ থাকে, এবংবিধ শিশুহত্যায় কি পাপ স্পর্শ করিবে না? তাহার পর যে প্রসূতি প্রসব যাতনায় একরূপ সদ্যোমৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিল,—যাহাতে ক্ষীণ স্পন্দনশক্তি ব্যতীত জীবিতের আর কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না—তাহার প্রতি ব্যবহারও পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। অথচ তিনিই হয়ত সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও বংশরক্ষার নিদানভূতা। শিশুর ও প্রসূতির অবস্থার উন্নতিসাধন পরিজনবর্গের উপরই সম্যক্ নির্ভর করে। নবজাত শিশুকে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত স্থানে. কোমল শয্যায়, উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই কর্ত্তব্য। প্রসূতির জন্যও উক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। প্রসবান্তে তিনি কিছুদিন যেন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন।

ধাত্রীহস্তে সন্তান সমর্পণ ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রসূতির শ্রমলাঘবের অজুহাতে বা বিলাসবাসনার পুষ্টি-সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা যে কতদূর দূষণীয়, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই অবগত আছেন। অর্থের সচ্ছলতা থাকিলে সন্তানের জন্য ধাত্রী নিয়োগ না করিয়া প্রসূতির জন্য করাই কর্ত্তব্য। পবিত্রকুলে, মেধাবীর ঔরসে পুণ্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুর পক্ষে হীনবংশীয়া কলুষিতচরিত্রা ধাত্রীর স্তন্য পান করা কি উচিত? ইহাতে তাহার পক্ষে দেহ পরিপুষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু চিত্তবৃত্তি উদার হয় না। খাদ্য ও সংসর্গ যে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সংশয় নাই। তবে কোন্ প্রাণে আমরা দৈহিক সুখের জন্য সংসার ও সমাজের ভাবী-মঙ্গল এই

স্বর্গপুত্তলিকার প্রতি ওরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি? শিশুর প্রথম চক্ষুরুন্মীলনের সহিত মনোমধ্যে জ্ঞানের আভা জাগিয়া উঠে; জননীর সস্নেহ আঁখির করুণ কটাক্ষে তাহার মধ্যে যে কোমল ভাবের উদয় হয়, সম্পর্কহীনা ধাত্রীর যত্নে তাহা কি কখনও ফুটিতে পারে? আমাদের বোধ হয়—সন্তান জননীর যত সংসর্গ লাভ করিতে পারে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ।

সন্তানের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইতে পারিলে অনেক জনক-জননী সুখী হইয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহা যথার্থই ক্লেশকর। পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধেও আবশ্যকের অধিক সাজসজ্জা বর্জ্জনীয়। স্নেহের আতিশয্যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমের দিনে অনেক জননী নানাবিধ বেশভূষায় শিশুসন্তানকে সাজাইতে কুণ্ঠিত হন না, ইহা তাহার পক্ষে আদৌ ভাল নহে। যাহাতে শিশু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ বেশেরই ব্যবস্থা করা উচিত। স্নেহাধিক্যবশতঃ অনেক প্রসূতি সর্ব্বদা সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া থাকেন, ইহা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পক্ষান্তরে অভ্যাসদোষে শিশু ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে না, তাহাতে প্রসূতির অসুখ ও অসুবিধার কারণ হইয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে সন্তানকে অত 'আতুপুতু' করা ভাল নয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া সহ্য করাইবার অভ্যাস করাইয়া সন্তানের দেহ গঠিত করা উচিত। সর্ব্বদা বেশভূষায় শিশুর দেহ আবৃত রাখিতে নাই; ইহাতে দৈহিক পরিপুষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। বাল্যকাল হইতে সামান্য ব্যাধিতে যতদূর সম্ভব উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন না করানই ভাল। খাদ্য সম্বন্ধে প্রাচুর্য্য না ঘটে, সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুর সামান্য আঘাতপ্রাপ্তিতে অনেক জনক-জননী একান্ত অস্থির হইয়া উঠেন এবং সন্তানের সমক্ষে এরূপ ব্যাকুলতা দেখান যে, সন্তান বেদনা ভুলিয়া ভীত হইয়া পড়ে। এরূপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ইহাতে সন্তানের সহনশক্তির আদৌ বিকাশ হয় না। পরন্তু কোনরূপ সহানুভূতি না দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকাই ভাল। তাহাতে বালকের সহগুণ ও সাবধানতা বৃদ্ধি পাইবে। শিশুকে যেমন ননীর পুতুল করিয়া ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখা অযৌক্তিক, সেইরূপ গৃহপ্রাঙ্গণে স্বচ্ছন্দ-ক্রীড়াশীল শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতায় ঔদাসীন্যও অযৌক্তিক। ক্রীড়ান্তে শিশুর দেহ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ

নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শিশুর অঙ্গ উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। শিশু ক্রীড়াশীল থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করান চাই এবং শৌচপ্রস্রাবাদি দেহধর্ম্মের প্রতি প্রত্যহ লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

সন্তানের শিক্ষা

আজকাল শিক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি—বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট পুস্তকসমূহ পাঠ করা এবং তত্তৎ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। বস্তুতঃ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এখন পরীক্ষায় কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারা যায়। কাজেই শিক্ষাকে উপযুক্ত অর্থকরী করা জনক-জননী বা অধ্যাপকগণের চরম লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বালক নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নোত্তরদানে সমধিক সমর্থ, সে যদি অশেষবিধ কু-অভ্যাসের দাসও হয়, তথাপি সে স্বচ্ছন্দে জনক-জননীর স্নেহ লাভ করিতে পারে। অধীতপুস্তকে মেধাহীন অথচ চরিত্রবান্ বালকও সে প্রকার স্নেহের দাবী করিতে পারে না। ইহা যে পূর্ণশিক্ষার অনুপযোগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। মনুষ্যহৃদয়ের সমুদয় সুপ্রবৃত্তির উন্মেষণ, পরিবর্দ্ধন ও পরিণতি-প্রাপ্তির নামই প্রকৃত শিক্ষা। অর্থাৎ যে শিক্ষাদ্বারা শৃঙ্খলার সহিত মানবের পূর্ণশক্তির বিকাশ হইতে পারে, তাহাকেই আমরা সমীচীন ও সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিব।

কু-শিক্ষা বা অর্দ্ধ-শিক্ষা দ্বারা অপূর্ণ মনুষ্যগঠনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? ভাবী-জীবনে চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, অধঃপতিত, নির্ম্মম পাষণ্ড হওয়ার জন্য বস্তুতঃ কে দায়ী? মানবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্ব্বরতাশক্তির ন্যায় ভগবদ্দত্ত ও স্বাভাবিক। কাহারও এমন শক্তি নাই যে, তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হয়। তবে ভূমির সুফসল

বা কুফসল যেমন প্রধানতঃ কৃষকের উপর নির্ভর করে, সুসন্তান বা কুসন্তান লাভ তেমনি প্রধানতঃ জনক-জননী বা অভিভাবকের উপরই নির্ভর করে।

অনেকে বলেন—বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহাদের সমালোচনা সাধারণ বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হয় কিন্তু উহা মর্ম্ম স্পর্শ করে না। বর্ত্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে যে দুর্নীতি, মিথ্যা, কদাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম দেখা যায় তজ্জন্য দায়ী আমরা, শিশুরা নহে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্বীয় চরিত্র সংগঠনে সমর্থ না হইব, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজে সুসন্তান লাভ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—"সন্তানের শিক্ষা পিতামহ ও পিতামহী হইতে সূচিত হওয়াই ঠিক।" উপযুক্ত সময়ে স্বীয় সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, পরিণত বয়সে তাহাদের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক অধঃপতনে 'এ যে কলিকাল' বলিয়া অনুতাপ করার ফল কি? সোহাগ করিয়া সন্তানের মুখে স্বহস্তে হলাহল প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া কাঁদিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলের সাধ পুত্র আমার চরিত্রবান হউক, জ্ঞানবান হউক, সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী হউক। কিন্তু সে চেষ্টা কৈ? কয়জন মাতাপিতা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন? কোনরূপে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই তাঁহাদের ক্রোড়ে বংশদুলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকের আন্তরিক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূর্ণ হইলেই তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইতে পারে, এইরূপই তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু যতদিন না অভিভাবক নিজের চরিত্রগঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন এবং সন্তানকে চরিত্রবান্, ধাম্মিক ও সৎশিক্ষাদানে চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর সংসারে ও সমাজে ইষ্টলাভ সুদূরপরাহত।

মুখবন্ধে শিক্ষাসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা উপযুক্ত শিক্ষাদানসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পুস্তকাদির সাহায্যে আমরা বালকগণকে যে পরিমাণ শিক্ষা দান করিয়া থাকি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমাদের কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি হইতে তাহারা তাহার লক্ষগুণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। স্বচক্ষে সকল বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া

সে স্বয়ং যে শিক্ষা লাভ করে, সহস্র উপদেশে ও শত বেত্রাঘাতেও তাহার অণুমাত্র শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় না। বালকের জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব হইতে শিক্ষার সূচনা হয়। ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-বিহার এমন কি স্বর পর্য্যন্ত শিক্ষাকাল প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা স্বয়ং শিক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে যেমন ঘরের ছেলে তাহার চরিত্র তদনুরূপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য কোন অভিভাবকের মাথা ঘামাইতে হয় না। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিশুশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সরঞ্জামের কোন আবশ্যকই হইবে না; শুধু তাহাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত সৎ দৃষ্টান্তের আদর্শ দেখাইলেই সফল মনোরথ হওয়া যায়।

আমরা কথায় কথায় শিশুগণকে বুদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন বলি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের সৎ ও অসৎ ভাবের উপলব্ধি ও ভাবপ্রবণতা পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা যথেষ্ট প্রবল। আমাদের সামান্য সামান্য কার্য্যকারণ হইতে তাহারা অনায়াসে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা আমাদের বক্তৃতা নহে, অভিজ্ঞতা। আমরা যে কত সময়ে আমাদের চিন্তাহীন ক্ষুদ্র কর্ম্মের দ্বারা তাহাদের চরিত্র গঠন করিয়া যাই, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা অনেক সময়ে শিশুকে তিক্ত ঔষধ খাওয়াইতে বলি—'মিষ্টি ঔষধ'। সে আনন্দে তাহা পান করে, কিন্তু সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে যে প্রবঞ্চনার বীজ ঢালিয়া দিই, তাহা আমরা একবার চিন্তা করি না। প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আদরে-সোহাগে, নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অভিনয় করিয়া শুধু যে আমরা তাহাদিগকে প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে; পরন্তু তাহাদিগকে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলি। আমরা চাই "পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ" হ'তে, কিন্তু আচরণ করি নারকীয় কীটের মত। সুতরাং কীটের সন্তানের কাছে সে দৃঢ় ও অচলা ভক্তি কিরূপে লাভ করিব?

অনেক সময় বেত্রাঘাত বা সেই জাতীয় কোন প্রকার শাস্তিদানে আমরা জোর করিয়া সন্তানের নিকট হইতে সম্মান আদায় করি। তাহাতে ফল এই হয়, পিতাপুত্রে মধুর সম্বন্ধস্থলে আমরা শাস্য-শাসকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসি। সন্তানের চরিত্রগঠনে সুশাসন আবশ্যক, সন্দেহ নাই; তবে, সে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে স্নেহের শাসন

হওয়া চাই। বালকের বাধ্যতা অবশ্যই অভিপ্রেত; তবে সে বাধ্যতা যেন বালকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়। আদর-অভিমান মানবের সুকুমার বৃত্তি: সন্তানের উপর ইহার প্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল। দোষহীন বিষয়ে অগাধ স্নেহ দেখাইয়া, দুষ্ট বিষয়ে অভিমান দেখাইলে সম্যক্ ফললাভ হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ শিশুর আনন্দময়-নর্ত্তনক্রীড়া দেখিয়া স্নেহে তাহাকে সহস্র চুম্বন-প্রদান, আবার তাহার অবাধ্যতা বা অন্য কোন অসদাচরণ দেখিয়া তুল্যরূপে বিরক্তির ভাব-প্রকাশ —ইহাতে তাহার শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু কোন কার্য্যের আদেশ করিলে সে যদি তাহা পালনে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে যে-কোন উপায়ে হউক তাহার দ্বারা সে কাজ সম্পন্ন করাইতেই হইবে; তাহাতে যদি বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হয়, নিঃসঙ্কোচে করিতে পারেন; বালক যেন সম্যক্ বুঝিতে পারে, তাহাকে মাতাপিতার আদেশ পালন করিতেই হইবে, তাহার জেদ মাতাপিতার আদেশকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়। আবার এ বিষয়েও দৃষ্টি থাকা চাই—যেন আমরা বালকগণকে অযথা আদেশ পালনে বাধ্য না করি। অনেক সময়ে আমরা তাহাদের দৈবকৃত কর্ম্মের জন্য যথেষ্ট শাসন করিয়া থাকি, তাহা কোনক্রমেই উচিত নহে। অপর কেহ সন্তানকে শাসন করিলে অনেক সময়ে জনক-জননী 'আনক' করিয়া বিনা অপরাধে আবার তাহাকেই প্রহার করেন, ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আবার কখনও বা সামান্য দোষে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন ও গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড দিয়া থাকেন, অনেক স্থলে কোন দণ্ড বিধানই করেন না। ইহা উভয়তঃ দূষণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রকৃতির শাসনের উপর নির্ভর করাও মন্দ নহে। প্রকৃতির শাসন নির্ম্মম, কঠোর ও ওজন করা। দীপ-শিখায় শিশু যতবার হস্ত প্রদান করিবে, উহা তুল্যরূপে দগ্ধকারী হইবে এবং সে শাসন শিশুর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ-দানের আবশ্যকতা থাকিবে না।

অনেক ক্ষেত্রে মাতাপিতা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সন্তানের প্রত্যেক ত্রুটিতে কঠিন কায়িক-দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে সন্তান শাসিত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিকৃষ্ট স্বভাব, ভীরু ও প্রাণহীন করিয়া ফেলে এবং তাহার মানসিক বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের বিদ্বেষভাব বা

বিরক্তি জন্মে। একবার শাসনমুক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢালিয়া দেয়। যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া তাহাদিগকে সুপথে চালিত করাই মাতাপিতার একান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্য অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া থাকে; উহার প্রশ্রয় দেওয়া কোনরূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আব্দার, বায়না, কান্নাকাটি বালকের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। ইহা প্রকৃতিগত প্রভুত্ব-স্থাপনের ইচ্ছা মাত্র; কোনক্রমে তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। শৈশব হইতেই বালকের মিথ্যাকথন সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক জনক-জননী বালকের সেরূপ আচরণে তাহাকে শাসন না করিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতি শৈশবেই কোন কু-অভ্যাস মজ্জাগত হইতে দেওয়া উচিত নহে। পোষাক-পরিচ্ছদাদি নির্ব্বাচনের ভার বালকের উপর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে তাহার বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বাল্যকাল হইতে আত্মসম্মান ও আত্মশ্রদ্ধা যাহাতে শিশুর মনে উন্মেষিত হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক। সে যে ক্ষুদ্র, সেইংযে হেয়, এ ভাব কোনক্রমেই তাহার মনে যেন জাগরূক হইতে না পারে। শাসন ও উপদেশকালে তাহার আত্মসম্মানের যাহাতে বিকাশ ঘটে, সেইরূপ করাই উচিত। প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ হইলেও অনেক সময় বিদ্বেষের ভাব:উদ্দীপ্ত হয়; সুতরাং প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহাযোগিতা উত্তম। শিষ্টাচার, বিনয়াদি গুণ উপদেশ-সাপেক্ষ নহে, আদর্শ-সাপেক্ষ ও সংসর্গ-সাপেক্ষ।

কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে শিশুদের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য তাহাদিগকে ভূত-পিশাচাদির অলীক ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা হয়। ইহা খুবই অন্যায়। সংসারে :ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা প্রভৃতি শিশুর সামান্য পতনাদিতে এমন 'আহা', 'উহু', 'গেছে গেছে' 'চীৎকার করেন' তাহাতে বালকের সাহস জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। জাপান প্রভৃতির সভ্য দেশে কিন্তু উক্তরূপ পতনাদিতে অভিভাবকেরা কোন ক্রমেই হস্তক্ষেপ করেন না, অধিকন্তু বালক ক্রন্দন করিলে তাঁহারা পরিহাস করেন।

বালকে বালকে দ্বন্দ্বের পর ক্রন্দন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসার ন্যায় অপমানের বিষয় আর কিছুই নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ, কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ ও সৎসাহসের কার্য্যে উৎসাহ-দান, অভিভাবকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শৈশবের সীমা উত্তীর্ণ হইলেই বালককে আত্মনির্ভরতায়, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে যোগদানে, ভগবানের আরাধনামূলক চিন্তা ও কার্য্যে উৎসাহ দান করিতে হইবে। সন্তানকে চরিত্রবান ও ভক্তিমান্ করাই সন্তান-পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শৈশব হইতে শিশুগণের সরলচিত্তে ধর্ম্মবীজ বপন করা মাতাপিতার কর্ত্তব্য। জাতিধর্ম্মানুযায়ী দেবার্চ্চনায় উৎসাহ-দান পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মাতাপিতার আর একটী প্রধান কর্ত্তব্য—সঙ্গ-নির্ব্বাচন। আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশে কেন—সর্ব্বদেশে অধিকাংশ শিশু সঙ্গদোষেই উৎসন্নে যাইয়া থাকে। ক্রীড়া-কৌতুক ও ভ্রমণাদিতে যতদূর সম্ভব অভিভাবকস্থানীয় কাহারও সঙ্গে থাকা খুব ভাল; একান্তপক্ষে তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও তাহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে; অতএব সংক্ষেপে বর্ত্তমান শিক্ষার অসারতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

ব্যবস্থাবৈগুণ্যেই হউক আর অব্যবস্থাবৈগুণ্যেই হউক, আমাদের দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা শুধু অভিভাবকের কর্ত্তব্যের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে, চিন্তাস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বাঁধা নিয়ম গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় সমানভাবে চলিয়াছে। সাহিত্যে বা বিজ্ঞানে বালকের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাক্ বা না থাক্ তাহাকে পূর্ণ যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পড়িতেই হইবে। তাহাতে যদি বালককে এক শ্রেণীতে বর্ষত্রয় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাতেও অভিভাবকের আপত্তি নাই। মানুষমাত্রেরই প্রকৃতি ও শক্তি কোন ক্রমেই এক হইতে পারে না। অদ্ভুত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক হইবে, ইহার হেতু কি?

যে ছেলে সহজেই অঙ্কনবিদ্যায় দক্ষ, সে যে ভাল অঙ্ক কষিতে পারিবেই তাহার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং শৈশবকাল হইতে বালকের আসক্তি ও শক্তি কোন্ মুখী, তাহা সম্যকরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুরূপ শিক্ষাদানই বিধিসঙ্গত। সাধারণ শিক্ষায় যে বালকের অভিনিবেশ হয় না, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয়ত দেখা যায় যে, অন্যবিধ শিল্প বা বিজ্ঞানে সে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সামান্য চিন্তা ও অনুসন্ধানের হস্ত হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য একটী অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিয়া, তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া, তাহাকে সমাজের কলঙ্কস্বরূপ করিয়া রাখা কি নিদারুণ নির্ম্মমতা নহে?

দ্বিতীয়তঃ, ভাষাদি শিক্ষাই কি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য? নৃত্য, গীত, অঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যা কি শিক্ষাঙ্গভুক্ত নহে? কিন্তু কৈ, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি কই? যত্ন থাকা দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই কলাবিদ্যায় কোন বালকের স্বভাবতঃ আসক্তি লক্ষিত হইলে অভিভাবকগণ উৎসাহদানের পরিবর্ত্তে তাহাকে নির্য্যাতিত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অথচ তাঁহারা সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ বা কলাবিদ্ ব্যক্তির প্রভূত সম্মান দান করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় ভগবদ্দত্ত যে যে সদ্বৃত্তি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার পূর্ণ বিকাশ করিবার চেষ্টা করা অভিভাবকমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে শুধু যে সে ভবিষ্যৎ জীবনে শান্তি ও সুখলাভের অধিকারী হয় তাহা নহে, অধিকন্তু তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও পরিপুষ্টি হয়।

তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমানে 'ভাল ছেলে' বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায় যে, সে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক ব্যতীত আর কিছুই জানে না, ক্রীড়া-কৌতুকে অনভিজ্ঞ, ভীরু, লাজুক, কার্য্যকুশলতাহীন জড়ভরতমাত্র। কেবলমাত্র সাহিত্যাদি চর্চ্চায় মস্তিষ্কের কিছু উন্নতি সাধন করা যায় বটে, কিন্তু মানুষ গড়া যায় না। আমরা এমনি অন্ধ-স্নেহশীল যে, যতদিন সম্ভব সন্তানকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর চক্ষে দেখিয়া তাহাকে অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিতে চাহি। ফলে এই হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী জাতশ্মশ্রু যুবকও অজাতদন্ত শিশুর ন্যায় কর্ম্মহীন অপোগণ্ডরূপে রহিয়া যায়।

দেশের বর্ত্তমান জীবনসঙ্কটে অধিকাংশ পিতাই উদরান্ন-সংস্থানে এরূপ ব্যস্ত থাকেন

যে, সন্তান-পালন ও তাহাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। সুতরাং এ বিষয়ের ভার জননীগণের গ্রহণ করাই সমধিক সুবিধা।

রোগি-পরিচর্য্যা

প্রত্যেক সংসারেই কোন না কোন সময়ে একটা না একটা রোগ লাগিয়া থাকে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। সুতরাং রোগি-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেরই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বরং এ সম্বন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করা উচিত। কারণ রমণী স্বভাবতঃ দয়াবতী ও মধুরভাষিণী। তাঁহাদের কোমল হস্তের শুশ্রূষায় রোগী যেমন আরাম পায়, পুরুষের স্বভাব-কঠোর হস্তে তাহা সম্ভবপর নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। স্ত্রীলোকের এই স্বাভাবিক গুণ লক্ষ্য করিয়াই চিকিৎসালয়সমূহে নার্সিং বা শুশ্রূষাকার্য্যে স্ত্রীলোকরাই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বিশেষত. স্ত্রীলোক রোগিণী হইলে ত কথাই নাই। তাঁহারা লজ্জাশীলতাহেতু পুরুষের হস্তে শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে একান্তই কুণ্ঠিতা। এইজন্য প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই শুশ্রূষায় পারদর্শিতা লাভ করা প্রয়োজন। শুশ্রূষায় পারদর্শিনী হইতে হইলে রোগের প্রকৃতি ও লক্ষণসমূহে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সহিষ্ণুতা, লঘুহস্ততা, মধুরভাষিতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা-জ্ঞান, সময়-জ্ঞান প্রভৃতি গুণ থাকাও আবশ্যক। কাহারও কোন রোগ হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে পৃথক্ গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কারণ, রোগমাত্রই অল্প-বিস্তর সংক্রামক। রোগীর গৃহে যাহাতে আলো-বাতাসের অভাব না ঘটে এবং অনাবশ্যক গণ্ডগোল না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইতে হইবে। রোগ যতই কঠিন হউক না কেন, রোগীর নিকট সে বিষয়ে কোন আলাপ করিবে না, বরঞ্চ মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিবে। কেননা রোগীর মনে হতাশভাব জাগিলে রোগ উত্তরোত্তর জটিল ও দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। শিশুরা সহজে ঔষধ খাইতে চায় না, তাহাদিগকে নানা-প্রকারে ভুলাইয়া ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইতে হইবে। এ বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা

স্ত্রীলোকের দক্ষতাই সমধিক। রোগীর মলমূত্রাদি তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য; কলেরা, বসন্ত, হাম, টাইফয়েড প্রভৃতি তীব্র সংক্রামক রোগীর মলমূত্র মাটিতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলা উচিত। তাহার বস্ত্রাদি ফেনাইলের জলে ধুইয়া সাবান প্রভৃতি দিয়া সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া লওয়া আবশ্যক। সকাল-সন্ধ্যায় রোগীর ঘরে ধূনা দিলে রোগ-জীবাণু মরিয়া যায় এবং বায়ু বিশুদ্ধ হয়। বয়স্ক রোগী সুস্থাবস্থায় যে খাদ্য পছন্দ করে না, তাদৃশ খাদ্য, পথ্য হিসাবে দেওয়া উচিত নহে। ফলতঃ ঔষধ এবং পথ্য সম্বন্ধে যাহাতে বয়স্ক রোগীর মানসিক বিকার না ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিকিৎসা এবং পথ্য-নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। ঔষধ এবং পথ্য উভয়ই রোগ-উপশমে সহায়তা করে। রোগের জটিলতা অনুসারে কখন কি উপসর্গ বাড়ে বা কমে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এইজন্য রোগীর নিকটে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকা উচিত। অথচ একজন মাত্র লোকের উপর এই ভার ন্যস্ত থাকিলে, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি দ্বারা তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন, এই কারণে সময় করিয়া পরিবারস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির এই কার্য্যে অংশ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যিনিই এই কার্য্যে নিযুক্ত হউন না কেন, তাঁহাকেই শুশ্রূষাকার্য্যে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। শুশ্রূষাকারিণীর পরিচ্ছদাদি পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। তাঁহাকে নিঃশব্দে চলাফেরা করিতে হইবে, এজন্য অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য না থাকাই ভাল। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, গা-হাত ভাল করিয়া ধুইয়া, তবেই গৃহস্থালীর কর্ম্মান্তরে যাওয়া উচিত। সংক্রামক রোগীর নিকট পশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া বা খালি পেটে যাওয়া উচিত নহে; উহাতে শুশ্রূষাকারিণীর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; পরন্তু কর্পূর ব্যবহার প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থে বিশদভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। পুরনারীগণ যদি অবসর সময় গল্পগুজবে না কাটাইয়া ২।১ খানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া রাখেন তবে তাঁহাদের প্রিয়জনের রোগের সময়ে বিশেষ উপকারে আসিবে। শিক্ষিত শুশ্রূষাকারিণী সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এজন্য প্রত্যেক গৃহস্থের রোগি-পরিচর্য্যাবিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা উচিত।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

শরীর সুস্থ রাখা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-সাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীর সুস্থ না থাকিলে, সবল দেহ ধারণ করিতে না পারিলে, সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের অভাব-অভিযোগ পূরণ করা যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ সংচিন্তা বা উচ্চধারণা, সংকার্য্য প্রভৃতি করিবার সাহস বা ক্ষমতাও একেবারে লোপ পাইতে থাকে। সেইজন্য সুস্থ ও সবল দেহে থাকিবার জন্য আমাদের যাহা একান্ত আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিয়া মনকে ভগবন্মুখী করাই প্রধান কর্ম্ম।

এই স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ কি কি? প্রাতরুত্থান, বিমলবায়ুসেবন, সুপথ্যগ্রহণ, ব্যায়ামচর্চ্চা, সুনিদ্রা, এবং ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি সর্ব্ববাদিসম্মত স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইংরাজী প্রবচনে বলে, "ভোরে উঠিলেই সুস্থ, সবল ও ধনবান হওয়া যায়।" ইহা যে শুধু ইংরাজদের মত, তাহা নহে; আমাদের দেশের মুনি-ঋষিগণও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে দন্তধাবন একটা সামান্য ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিতেছে—দন্তরোগ হইতেই অতি কঠিন কঠিন রোগ সমুদয় উৎপন্ন হইতে পারে। তাই প্রত্যহ ভাল করিয়া মুখ ধোওয়া উচিত। আর্য্যচিকিৎসকগণের মতে, শরীরপালন-বিধি মানিয়া চলিলে, সত্যই সুস্থ ও সবল হওয়া যায়। শয্যাত্যাগ হইতে পুনরায় নিদ্রা যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত সুন্দর শৃঙ্খলা তাঁহারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সব নিয়ম একবার পালন ও অভ্যাস করিলেই ফল পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র যে প্রচুর আহার্য্যের অভাবেই আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষা অসম্ভব হইতেছে এবং দেহ নানারূপ ব্যাধির আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা নহে; পরন্তু, পুষ্টিকর সহজপাচ্য এবং সাত্ত্বিক আহারের অভাবেই আমরা স্বাস্থ্য-রত্ন হারাইতেছি। অতিভোজন রোগের মূল। "উনো ভাতে দুনো বল, ভরা পেটে রসাতল"—এ সব প্রসিদ্ধ প্রবচন মা-লক্ষ্মীরা নিশ্চয়ই জানেন। খাদ্যদ্রব্য পুষ্টিকর হইলে পরিমাণে কম

হওয়া চিন্তার বিষয় নহে। বরং সকল দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণই ক্ষুধা রাখিয়া বারে বারে অল্প পরিমাণে খাদ্যগ্রহণের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

জীবনধারণের প্রধান উপাদান নির্ম্মল বায়ু ও পরিষ্কার জল। শুদ্ধাচারী দরিদ্রের সংসারে যে আহার্য্য সংগ্রহ হয়, তাহা আহার করিলেই স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য-রক্ষা করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে রমণীগণের অনেকেরই ধারণা, ছেলে-মেয়েকে বেশী খাওয়াইলে বল-বৃদ্ধি হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারা সন্তানদিগকে অতি-ভোজন করাইয়া নষ্টস্বাস্থ্য করেন। এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া প্রকৃত স্বাস্থ্য-রক্ষার মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসকগণও নানারূপ রোগের জন্য রোগ-প্রতিষেধক অনেক ঔষধাদি আবিষ্কার করিতেছেন। এই সকল ঔষধসেবনে রোগিগণ অনেক সময়ে মরণের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থতা অনুভব করেন মাত্র।

যে খাদ্য ক্ষয়পূরণ বা দেহের পুষ্টিসাধন না করিয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে, তাহাকে খাদ্য বলা যায় না। যে ঔষধ সাময়িক রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া মানুষকে চিররুগ্ন করে, তাহাকে ঔষধ বলা যায় না। আহার্য্যমাত্রেই সুখাদ্য নয়, ঔষধমাত্রেই রোগ সারে না। তাই অনেক বিবেচনা করিয়া খাদ্য ও ঔষধ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। মোট কথা, সাত্ত্বিক আহারে, ব্রহ্মচর্য্যপালনে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় শরীর যেরূপ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, কোন তামসিক খাদ্য প্রচুর পরিমাণে আহার করিলেও শরীরকে সেরূপ সুস্থ রাখা যায় না; অধিকন্তু দেহখানিকে নানারূপ রোগের আবাসভূমি করা হয়। তাই, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য শাস্ত্রের বিধি যথাযথ পালন করিয়া শরীরকে নানা রোগের হাত হইতে রক্ষা করা এবং নিজে সুস্থ ও বলিষ্ঠ হওয়া। শরীর ভাল থাকিলে সৎচিন্তা, উচ্চধারণা ও সৎকার্য্য প্রভৃতিতে আনন্দ আসিবে এবং কঠিন কার্য্য সম্পাদনে অবসাদ আসিবে না; বরং সমস্ত কর্ম্মেই আনন্দ হইবে।

বর্ত্তমান যুগে একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল দেশেই নরনারী দেশকাল অনুযায়ী স্বাস্থ্য-রক্ষার বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ন লইয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা বাহিরের কাজকর্ম্মে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কিছু না কিছু ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া কতকটা সুস্থ

আছেন, কিন্তু এদেশের নারীসমাজের অবস্থা শোচনীয়। বিলাসিতাকে যিনিই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিবে। আর যিনি সংসারের কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহার শরীর উপযুক্ত আহার না পাইলেও কিছু ভাল থাকিবে। স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতে হইলে অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ, নিয়মিত সময়ে স্নান ও ভোজন আবশ্যক। দিবানিদ্রা, মাদক-দ্রব্যসেবন ও অধিক রাত্রি-জাগরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি নিয়মে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহা ছাড়া যে যে তিথিতে যে সমস্ত খাদ্যাদি নিষিদ্ধ তাহা প্রতিপালন করিয়া চলা উচিত। শাস্ত্রকারগণ শরীর-রক্ষার নিমিত্তই এই সমস্ত নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত নিয়ম প্রতি-পালন করা সত্ত্বেও দূষিত খাদ্য, পানীয় ও বায়ুর দোষে রোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে। মা-লক্ষ্মীগণ স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা; তাঁহার কোন অসুখের সূচনা হইলে তখনই যদি তাহার প্রতিবিধান করেন এবং রোগ অনুযায়ী আহার ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে চিরকাল রোগ ভোগ করিতে হইবে না। নারীজাতিই জাতির জননী, এজন্য নারীজাতিকে সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে শিক্ষিত হইতে হইবে।

আত্মার পবিত্রতা রক্ষা

আমাদের সৎ বা অসৎ যাহা কিছু জ্ঞান জন্মে তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারাই উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় সর্ব্বসমষ্টিতে ছয়টী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটীকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বহিরিন্দ্রিয় এবং মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে। কিন্তু মন সর্ব্বাধিক জ্ঞানের প্রতিকারণ; মনঃসংযোগ না হইলে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সর্ব্ববিধ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মন যদি বিশুদ্ধ না থাকে, তবে সমস্ত জ্ঞানই কলুষিত হইয়া যায়। দর্পণ নির্ম্মল না হইলে প্রতিবিম্বও নির্ম্মল হয় না। সুতরাং আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে মনকে সংযত করিয়া উহার নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে হইবে। মন চঞ্চল,

উহাকে সংযমের দ্বারা আয়ত্তে রাখিতে হয়। মনীষিগণ মনকে দুর্দ্দান্ত ঘোটকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত অশ্বকে যেমন বল্গা দ্বারা সংযত রাখিতে হয়, মনকেও তদ্রূপ বিবেকরূপ বল্গা দ্বারা সংযত না করিলে উহা বন্ধনমুক্ত অশ্বের ন্যায় উন্মার্গগামী হইয়া থাকে। বিবেক ধর্ম্মজ্ঞানেরই নামান্তর। উহা দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ জন্মে। একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি পশুসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে পরিগণিত হয়। অন্যথা আহার, নিদ্রা প্রভৃতি প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মগুলি মনুষ্যের ন্যায় পশু প্রভৃতিতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে শ্রেষ্ঠ মানবদেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞানরহিত বা বিবেকহীন তাহাকে পশ্বধম বলিতেও দ্বিধাবোধ হয় না। এই ধর্ম্মজ্ঞান সুদৃঢ় হইলে ভাবশুদ্ধি হয় এবং ভাবশুদ্ধ মানবই আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে সংযমের অনুশীলন দ্বারা মনকে সংযত করিতে হইবে। তারপর ধর্ম্মজ্ঞান ও বিবেককে সুদৃঢ় করা আবশ্যক ; গুরূপদেশ শ্রবণ, শাস্ত্রানুশীলন, সৎসঙ্গ, মহাপুরুষগণের জীবনী পর্য্যালোচনা, সদ্গ্রন্থ-পাঠ প্রভৃতি দ্বারা বিবেক সুদৃঢ় হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এখন বিপরীত আবহাওয়া বহিতেছে। সিনেমা-বায়োস্কোপদর্শনে এবং নভেল-উপন্যাসপাঠে যে সমস্ত ভাব স্বভাব-চঞ্চল নর-নারীর চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে সংযম সুদূরপরাহত, বিবেক তিরোহিত এবং আত্মার আবিলতা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। কল্যাণকামী নরনারীগণ বিষধরজ্ঞানে এই সমস্ত প্রলোভন হইতে যত দূরে থাকিবেন ততই মঙ্গল। তাঁহারা অবসর সময়ে ঈশ্বরোপাসনা, সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থপাঠ, সদালাপ প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হইলেই, ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ধর্ম্মজ্যোতিতে অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। দৈবাৎ প্রবল প্রবৃত্তির তাড়নে যদি কোন অবিবেকের কার্য্য করিয়া বসেন, তবে অনুতাপাদির দ্বারা ঐ পাপের ক্ষয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করিলেই শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইতে পারিবেন।

রূপ

রূপ ভগবানের দেওয়া জিনিষ। রূপবান্ বা রূপবতী হওয়া অবশ্যই তাঁহার আশীর্ব্বাদ। মানুষমাত্রেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়া থাকে। তাই বলিয়া রূপই জগতের একমাত্র সার বস্তু নহে, ইহা মনুষ্যদেহের আবরণ মাত্র। অনেক সময়ে দেখা যায়—অনেক জ্ঞানহীনা নারী রূপের গর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খলা হন, তাহা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। আবার রূপহীনতার জন্য কেহ দায়ী নহে, তাহাতে কাহারও হাত নাই। ভগবান্ যাহাকে যেরূপ করিবেন তাহাকে সেইরূপ হইতে হইবে। সুতরাং নিরপরাধা রূপহীনাদের গঞ্জনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এ জগতে সৃষ্টদ্রব্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যাহা কিছু দেখিতে সুন্দর তাহাই শ্রেষ্ঠ নহে। সৌন্দর্য্যহীন বহু দ্রব্য আমাদের পরম কল্যাণকর। সুতরাং সুন্দরী রমণীই যে কেবল নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা ইহা বলা যাইতে পারে না। যেমন সুন্দর পুষ্পের সহিত সুগন্ধ মিশ্রিত থাকিলে সকলেই সেই ফুল ভালবাসে, সেইরূপ সুন্দরী রমণী সদ্গুণের আধার হইলে সকলেরই আদরণীয়া হন। আবার সৌন্দর্য্যহীন পুষ্প সুগন্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর করে ও গন্ধহীন সুন্দর পুষ্পের অনাদর করে সেইরূপ কুরূপাও গুণবতী হইলেই সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে; গুণহীন সুন্দরীর সমাদর কেহ করে না। স্ত্রীলোকের রূপই বল আর গুণই বল, তাহাতে নিজের গর্ব্ব করিবার কি আছে? যাঁহারা রূপবতী, তাঁহারা স্বীয় সৌন্দর্য্যের সহিত সহস্র গুণ যুক্ত করিয়া 'মণিকাঞ্চন'-সংযোগের ন্যায় অতুলনীয়া হউন, এবং যাঁহারা রূপহীনা তাঁহারা ততোধিক যত্নে স্ত্রীজাতিসুলভ অন্যান্য গুণের অধিকারিণী হইয়া তাঁহাদের রূপহীনতার কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলুন, তাহা হইলে, সংসার-জীবন সার্থক হইবে।

সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা সহগুণের তুলনা করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ধরিত্রীর বা পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাহার কারণ—জগতে সকল সৃষ্টিই সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে। কত আপদ্-বিপদ্, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া একটী ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। সেইরূপ এ সংসারে বহু আপদ্-বিপদ, অভাব-অনটন, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দৈন্য নীরবে সহ্য করিলে পরিশেষে ভগবানের আশীর্ব্বাদে সুখ-শান্তি লাভ করা যায়। যাঁহারা সামান্য দুঃখ-কষ্টে অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁহারা কখনও স্থায়ী সুখলাভ করিতে পারেন না। আজ তোমার কষ্ট হইয়াছে, অভাব হইয়াছে সহ্য কর, কাল আবার ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার সুখের দিন আসিবে। অনেক সময়ে আমাদের দুঃখ-কষ্ট হিংসা হইতেও উৎপন্ন হয়। অমুক ভাল ভাল গহনা পরিতেছে, অমুকের কত ঐশ্বর্য্য, আমার কিছুই নাই ; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিও অমুকের একদিনে উন্নতি হয় নাই। অমুকের অবস্থাও একদিন ভাল ছিল না ; ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুমি যদি একান্তমনে ধৈর্য্য ধরিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পার, সুখের দিন তোমারও আসিবে। মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল সকল পুস্তকেই ধৈর্য্যহীনতায় নাশের আর সহিষ্ণুতায় সুখের উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সীতাদেবী যদি স্বর্ণমৃগের জন্য অসহিষ্ণু না হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না। আবার অহল্যা সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিরূপে যদি পাষাণ হইয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণু পাইতেন না। বঙ্কিমবাবুর 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' এ বিষয় সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর সহিষ্ণুতাই তাঁহাকে তাঁহার সোনার সংসার ফিরাইয়া দিল, আর ভ্রমরের অধৈর্য্যই একটা বর্দ্ধিষ্ণু বংশ উৎসন্নে দিল। সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপদের বোঝা আসিয়া পড়ে যে, তখন মনে হয় সর্ব্বনাশ হইল, এ যাত্রা আর রক্ষা হইল না ; কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অচিরকাল মধ্যে বিপদের মেঘ কাটিয়া সুখ-চন্দ্রের উদয় হয়। কর্ম্মবশে তুমি যদি চরিত্রহীন স্বামীর হাতে পড়িয়া থাক, ভালবাসার দ্বারা

তাঁহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর। যদি গঞ্জনাময় সংসারে আসিয়া থাক, নীরবে সহ্য কর; প্রতিবাদ করিও না, প্রতিকলহ করিও না;—দেখিবে মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার অশান্তি দূর হইবে। তোমার সংসার সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হইবে। আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বামীর সংসার ভাসাইয়া দিয়া পিতৃগৃহে উঠ, তাহাতে সাময়িক সুখ হইতে পারে বটে, কিন্তু চিরকালের সুখ হারাইতে হইবে। অনেক অজ্ঞ অভিভাবক এরূপ ক্ষেত্রে কন্যাদিগকে উক্তরূপ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রশ্রয়ে যে কন্যার সর্ব্বনাশ করা হইতেছে, তাহা তাঁহারা চিন্তাও করেন না।

সংযম

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টী মানবের পরম শত্রু। এইজন্য ইহাদিগকে 'ষড়্‌রিপু' বলা হয়. এই ছয়টীকে দমন করিয়া রাখার নামই সংযম। এই কামাদি রিপু ছয়টীর মধ্যে একটীর সঙ্গে অপরটীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটীর উৎপত্তিতে অপরটীর উৎপত্তি এবং একটীর নাশে অপরের নাশ হয়। লোভ-বিশেষ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র লোভকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলেই ক্রমশঃ অপরাপর রিপুগুলিও শান্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে। লোভ হইতে কাম জন্মিয়া থাকে। অতএব এই রিপু বা মানসিক বৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া রাখিতে না পারিলে নরনারী ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে। প্রথমতঃ, রূপজ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কত রাজ্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কত সোনার সংসার উৎসন্নে গিয়াছে এবং কত নরনারী যে কলঙ্কিত দুর্ব্বহ জীবন-যাপনে বাধ্য হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দ্বিতীয় প্রকার লোভ—

রসনাঘটিত। আমরা খাদ্য-পানীয়ের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সুন্দর নীরোগ দেহকে নানাবিধ ব্যাধির আধারে পরিণত করি। ইদানীং দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক সংসারেই কাহারও না কাহারও কোন না কোন রোগ লাগিয়াই আছে। ইহাদের অধিকাংশই যে আহার-বিহারের দোষে উৎপন্ন, তাহা প্রায় সকলেই বুঝেন; কিন্তু সংযমের অভাবে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ইহা বুঝিয়াও অজ্ঞের ন্যায় সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া অকালমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছি। শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সংসারে রুগ্ন ব্যক্তিকে লইয়া পরিজনবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। শুধু ইহাই নহে; আবশ্যক সংসার-খরচের ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া বা ঋণ করিয়া ডাক্তার-কবিরাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। সময়ে লোভ সংবরণ করিতে পারিলে এই আগন্তুক ব্যয়টা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

লোভ যেমন শয়তানের ফাঁদ, ক্রোধও তেমনই উহার শাণিত তরবারি। ক্রোধের উদ্রেক হইলে মানবের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মনুষ্যোচিত সদ্গুণসমূহ লোপ পাইয়া মানুষকে পিশাচে পরিণত করে। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এমন একটা কু-কার্য্য করিয়া বসি, যাহার জন্য আমাদিগকে আজীবন অনুতাপ করিতে হয়। ক্রোধকে অগ্নির সহিত উপমা দেওয়া হয়। বাস্তবিক অগ্নি যেমন নির্ব্বিচারে দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষে পরিণত করে, ক্রোধও তদ্রূপ সদ্গুণসমূহ বা বিবেককে নির্ব্বিচারে ভস্মীভূত করে। মনীষিগণ এই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে দলন করিবার একটী সুন্দর উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, যখন কোন ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইবে, তৎক্ষণাৎ দর্পণে নিজের মুখ দেখিবে এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিবে। এইরূপ করিলেই অচিরে উহা লয়প্রাপ্ত হইবে।

ক্রোধ হইতেই স্মৃতিবিভ্রম বা মোহ জন্মিয়া থাকে। মোহ অজ্ঞানতারই নামান্তর। উহা মায়া-মরীচিকার ন্যায় মানুষকে কুপথে লইয়া যায়। নির্ম্মল আকাশে হঠাৎ কুয়াসা উঠিয়া যেমন সূর্য্যকিরণ আচ্ছাদন করে, মোহও তদ্রূপ বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছাদন করায় অসদ্বৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠে এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ জীবকে ক্রমশঃই পাপের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

মদ ও মাৎসর্য্য মোহেরই সহজাত শত্রু। মদ বা মত্ততা দ্বিবিধ; প্রথম—মাদক-দ্রব্যসেবনজনিত; দ্বিতীয়—ঐশ্বর্য্যজনিত। অত্যন্ত অহিতকর উগ্র মাদকের কথা ছাড়িয়া দিলেও আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে চা, চুরুট, দোক্তা, জরদা ইত্যাদি মৃদুমাদক-দ্রব্যের প্রচলন দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা; ইহা দ্বারা এক এক গৃহস্থের যত অর্থ নষ্ট হয়, তদ্দ্বারা এক দরিদ্র গৃহস্থ বাঁচিয়া যাইতে পারে।

মাৎসর্য্য অর্থাৎ অহঙ্কার, বড় কম শত্রু নহে। যাহার ভিতরে অহঙ্কার শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, সে নিজেকে অপর হইতে বেশ একটু স্বতন্ত্র রাখিতে চেষ্টা করে। এই মাৎস্যর্যভাব হইতে শান্তিপূর্ণ সংসারে মনোভঙ্গ এবং গৃহভঙ্গরূপ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া সংসারকে ছারখারে দেয়। প্রথম হইতে সংযম অভ্যাস করিলে এই সমস্ত দুরন্ত রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সংযমহীন ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম্মই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয়। শাস্ত্রের নিয়ম এবং গুরুজনবর্গের সদুপদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিলেই নরনারী সংযত বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুশৃঙ্খলা

সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলা সংসার-জীবনের একটী অতি আবশ্যকীয় গুণ। ইহা ব্যতীত সুব্যবস্থায় সংসার-চলা অসম্ভব। সংসারের কাজ বা সংসারের দ্রব্য একটী-দুইটী নয়, বহু। যদি সকল দ্রব্য নিয়মিতরূপে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সকল কাজ এমনই 'এলোমেলো' হইয়া যায় যে, বহু পরিশ্রমেও কোন বিষয় সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে না। শৃঙ্খলার অভাবেই অনেক সময়ে অনেক কার্য্য অসম্পন্ন থাকে এবং বহু দ্রব্য অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। এমন কি হঠাৎ বিপদের সময়ে আবশ্যক দ্রব্যের অভাবে বিপদের গুরুতা বাড়িয়া যায়। বৃহৎ পুস্তকের সূচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে বাহির করা যায় না,

কেবল পাতা উল্টাইয়া মরিতে হয় সেইরূপ সংসারে শৃঙ্খলা না থাকিলে সাংসারিক কার্য্য ও দ্রব্যাদির কিছুই হিসাব থাকে না; কেবল ছুটাছুটি, খোঁজাখুঁজি ও ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া মরিতে হয়; স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের দেবতা। শৃঙ্খলাহীনা গৃহিণীর সংসারে কখনও লক্ষ্মীর বাস থাকিতে পারে না। সুতরাং যে সংসারে বিলি-বন্দোবস্ত নাই, সে সংসার শীঘ্রই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়ে। লক্ষ্মীস্বরূপিণীর লক্ষ্মীছাড়া হওয়া অপেক্ষা অধিক নিন্দার আর কি আছে? শৃঙ্খলা রাখিতে হইলে সকল দিকেই হুঁস থাকা চাই ও সঙ্গে সঙ্গে আলস্যহীনা হওয়া চাই। কখন্ কি কাজ হইবে, কি হইতেছে না, কখন্ কাহার কি দরকার এ সব বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা চাই। কোথায় কোন্ জিনিষ গেল, কোথায় কোন্ জিনিষ রহিল, সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে হইবে এবং গৃহ-কার্য্যাদির শেষে যতক্ষণ না সংসারের সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনক্রমেই বিশ্রাম লাভ করিবেন না। কার্য্যে যেমন শৃঙ্খলা আবশ্যক, বাক্য ও ব্যবহারেও তদনুরূপ হওয়া উচিত। কণ্ঠস্বরে শৃঙ্খলা চাই। অযথা চীৎকার বা অনাবশ্যক মৃদুতার প্রয়োজন নাই। কার্য্যের তারতম্য, সম্পর্ক ও সময়ের গুণে কণ্ঠস্বরের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইবে। শ্বশ্রূমাতার সহিত সাংসারিক বিষয়ের আলোচনায় যে কণ্ঠস্বর আবশ্যক, সন্তানকে শাসন করিবার সময়ে সে স্বর ব্যবহার করিলে চলিবে না। আবার সন্তান-শাসনের স্বর কৌতুকপ্রসঙ্গে প্রযোজ্য নহে। আবার মাথামুণ্ড ঠিক না রাখিয়া কোন বিষয়ে 'হাউ হাউ' করিয়া পরিচয় দিতে গিয়া 'খেই' হারাইয়া ফেলা সমধিক দূষণীয়। যাহাকে দেখিয়া আবক্ষ ঘোমটা দেও, তাহার সমক্ষে বা পরোক্ষে ঘোমটার ভিতর হইতে লজ্জাহীনার ন্যায় চীৎকার করা সঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত কথা কহিবার সম্পর্ক তাহাকে দেখিয়া 'কলাবৌ' হওয়াও দূষণীয়। এইরূপ আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে সমান শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক।

বিলাসিতা

বিলাসবাসনা মানবের একরূপ দেহধর্ম্ম বলিলেও চলে; সুতরাং সংসারের সকলেই আপন আপন সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু দেহ লইয়াই সংসার নহে; দৈহিক সুখবিধান ছাড়া সংসারে অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং দৈহিক সুখের জন্য সে কর্ত্তব্য ভাসাইয়া দিলে চলিবে কেন? দেশ, কাল অনুসারে আমাদের সংসারে ক্রমশঃই বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নহে। বিলাতীবিবির আদর্শ দেখিয়া হিন্দুনারীর কি বিবি সাজা শোভা পায়? বিশেষতঃ বিলাসসজ্জা অনেক সময়ে কুৎসিত ভাবের উদ্দীপক। কোন্ লজ্জায় কুলবধূরা অর্দ্ধনগ্ন বিলাসিনী সাজিয়া শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতির সম্মুখে বাহির হন? শুনিয়াছি সেকালে আর্য্যবধূগণ সজ্জিত হইয়া সাধারণের সমক্ষে আসিতে একান্ত সঙ্কুচিতা হইতেন, ইহাই নারীচরিত্রের পবিত্র মধুরতা। জগজ্জননী জগদম্বা, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী হইলেও শ্মশানবাসী শিবের বল্কলপরিহিতা গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে ভালবাসেন। বিলাসিতার উপযোগী বেশভূষা হিন্দুবধূদিগের পক্ষে লজ্জার কথা, ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ইহাতে অনাবশ্যক অর্থ-ব্যয়, সময় নষ্ট, অপরপক্ষে শরীর নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার জন্য অঙ্গমার্জ্জনাদি ও পরিষ্কৃত-বস্ত্রাদি-পরিধান, কেশবিন্যাসাদি যাহা একান্ত আবশ্যক, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সামাজিক রীতি অনুসারে মর্য্যাদারক্ষার জন্য অনেক সময়ে মূল্যবান্ বসন-ভূষণের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভগবৎকৃপায় যাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল, সময়বিশেষে তিনি তাহা সম্ভবমত ব্যবহার করিতে পারেন। তাই বলিয়া দরিদ্রগৃহিণী যেন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উক্তরূপ বসন-ভূষণ স্বামীর নিকট দাবী না করেন। ভদ্রসমাজে গমনোপযোগী সাদাসিধা পরিচ্ছন্ন বসনাদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। আজকালকার সমাজে 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি' চলিতেছে। কেহ মূল্যবান্ বসন-ভূষণ পরিলে তাহাকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে ও তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে। স্বামীর বংশমর্য্যাদা ও গুণগৌরবই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার—'সোনাদানা' নহে। নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর বুনো রামনাথের সহধর্ম্মিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারিণী

রমণীগণের প্রতি আপনার বামহস্তের লাল সুতা দেখাইয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "এই সুতো যে দিন ছিঁড়বে সে দিন নবদ্বীপ অন্ধকার হবে।" যে অর্থে 'বিলাসিনী' শব্দ ব্যবহৃত হয় সকলেই জানেন তাহা অতি ঘৃণ্য। অতএব আমাদের বিশ্বাস—পবিত্র হিন্দুকুলের মঙ্গলময়ী বধূরা সাধ করিয়া কখনও সে আখ্যা-গ্রহণে অভিলাষিণী হইবেন না।

অলসতা

বিলাসিতা হইতেই অলসতা আসে। আলস্য মানুষের একটী প্রধান শত্রু; ইহা হইতে যে সংসারের কত ক্ষতি হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অলসতা যেরূপ দুঃখ-কষ্ট ও অবনতির কারণ হয়, পৃথিবীতে কোন দুর্ঘটনাও তদ্রূপ হয় নাই। অলসতা শুধু শরীরকে নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, মনকে তুল্যরূপে কলুষিত করে। মেয়েলি ছড়ায় আছে—"সন্ধ্যায় শয়ন করে প্রভাতে নিদ্রা যায়, চাউল মৎস্য ধুয়ে যেবা দুয়ারে ফেলায়" ইত্যাদি সমুদয় আলস্যের চিহ্নজ্ঞাপক, এবং ইহার ফলে লক্ষ্মীহানা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আলস্যপরায়ণা গৃহিণীর কোন সময়েও শৃঙ্খলার সহিত গৃহকার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, কাজেই গুরুজনের সেবা, সন্তান-পালন প্রভৃতিও সম্যক্‌রূপে নিষ্পাদিত হয় না। আলস্যপরায়ণার গৃহে প্রবেশ করিতে যেখানে মানুষের ঘৃণা বোধ হয়, সেখানে লক্ষ্মী আসিবেন কি করিয়া? কোন স্থানে মলমূত্র, কোন স্থানে স্তূপীকৃত দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত শয্যা, অন্য স্থানে গৃহতল আবর্জ্জনাপূর্ণ; সংসারের সর্ব্বত্রই যেন বিষাদময় ও উৎসাহহীন। অলসতার এমনি প্রভাব যে, সে স্বীয় জননী বিলাসিতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলে; সে সংসারের সকল সুখ নাশ করিয়া আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যায়। বহু উপার্জ্জনক্ষম স্বামীও আলস্যপরায়ণা পত্নীর দোষে চিরদুঃখ ও দরিদ্রতা ভোগ করেন।

ক্ষমা

অলসতা যেমন বিলাসিতার রাক্ষসীকন্যা, ক্ষমা তদ্রূপ সহিষ্ণুতার দেবদুহিতা। সহিষ্ণুতা হইতে ক্ষমার উৎপত্তি। সর্ব্বংসহা ধরণীর কন্যারূপা হিন্দুললনার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা স্বাভাবিক। যে সহ্য করিতে পারে, সে ক্ষমা করিতে পারে। জগতে যত মহত্ত্ব আছে, ক্ষমার মত মহত্ত্ব আর কিছু নাই। ক্ষমা—দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই সমান কল্যাণ সাধন করে। ক্ষমার মত মন গলাইয়া দিতে, এমন প্রাণ মাতাইয়া দিতে, এমন আপনার করিতে জগতে আর কিছুই নাই। সহস্র তিরস্কার, শত অত্যাচার, অজস্র লাঞ্ছনায় যে ফল না হয়, একটী ক্ষমার উদাহরণে তাহার অজস্রগুণ ফল হয়। মন খুব উঁচু না হইলে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমাশীল ব্যক্তি নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদান। এ সংসার ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটিতে পূর্ণ। পদে পদে সর্ব্ববিষয়ে প্রতিবিধান করিতে গেলে সংসারে হাহাকার পড়িয়া যায়। যেখানে দণ্ড বা প্রতিবিধান একান্ত অপরিহার্য্য হয়, সেখানেই দণ্ড দিবে, তদ্‌ব্যতীত ক্ষমার বন্ধনেই সমস্ত সংসারকে আপনার করিয়া বাঁধিয়া লইবে ; জগতে এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে ক্ষমার বাঁধন ছিঁড়িতে পারে।

স্নেহ-মমতা

হিন্দুনারীকে স্নেহ-মমতা বিষয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখি না। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক গুণ। জগতে হিন্দুরমণীই এ গুণে অন্যান্য দেশের রমণীগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আপন সুখ তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহ করিতে বুঝি জগতে আর কেহই সমর্থ নয়। হিন্দুরমণীর স্নেহের উদাহরণ, মমতার দৃষ্টান্ত লেখনীর বিষয়ীভূত নয়, ইহা প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সংসার-জীবনে প্রতিনিয়ত উপলব্ধির বিষয়। স্বামীর পরিজন-

বর্গের জন্য, বিশেষতঃ সন্তানের নিমিত্ত, সর্ব্বত্যাগিনী মূর্ত্তিমতী মমতা হিন্দু পরিবারের গৃহে গৃহে এ দুর্দ্দিনেও বিরাজ করিতেছে। তবে পাছে বৈদেশিক সংমিশ্রণে, পাশ্চাত্ত্য আবহাওয়ায় আমাদের এই পবিত্র আরাধ্য বস্তু কলুষিত হয়, সেই আশঙ্কায় এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতেছি। আর একটী কথা, অমৃতও ব্যবহার-দোষে গরলে পরিণত হয়। কিংবদন্তী আছে, বানরীরা স্নেহপরবশ হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে স্বীয় সন্তানের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বভাবতঃই স্নেহশীলা অনেক জননী সন্তানস্নেহে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের স্নেহাধিক্যই অনেক সময়ে সন্তানের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। অনেক পরিবারের মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রায়ই দেখা যায়। শৈশব হইতে অত্যধিক স্নেহে তাহারা এমনি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যাহাকে তাঁহারা বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে-ই একদিন আবার তাঁহাদের হৃদয়ের শেলস্বরূপ হইয়া উঠে। সুতরাং সন্তান স্নেহের পাত্র হইলেও সে স্নেহের সীমা থাকা চাই, বন্ধন থাকা চাই, বিধি থাকা চাই। সকল ক্ষেত্রেই স্নেহ-নিবন্ধন কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে কেন? সন্তানের বিস্ফোটক হইলে অস্ত্রচিকিৎসা কষ্টকর বলিয়া কি তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে?

আর একটী কথা--আমরা সময়ে সময়ে এই স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানের প্রতি স্নেহের অত্যাচার করিয়া থাকি। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী হইলে তাহাকে কি আঁচলে ঢাকিয়া রাখা ভাল দেখায়? সে যখন মানুষ হইয়াছে, তখন সে আপনার পথে চলুক। তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিয়াছি, এখন সে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করুক। একমাত্র স্নেহপরবশ হইয়া তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইতে যাইব কেন? সে ত ভালবাসা নয়, সে যে শত্রুতা। কর্ম্মসূত্রে দীর্ঘকালের জন্য তাহাকে যদি সুদূর দেশে যাইতে হয় যাউক; তাহার অদর্শনজনিত দুঃখ নীরবে সহ্য করাই প্রয়োজন। স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল-কামনাই তখন মাতাপিতার একমাত্র কর্ত্তব্য। জীবনের ব্রত সাধন করিতে যদি তাহাকে সংস্রাধিকবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয় হউক; জনক হইয়া, পালন করিয়া তাহাকে কি মানুষ হইতে দিব না? মৃত্যু ত দেহীর অবশ্যম্ভাবী নিয়তি; যদি মৃত্যু

আসে গৃহে রাখিয়া আঁচলে ঢাকিয়া তাহাকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন? অন্ধস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙালীজাতি 'ভীরু বাঙালীই' রহিল, মানুষ হইতে পারিল না। শিশু যতদিন শিশু থাকে, ততদিন সে জননীর অঞ্চলের নিধি; শিশু যুবক হইলে সে ত জন্মভূমির ধন। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সে ধন অপহরণ করা কি পাপ নহে? সেইজন্য বলিতেছিলাম, স্নেহেরও বিধিবন্ধন আবশ্যক। যে স্নেহের অমৃতময় সিঞ্চনে শিশুর দেহ গঠিত হইল, সে পবিত্র স্নেহ যেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থ-কলুষিত না হয়।

বিনয়

পুরুষকে যেমন বাহিরের নানা কাজে নানা লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়, স্ত্রীলোকগণের তদনুরূপ বাহিরের লোকের সহিত সংশ্রব না থাকিলেও, একেবারে যে তাঁহারা সংশ্রবশূন্য, তাহা নহে। সুতরাং আচারে ও ব্যবহারে বিনয় যেমন পুরুষের চিরসঙ্গী, স্ত্রীলোকগণেরও উহা ভূষণস্বরূপ। উৎসবাদিতে বাঙ্গালীর ঘরে ভিন্ন পরিবারস্থ বহু রমণীর আগমন হইয়া থাকে; তাহাদের পরিচর্য্যার ভার গৃহিণীর উপরই ন্যস্ত থাকে। সুখ্যাতি-অখ্যাতি তাঁহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। স্বামীর ঐশ্বর্য্য-উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যদি মনে মনে গর্ব্বিতা হন, অথবা তাঁহার অপেক্ষা অবস্থাহীনা অভ্যাগতা স্ত্রীলোকদিগকে তিনি যদি ছোট নজরে দেখেন, তাহা হইলে আয়োজন যত বিপুলই হউক না কেন, তাঁহার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে যদি দ্রব্যাদির আয়োজন অসচ্ছলও থাকে, বিনয়সহকারে সকলকে উপযুক্ত-রূপ সমাদর করিলে ত্রুটি সহজেই ঢাকিয়া যায়। স্ত্রীলোকের গর্ব্ব অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ। জগৎলক্ষ্মী ইহা কখনই সহ্য করেন না। যে পরিবারের রমণীরা স্বামী প্রভৃতির আর্থিক উন্নতিতে গর্ব্বিতা হইয়া পড়েন, সে পরিবারের আশু পতন অবশ্যম্ভাবী। 'লক্ষ্মীর কথা'য়

আছে "গৃহিণী গর্ব্বের ভরে করে কদাচার, অস্তি অস্তি বলি আমি ছাড়ি সে সংসার।" ভগবানের কৃপায় অর্থশালী হইলে অনেক অবস্থাহীনকে প্রতিপালন করিতে হয়। সে পালন গর্ব্বের সহিত করিলেও প্রতিপাল্যেরা অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে সত্য কিন্তু তোমার নিকট উপকার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা তাহাদিগের মনে উদয় হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রতিনিয়ত বিদ্বেষভাবই জাগরিত হইতে থাকিবে। ফলে এই হইবে যে, অর্থব্যয়ে বিনয়ের অভাবে মাত্র বিদ্বেষভাজনই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে সাহায্য করা যায়, তাহারা তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

স্বাধীনতা

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুরমণীর জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা সর্ব্বাবস্থাতেই পিতা, স্বামী, সন্তানাদি কোন না কোন পুরুষের অধীনে থাকেন। জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্যে স্ত্রীজাতি যে পুরুষেরই অনুবর্ত্তিনী থাকিবে, ইহাই যেন ভগবদ্ অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পুরুষের বশবর্ত্তী থাকা স্ত্রীজাতির লজ্জা বা ঘৃণার কথা নহে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও হৃদয়বান্ ব্যক্তি কখনই স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অধীন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। হিন্দুশাস্ত্রমতে স্বামী-স্ত্রী যখন অভিন্নহৃদয়, তখন স্বামীর মত, স্বামীর ইচ্ছা, সে ত তাঁহারই মত, তাঁহারই ইচ্ছা। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অশিক্ষিতা ও দুর্ব্বলা। তাঁহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে গেলেই পদে পদে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে—সংসারজ্ঞানরহিতা অনেক রমণী স্বাধীনভাবে চলিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকালের অবস্থা, তাহাতে স্ত্রীজাতির স্বাধীনভাবে ভ্রমণাদিও নিরাপদ নহে। এতদ্দেশীয় সমাজতত্ত্ববিদ্

মনীষিগণ স্ত্রীজাতির উপযোগী যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই বিধিনিষেধগুলি মানিয়া চলিলে সংসারে সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিবে। সুতরাং ঋষি-ব্যবস্থিত নিয়মগুলি আমাদের অবনতমস্তকে পালন করাই কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়—সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর মতানুসারিণী হওয়াই কুলবধূর ধর্ম্ম। একমাত্র পাষণ্ড ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির কবল হইতে স্ত্রীধর্ম্ম বা সতীত্ব-রক্ষার বিষয়ে স্ত্রীজাতি স্বাধীন।

লজ্জা

চাণক্য পণ্ডিত বলেন—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা এব পার্থিবাঃ। সলজ্জা গণিকা নষ্টা লজ্জাহীনাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।" অর্থাৎ সন্তোষহীন ব্রাহ্মণ, সন্তুষ্ট রাজা, সলজ্জা বারবনিতা ও লজ্জাহীনা কুলবধূর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। লজ্জাই স্ত্রীজাতির রক্ষাকবচ। ইহা স্ত্রীজনোচিত সমুদয় গুণকে বর্শ্মের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। লজ্জা আছে বলিয়াই আজও অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করে নাই। লজ্জার ভয়েই স্ত্রী-পুরুষ বহু অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। কবিগণ স্ত্রীজাতিকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। পরপুরুষ দর্শনে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম।

আজকাল অনেক বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে। ঘোমটা লজ্জা নিবারণের একটী বাহ্য আচ্ছাদন। ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, পথে ঘাটে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলেই ঘোমটা দেন, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, তাঁহারা একবার পুরুষকে ভাল করিয়া দেখিয়াই ঘোমটাটী দেন। আমাদের মতে যেখানে পুরুষের আগমনের সম্ভাবনা আছে, পূর্ব্ব হইতেই সেখানে ঘোমটা দেওয়া ভাল। অনেক স্থানে বিবাহবাসরে কুলবধূরা হাস্যকৌতুক করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাহা

এরূপ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হয় যে, তাহা ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য। এ প্রথার আশু উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। বর য়ত আত্মীয়ই হউক না কেন, সে-ত নবাগত পরপুরুষ বটে। কোন্ যুক্তিতে তাহার সম্মুখে অশ্লীল রহস্যালাপ সঙ্গত হইতে পারে? স্বামীর সাক্ষাতেও যে ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ আসে, অপরের সাক্ষাতে কিরূপে তাহা করা যায়? সম্বন্ধে যেই হউক, স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত কোনরূপ রহস্যালাপ কুলবধূদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ভগ্নীপতি, নন্দাই প্রভৃতিকে লইয়া কোন কোন অঞ্চলে উক্ত প্রকার পরিহাসাদি প্রচলিত প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কি সূত্রে বা কোন্ যুক্তিতে যে এরূপ প্রথা প্রচলিত হইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপরের সাক্ষাতে স্বামীর সহিত হাস্যপরিহাসও লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ। বিলাসিতাপূর্ণ বেশভূষা লজ্জাহীনতার রূপান্তর। লজ্জাবতীরা কখনও স্বামীর সম্মুখে অসঙ্গত লজ্জাহীনতার পরিচয় দিবেন না। উচ্চ ভাষণ, উচ্চ হাস্য, চঞ্চল গমন, প্রভৃতি লজ্জাহীনতার লক্ষণ। স্ত্রীজাতির শয়নে, ভোজনে, কথনে ও আচরণে সর্ব্বদা সংযত থাকাই কর্ত্তব্য।

সরলতা

অকপটে নিজের মনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সরলতা। মুখে একভাব, মনে একভাব ও বাক্যে একভাব, কিন্তু কার্য্যে অন্যরূপ আচরণ করার নাম কুটিলতা। যাহার মন সর্ব্বদা সৎচিন্তায় মগ্ন, নিত্য আনন্দময়, সরলতা তাহার মুখে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। কোন গর্হিত-কার্য্য গোপন করিতে হইলে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়। যে জীবনে কোন মন্দ কার্য্য করে না, তাহার সে পথ অবলম্বন করিবার আবশ্যক হয় না। সুতরাং সরলতাসম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে হীন বা নিন্দনীয় কার্য্য করিতে বিরত হইবে, নচেৎ সরলতা লাভ অসম্ভব। সমাজে এক-

জাতীয়া অতি হীন কুটিলস্বভাবা রমণী আছেন, যাঁহারা সরলতার ভান দেখাইয়া পরের মনে অযথা ব্যথা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝেন সব, অথচ বলিবার সময়ে এমন ভাব দেখান, যেন না বুঝিয়াই সরলভাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তরিক উদ্দেশ্য—তাঁহার মর্ম্মঘাতী কথায় অন্যে অন্তরে দগ্ধ হউক। কুটিলতা অপেক্ষা সেই সরলতার ভান বড় সাংঘাতিক। সরলতা বিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ। যদি কাহারও সরলতায় কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সমুদয় কার্য্য, সকল বাক্যই, নিঃসন্দেহে সে বিশ্বাস করে। সংসারের লোক যতই চতুর হউক না কেন, একদিন না একদিন তাহার চাতুরী ধরা পড়েই। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক চতুরতা ও কুটিলতা তাহার পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে না। ফলে এই হয়, যদি কোন বিষয় তিনি আন্তরিকতার সহিতও সম্পন্ন করেন সে বিষয়ও লোক সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্য বিষয়ে কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ত্রীকে চিরদিনের জন্য স্বামীর নিকট সন্দেহ ও ঘৃণার পাত্রী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। স্বামীর মনে সহজেই ধারণা হয় যে, সামান্য বিষয়ে যে এরূপ ছলনা করিতে পারে, গুরুতর বিষয়েও যে সে একদিন ছলনা করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সংসারে, বিশেষতঃ নারীজীবনে সন্দেহ বড় দোষের, বড় ভয়ের কারণ। তিলেকের সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময়ে একটী জীবন কাটিয়া যায়। মানুষমাত্রের ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি হইয়া থাকে। উপস্থিত তিরস্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কপটতা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। সরল চিত্তে আপনার ভুল বা ত্রুটি, স্বামী বা পরিজনসমক্ষে প্রকাশ করাই শ্রেয়স্কর। কুটিল ব্যবহারে সন্দেহ উৎপাদন করাইয়া যে নিজেই জন্মের মত দুঃখ-ভাগিনী হন, তাহা নহে; যাহার মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহার জীবনকেও বিষময় করিয়া তোলা হয়। কার্য্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায় সর্ব্বান্তঃকরণে যাহাতে পূর্ণ সরলতা থাকে, সর্ব্বপ্রযত্নে সে বিষয়ে যত্নবতী হইতে হইবে। সত্য, সরলতা সহচর ও আশ্রয়। সুতরাং জীবনের সমুদয় আচরণ সত্যপূর্ণ হওয়া চাই।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—আজকাল বুদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতা আখ্যা দিয়া থাকেন। সরল হইতে হইলে বুদ্ধিহীন হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই।

সরল হইতে হইলে যে সংসারের সকল সমস্যা, সকল রহস্যই, সকল গোপনীয় বিষয়ই, অকপটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। সংসারধর্ম্ম করিতে গেলে অনেক বিষয় অনেক সময়ে গোপন রাখা আবশ্যক হয়। সকল বিষয়ই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে কার্য্যসিদ্ধির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং 'মন্ত্রগুপ্তি' অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্য গোপন, সংসারজীবনে একটী সাধনীয় বিষয়। সরলতা অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া উক্ত বিষয়ে লক্ষ্যহীনা হইলে চলিবে না। বিশেষতঃ অনেকেই বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করিতে পারেন, সরলতার দোহাই দিয়া তুমি যদি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ কর, তাহাতে প্রকারান্তরে উক্ত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করা হইবে। গোপনীয় বিষয় যদি ঘৃণ্য হয়, তুমি তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। আর এক কথা, সংসার শঠ ও প্রবঞ্চকে পূর্ণ। সুতরাং তোমার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তোমার অনিষ্ট করিতে না পারে, সে বিষয়েও তোমাকে তুল্যরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাজেই সরলচিত্তা হইতে গেলে বুদ্ধিহীনতার পরিবর্ত্তে সুচতুরা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না হইতে হইবে। নতুবা অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

গাম্ভীর্য্য

অনেক সংসারে দেখা যায়—এমন এক একটী কর্ত্তা বা গৃহিণী আছেন যাহাকে দেখিবামাত্র বাড়ীশুদ্ধ লোক এমন কি পাড়ার বা গ্রামস্থ অনেক লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার কাছে মাথা যেন আপনিই নত হইয়া পড়ে। অথচ তাঁহাকে কখনও কাহাকেও তাড়না বা পীড়ন করিতে দেখা যায় না। আবার এমনও হয়, হয়ত তাঁহার অসাক্ষাতে অনেকেই তাঁহার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মূর্ত্তি লইয়া যেমনই উপস্থিত হন, অমনি সকলে

গলিয়া যায়। কেন এমন হয়? আমাদের আলোচ্য বিষয় গাম্ভীর্য্য বা 'রাশ' যে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশিষ্ট গুণ থাকিলে এ সম্মান লাভ করা যায়। গম্ভীর প্রকৃতির লোকের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহারা স্বভাবতঃ বিশেষ ধৈর্য্যশীল। আপদ্-বিপদে, সম্পদ্-উৎসবে, অথবা কলহ-বিবাদে ইহারা অন্যায় বিচার করেন না, বা অযৌক্তিক কথা বলেন না। ইহারা স্বল্পভাষী ও মিষ্টভাষী। সাধারণের ন্যায় কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না বা কোনও বিষয়ে মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন না। যখন ইহাদের কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ বা মীমাংসার আবশ্যক হয়, তখন ইহারা স্বভাবসুলভ মিষ্ট কথায় ও ধীরভাবে সকল বিষয়ের এরূপ মীমাংসা করেন যে, বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হন না। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু। অন্যের বিপদে বা উৎসবে আপনাদের দৈহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ যত্নে ও প্রসন্ন মনে তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহারা স্বভাবতঃ স্নেহশীল। ইহাদের মিষ্ট বাক্য শোকে সান্ত্বনা দিতে, বিপদে উৎসাহ দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহারা অতি সহজেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন এবং লোকের মন বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহারেই তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। আপনাদের সুখ-ঐশ্বর্য্য বা অভাব-অভিযোগের বিষয় কদাপি আলোচনা করেন না। কেহ তাঁহাদের কাছে যাইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার দুঃখের বিষয়গুলিতে সহানুভূতি ও সুখের বিষয়গুলিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। বড় গাছ যেমন বড় ঝড় সয়, তেমনি ইহারা সংসার-অরণ্যে বনস্পতিরূপে দুঃখ-শোকের অনেক আঘাত নীরবে সহ্য করেন। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গৃহিণীর গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ করিলাম। সংসারকে সুখের ও শান্তির স্থল করিতে হইলে এসব গুণের অধিকারিণী না হইলে চলিবে কেন? আমরা আশা করি, সংসারজীবনের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক পুরমহিলা উক্ত গুণে গুণবতী হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

আত্ম-সন্তোষ

রোগ যেমন স্বভাবতঃ সারিবার মুখে না আসিলে কেবলমাত্র ঔষধ প্রয়োগে কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিনা ঔষধে সারিতে দেখা যায়, মানুষেরও আত্ম-সন্তোষ বা মনের সুখ আপনা হইতে লাভ না করিলে কেবলমাত্র উপাদানসংগ্রহে বা ভোগ্যবস্তুলাভে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আত্ম-সন্তোষশীল ব্যক্তির মনের সুখ সহস্র অভাবের ভিতরও সমভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এই পৃথিবীতে কামনারও শেষ নাই, বাসনারও শেষ নাই। যিনি যত ভোগ্যবস্তু পাইবেন তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হইয়া বরং আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজমহিষীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, শুনিবে তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যেও তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভোগ্যবস্তুলাভেই কোনক্রমে মনের সুখলাভ হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ্‌লাভে প্রায় সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাই বলিয়া উহাই জীবনের প্রকৃত সুখলাভের পন্থা নহে; ওটা আমাদের মনের বিকার মাত্র।

তোমার স্বামী এক শত টাকা উপার্জ্জন করেন, তুমি তাহাতে সুখী হইতে পারিতেছ না; ভাবিতেছ, পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিলে তোমার সুখ হয়। কিন্তু পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জনশীল স্বামীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তিনিও তাহাতে সুখী হইতে পারিতেছেন না; তিনি হাজার টাকার জন্য লালায়িত। আবার দরিদ্রের গৃহিণী তোমার ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষ্যা করিতেছেন। জগতে এই ভাব বরাবর চলিয়া আসিতেছে। কোন দিন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে, এরূপ বোধ হয় না। খাওয়া বল, পরা বল, অলঙ্কার বল, অট্টালিকা বল, সকলই ত বাঁচার জন্য কিন্তু ভোগ-বিলাসের জন্য ত বাঁচা নহে, জীবনের উদ্দেশ্যও তাহা নয়। জীবনধারণ করিতে গেলে যাহা একান্ত দরকার, তাহা পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে করা উচিত। কারণ, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, শাক-ভাত খাইয়া দরিদ্রেরা বাঁচে, আবার পোলাও-কালিয়া খাইয়াও বড়লোকেরা বাঁচে। তাহাতে দুঃখ বা কষ্ট করা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। উহাতে

কিছুই আসে যায় না। বরং ঐশ্বর্য্য বেশী হইলে লোক সাধারণতঃ তাহাতে উন্মত্ত হইয়া পড়ে; তাহাতে তাহার ক্ষতি বৈ লাভ হয় না।

জগতে বিদ্যায়, গৌরবে ও মহিমায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্রের সন্তান। অর্থহীনতা বা অভাব তাঁহাদের উন্নতির কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই; বরং তাঁহাদের মানুষ হইবার পক্ষে সহায়তাই করিয়াছে। স্নেহময় ভগবান্ সমদর্শী, তিনি তাঁহার করুণা সকল সন্তানের উপর তুল্যরূপে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন এবং দেহ ধারণ করিতে যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

উদাহরণস্বরূপ একটী কথা বলিতেছি—বাতাস আমাদের প্রাণস্বরূপ; তাহা আমরা সকলে তুল্যরূপেই পাই। বর্ত্তমান যুগে ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া না পাইলে আমাদের মন খুঁতখুঁত করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি ভগবৎপ্রদত্ত বায়ু অপেক্ষা সে কি বেশী তৃপ্তিকর? নির্ম্মল জল অভাবে আমরা কয় দিন বাঁচিতে পারি? শত সহস্র স্রোতস্বিনীর সুপেয় ক্ষীরধারা কি আমাদের সকলের তুল্য ভোগ্য নহে? কল বা ফোয়ারার জল কি এতই মিষ্ট? দেহধারণ করিতে হইলে আহার্য্যের প্রয়োজন সন্দেহ নাই; ক্ষীর, সর, নবনী-ভোগে ধনীরা যে সুখ লাভ করেন, শাক-ভাত খাইয়া দরিদ্রের সে তৃপ্তি হয় না কি? দরিদ্রের দেহ কি সুস্থ থাকে না? নিদ্রা দেহধারণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে সুখ হইতে ভগবান্ ত কোন দরিদ্রকে বঞ্চিত করেন নাই। বরং আত্ম-সন্তোষশীল ঐশ্বর্য্যচিন্তাহীন দরিদ্রেরাই সে তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে।

অর্থহীনতা ও অর্থপ্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। কোন অর্থবান্ ব্যক্তি কি জগতের রোগ, শোক, জরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন? এ যন্ত্রণা দরিদ্রেরও যেমন ধনীরও তেমন। তবে আমরা যে 'হাউ-মাউ' করি, সেটা মোহ ও আমাদের মনের ভুল। জটাবল্কলধারী আর্য্যঋষি এবং ভূষণহীনা আর্য্যরমণীগণের স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূল-আহারে, কুটীরবাসে বা পত্রশয্যায় শয়নে মনের সুখের বা মনুষ্যত্বলাভের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই। আর্য্যযুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই সেদিনের কথা, নিষ্ঠাবান্ পরমপণ্ডিত

বুনো রামনাথ তাঁহার পুণ্যবতী পত্নীর প্রদত্ত তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন, "যাহার বাড়ীতে এমন অমৃত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন সুপাচিকা, তাহার বাড়ীতে খাদ্যের অভাব আবার কিরূপে হইতে পারে?" মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী ভূমি দান করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাঁহাকে সভায় লইয়া যান, কিন্তু স্বভাবসন্তুষ্ট সদানন্দ মহাপুরুষ কোন সাংসারিক অভাবই জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবলমাত্র জীবের আত্যন্তিক দুঃখের বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সুখ বা আনন্দ লোকের মনে, দ্রব্যে নহে; যদি দ্রব্যে হইত, তাহা হইলে সকলেই একই জিনিষ বা একপ্রকার জিনিষই ভালবাসিত। তুমি পিঁয়াজের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়, আর একজন আনন্দে তাহা আহার করে। সৌন্দর্য্যজ্ঞানী তুমি যে সুন্দর পুষ্প সাদরে সোহাগের সহিত বক্ষে ধারণ কর, শস্যকামী কৃষক অনায়াসে তাহার ক্ষেত্র হইতে সেই পুষ্পবৃক্ষকে আবর্জ্জনার ন্যায় উৎপাটন করে। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি সৌন্দর্য্য সেই পুষ্পে না তোমার মনে? সুতরাং যাহা কিছু সুখ এবং যাহা কিছু দুঃখ সবই আমাদের নিজেদের মনের ধর্ম্ম। আমরা ইচ্ছা করিলেই সুখী হইতে পারি, আবার ইচ্ছানুসারেই দুঃখের ভাগী হই। জগতে মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে যাহা হইবার তাহা হইবেই, তুমি আমি কেহই তাহা রোধ করিতে পারিব না। তাহাতে অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া 'গেলুম-গেছি' বলিয়া আমরা দুঃখের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া থাকি।

একভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্রকৃতপক্ষে সকলেই সমান সুখ-দুঃখভাগী। রাজা ও প্রজায়, ধনী ও দরিদ্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ জগতে যদি একজন রাজা থাকে ত সকলেই রাজা, আর একজন দরিদ্র থাকিলে সকলেই দরিদ্র। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা দরকার; মনে কর একজন রাজা, এখন দেখ তাঁহার রাজশক্তি ও ঐশ্বর্য্য কি কি? প্রথমতঃ, রাজার অনেক প্রজা আছে, অনেক কল্যাণ-কামী ব্যক্তিও আছেন; তিনি স্বাধীন, তাঁহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মত পালন করে, তিনি বরেণ্য, সকলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে; মোটামুটি এই লইয়াই তিনি রাজা; এবং সেই সম্মানে সম্মানিত স্বামীর স্ত্রী রাজমহিষী আখ্যা পাইয়া থাকেন।

এখন একজন তোমার বা আমার মত সাধারণ লোক লইয়া আলোচনা কর। দেখা যাক্ সাধারণ রাজারাণীর যে যে সম্পদ্, যে যে শক্তি আছে, তোমার আমার মত গৃহস্থ রাজারাণীর সেই সেই সম্পদ্, সেই সেই শক্তি আছে কি না। পূর্ব্বোক্ত রাজা বা রাজমহিষীর লক্ষ বা কোটি প্রজা বা প্রতিপাল্য; তোমার বা আমার না হয় দু'টী কি পাঁচটী। তিনি যেমন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তুমি বা আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র হর্ত্তা-কর্ত্তা নহি? একজনও কি আমাদের মুখাপেক্ষী নাই। রাজার সহস্র দাসদাসী সেবারত; তোমার আমার কি একটীও স্নেহপুত্তলিকা পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী আন্তরিক যত্নে সেবা করে না? রাজার কল্যাণকামনায় লক্ষ প্রজা মঙ্গল উৎসব করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার দরিদ্র স্বামী জীবিকার্জ্জনে যখন বিপদ্‌সঙ্কুল পথে যান, তখন তুমি ও তোমার পরিবারস্থ প্রতিপাল্য সকলে আর্ত্তস্বরে কায়মনোবাক্যে তাঁহার কল্যাণ কামনা কর কি না? যদি ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ পাত হইয়া যায়, তোমার কি সেদিকে লক্ষ্য থাকে? একমাত্র সেই দরিদ্র স্বামীর মঙ্গল—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল, তাঁহার নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—তোমার কি তখন একমাত্র কাম্য হইয়া উঠে না? জগতে এমন কি কেহ আছে, যাহার জন্য তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিক চঞ্চল হয়? রাজারাণী তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যে স্বাধীন সত্য, তুমি বা আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে পর্ণকুটীর মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করি না? চিরদুঃখপীড়িতা কাঙ্গালিনী জননীর প্রাণপুত্তলি পুত্রের প্রতি যে স্বর্গীয় স্নেহ, অমৃতময় টান, ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে, শক্তির শাসনে রাজা কি প্রজার নিকট তদপেক্ষা অধিক স্নেহভাজন হইতে সমর্থ হন? সুতরাং এ কথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, নিজের গৃহে স্বজনমধ্যে সকলেই সমান রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

আমাদের সাধারণ মনঃকষ্ট যে ঈর্ষ্যাসম্ভূত ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, আর দুই-একটী কথা বলিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তোমার সন্তান যদি কুৎসিত হয়, কৈ তাহাকে ফেলিয়া অন্যের রূপবান্ শিশুকে কোলে লইয়া তুল্যস্নেহে ত আদর করিতে পার না। তবে কেন পরের মূল্যবান্ স্বর্ণবলয় দেখিয়া আপনার দরিদ্র স্বামিপ্রদত্ত শাঁখাসিন্দুরে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না? নিজের কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিৎ অঙ্গুলিতে

অঙ্গুরীয় ধারণ না করিয়া অন্যের সুগঠিত সুঠাম অঙ্গুলিতে পরাইবার জন্য ত পাগল হও না! তবে কেন পরের সুধাধবল অট্টালিকা দেখিয়া নিজের পর্ণকুটীর পানে দৃষ্টিপাত করিতে তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? ভগবান্ দয়া করিয়া তোমাকে যাহা দিয়াছেন, সেই তোমার সুখের, সে-ই তোমার আদরের। পরের সুখ, পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিজের প্রাণকে অস্থির করিও না। সৌন্দর্য্যের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন; সে সৌন্দর্য্য-লাভের জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইতে পারে; কিন্তু তোমার শুধু সেই সৌন্দর্য্য-লাভই উদ্দেশ্য হইলে, তুমিও অক্লেশে কাননসুলভ সুন্দর কুসুমে তোমার দেহ আবৃত করিতে পার। বল দেখি একটী ফুলের যে স্বভাবসৌন্দর্য্য, সহস্র শিল্পী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে কি সে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে? একটী সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পমালা বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশকে যে শোভায় শোভিত করে, জগতে কোন মূল্যবান অলঙ্কার কি তাহা করিতে সমর্থ হয়? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অলঙ্কার আমাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য নহে, উহা আমাদের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বের জন্য। এই ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব সাধারণতঃ পরশ্রীকাতরতা হইতে উৎপন্ন হয়। সংসারধর্ম্ম পালন করা তোমার নারীজীবনের লক্ষ্য, তাহার সম্পাদনেই তোমার তৃপ্তি। ভোগবিলাস ত তোমার জীবনের ব্রত নহে।

দারিদ্র্যপীড়িত দেশে শত অভাবের মধ্যে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। হিংসা-প্রণোদিত হইয়া সকল বিষয়ের অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া সংসার-জীবনকে বিষময় করিয়া তোলা আদর্শ গৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। তোমরা ইচ্ছা করিলে আত্ম-সন্তোষ দ্বারা গৃহের শত অভাব, সহস্র অনটনকে আত্মতৃপ্তির অমৃতধারায় মধুময় করিয়া তুলিতে পার; নিজেরাও চিরসুখিনী ও ধন্যা হইতে পার, তোমাদের স্বামী এবং পরিজনবর্গও পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন।

অর্থসম্পদের সদ্ব্যবহার

মণি, মুক্তা, হীরক, প্রবাল, প্রভৃতি রত্ন; স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ও অলঙ্কার, কাংস্য, তাম্র, ও পিত্তলাদির দ্রব্যসমূহ এবং বসন-ভূষণাদি পদার্থ-সমুদয় অর্থসম্পদরূপে পরিগণিত। এই অর্থসম্পদ্ সকল গৃহস্থেরই অল্প-বিস্তর কিছু না কিছু আছে। কিন্তু উহার যথাযথ ব্যবহার না জানায় অনেকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। উহার রক্ষা এবং নিয়মিত ব্যবহার দ্বারা যেমন সুখশান্তি পাওয়া যায়, তেমনই অযথা ব্যবহারে দারিদ্র্য এবং বিপদকে ডাকিয়া আনা হয়, সুতরাং অর্থ-ব্যবহারনীতি শিক্ষা করা সকলেরই প্রয়োজন। সংসারে সকলেই সমান অর্থ উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে না; এ অবস্থায় প্রত্যেকেরই স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া মিতব্যয়িতা দ্বারা সংসার পরিচালনা করা উচিত। লক্ষপতি হইলেও অমিতব্যয়ী ব্যক্তিকে পরিণামে অবশ্যই দুঃখভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা আমাদের মাতৃস্থানীয়া গৃহলক্ষ্মীগণেরই বিশেষরূপে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা যদি মিতব্যয়িতা-সহকারে উহার পরিচালনা না করেন, তবে সে সংসার কখনই সুখের হইতে পারে না। অনেক সংসারে এরূপ দেখা যায় যে, পয়সার অভাবে হয়ত ছেলেরা পড়িবার বই যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে না পারায় পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, অথচ এ দিকে আলতা, চিরুণী, পমেটম প্রভৃতির প্রসাধন দ্রব্য, সাবান ও এসেন্স প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণের কোন কিছুরই অভাব ঘটে না, বরঞ্চ একপ্রকার নিঃশেষ হইতে না হইতেই অন্য প্রকার আমদানী হয়। এইরূপ অর্থের অপব্যবহারের ফলে দুঃসময়ে বা বিপদ্-আপদে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে গৃহস্থকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবশ্যক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য এত অধিক যে, প্রলুব্ধ দস্যু-তস্কর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৃহস্থকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, এমন কি প্রাণরক্ষাও দুর্ঘট হইয়া পড়ে। জননীগণ ইহা বুঝেন না যে, সময়ে অর্থসঞ্চয় না করায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র-কন্যার রোগাদিতে সুচিকিৎসার অভাবে অকালে তাহাদিগকে হারাইতে হয়। মধ্যবিত্তের সংসারে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। গৃহিণীকে সর্ব্বদাই মনে

রাখিতে হইবে যে, স্বামি-পুত্রের উপার্জ্জনশক্তি চিরদিন সমান থাকিবে না। উপার্জ্জনের অনুপাতে সাংসারিক অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া দুঃসময়ের জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। মিতব্যয় করিতে হইবে বলিয়া একেবারে কৃপণতাও ভাল নহে। অমিতব্যয়িতা এবং কৃপণতা তুল্যরূপেই দোষাবহ। শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, "উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধেক নিজের এবং পোষ্যবর্গের প্রতিপালনার্থ ব্যয় করিবে, চারিভাগের একভাগ দানাদি সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবে এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ দুঃসময়ের জন্য সঞ্চয় করিবে।" শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ ও মত সুচিন্তিত। আমারা যদি এই মতানুবর্ত্তী হইয়া চলি, তবে আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের মাতৃস্থানীয়া গৃহিণীগণ এই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে সংসার পরিচালন করিলে তাঁহাদের সংসারে অভাবজনিত দুঃখের লেশমাত্রও থাকিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমোদ-প্রমোদ

কর্ম্মক্লান্ত সংসারে মধ্যে মধ্যে আমোদ-প্রমোদেরও অনুষ্ঠান আবশ্যক। আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্য—আনন্দলাভ। ভগবান্ স্বয়ং আনন্দময় বলিয়া তাঁহার সন্তানকুলও আনন্দ পাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে; ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত আমোদ-প্রমোদ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ হয়, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যে আমোদ-প্রমোদ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র ভ্রাতা-ভগিনী একত্র বসিয়া উপভোগ করিতে পারে, তাহাই বিশুদ্ধ এবং বাঞ্ছনীয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কুস্তি, লাঠিখেলা, যাদুক্রীড়া, তরজা, কবির গান প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিত এবং সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করিত। এতদ্ব্যতীত দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠিত পূজা-পার্ব্বণাদি উৎসবেও

আপামর সকলেই যোগদান করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইত। এই সমস্ত উৎসবের মধ্যে যাত্রাও হইত; যাত্রায় সঙ্গীত ও গান উভয়ের ব্যবস্থা থাকায় উহা অধিকতর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিত। পরন্তু এই সমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে শিক্ষার উপাদানও যথেষ্ট ছিল। অধুনা বিকৃত শিক্ষার ফলে রুচি-বৈচিত্র্যহেতু পূর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ নির্ব্বাসিতপ্রায়। দুই-এক স্থলে কচিৎ ইহা দেখা যাইলেও তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; যাত্রার স্থান থিয়েটার-বায়স্কোপ অধিকার করিয়াছে। এখন আমরা রাত্রি জাগরণ করিরা কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশায় অভ্যস্ত হইতেছি। পূর্ব্বে পৌরাণিক প্রসঙ্গপূর্ণ যাত্রা দেখিয়া পাপে ভীতি এবং ধর্ম্মে আসক্তি জন্মিত; বর্ত্তমান থিয়েটার-বায়স্কোপের কলুষিত চিত্রদর্শনে অসংযমের মাত্রা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমরা অমৃতভ্রমে স্বয়ং হলাহল পান করিতেছি। ইহা অপেক্ষা মূর্খতার পরিচায়ক আর কি হইতে পারে? আজকাল ছুটির দিনে থিয়েটার-বায়স্কোপ গৃহের সম্মুখের পথ দর্শনার্থী নরনারীগণের দ্বারা এমন অবরুদ্ধ হয় যে, সময়ে সময়ে ঐ পথ অতিক্রম করা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। অনেক কলুষিতচিত্ত পুরুষ স্ত্রী-পরিচয় দিয়া বারবনিতাকে সঙ্গে লইয়া এই সব আমোদের জন্য উপস্থিত হয়। এজন্য এই সব স্থানে যত কম যাওয়া যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সঙ্গীতাদির দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে নিজ গৃহে পুত্র-কন্যাদিগকে লইয়া ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত চর্চ্চা করাই উচিত। ইহাতে চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তির উদয় হইবে। ফলতঃ, প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াকৌতুক, ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত, পূজা-পার্ব্বণ, বিবাহ প্রভৃতিই বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ।

একান্নবর্ত্তিতা

হিন্দুর সংসার-জীবনে যতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা বা একপরিবারস্থ হইয়া জীবনযাপন-প্রণালী যে কত শান্তির বিষয় তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একসঙ্গে, একযোগে, এক চিন্তা ও এক উদ্দেশ্য লইয়া সংসার করায় যে কত সুখ, কত শান্তি, কত সুবিধা ও কত তৃপ্তি তাহা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা কখন পৃথক্ হইবার কল্পনাও মনে আনিতে পারেন না। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে এমন কি এক গোত্রস্থ সকল জ্ঞাতি একসঙ্গে ও একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেন। ইহাতে যে কেবল আর্থিক সুবিধা হয়, তাহা নহে; ভ্রাতায় ভ্রাতায়, আত্মীয়-স্বজনে যে মধুর ভাব, যে পবিত্র প্রীতির সম্বন্ধ, তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং একই চিন্তা ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী থাকায় দ্বেষ-হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না, পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

দুঃখের বিষয় আমরা আজকাল পাশ্চাত্য জাতির সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগের স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগের পক্ষপাতিতা দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত এই পবিত্র প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছি। আপনার সুখ, আপনার সন্তানের স্বাচ্ছন্দ্য ও আপনার স্ত্রীর মনস্তুষ্টি লইয়াই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই আপাতমধুর ক্ষণিক সুখলাভের আশায় আমরা আমাদের স্থায়ী ব্যবস্থার উচ্ছেদ-সাধন করিতে বসিয়াছি। আমরা এমনি অন্ধ যে, একবার চিন্তা করিয়াও দেখি না, কি সামান্য বস্তুলাভের জন্য সংসার-জীবনের কি অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিতেছি। আপনার সুখ আমাদের কাছে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, আমরা স্বচ্ছন্দে মাতা-পিতা, সহোদর-সহোদরা, আত্মীয়-বন্ধু, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, সকলের প্রীতির বাঁধন হেলায় ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত হই না। শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, আহারে-বিহারে, ক্রীড়ায়-ক্রন্দনে, সুখে-দুঃখে, আনন্দ-উৎসবে যে আমার একমাত্র

প্রাণের সাথী ছিল, আজ ঘৃণ্য স্বার্থ ও অর্থের দাস হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে লজ্জিত হইতেছি না। শুধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হই না; স্বভাবতঃ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সুযোগ পাইলে অন্যের দ্বারাও তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না। বিবাদ, মোকদ্দমা, অনিষ্টচিন্তা আমাদের নিত্য সাথী হইয়া পড়িতেছে। এই একান্নবর্ত্তিতার অভাবে ও পরস্পরের হিংসায়, পরস্পরের প্রীতি দিন দিন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমাদের এরূপ আচরণ শুধু প্রীতি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সামাজিক চক্ষুলজ্জাও দূর করিয়া দিয়াছে। যে আচরণ অন্যে করিতেও লজ্জিত হয়, আমরা অক্লেশে সে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কঠিন হইয়া গিয়াছে যে, অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও নিরন্ন সহোদরের সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেও দ্বিধা বোধ করি না। এই জীবনসঙ্কটের দিনে এই একান্ন-বর্ত্তিতার উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমানে যাঁহারা একত্রে আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। একপরিবারস্থ হিন্দু পরিবারের সকল সম্পত্তি ও সকল বস্তুতে সমান দাবী মহর্ষিমনু-প্রবর্ত্তিত হইলেও, আজ তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাঁহারা এক সংসারে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, মাত্র আহারই একস্থলে হইয়া থাকে, আবার তাহার ভিতরেও কোন কোন স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অপর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সকলই স্বতন্ত্র। উপার্জ্জনক্ষম-কনিষ্ঠ, উপার্জ্জনহীন জ্যেষ্ঠের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে কুণ্ঠিত নন; বধূদিগের মধ্যেও ঠিক সেই আচরণ। একই সংসারে থাকিয়া একজনের স্ত্রী অষ্টালঙ্কারে ভূষিতা, আর একজনের স্ত্রী জীর্ণবস্ত্র-পরিহিতা। কি বিষময় দৃশ্য! একজনের কন্যার বিবাহে দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, আর একজনের কন্যার বিবাহের জন্য দুইশত টাকা সংগ্রহ হইতেছে না। একজনের পুত্রগণ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, আর একজনের পুত্রের পাঠশালার বেতন জুটিতেছে না। সুতরাং এ প্রকার একত্র থাকায় পরস্পরের কোন প্রীতির বাঁধনই থাকিতে পারে না। আমাদের মনে হয়—পাখী উড়িতে না পারিয়া যেমন পোষ মানে, সেইরূপ উপার্জ্জনহীন ব্যক্তি বাধ্য হইয়া ধনবানের সহিত মিলিত থাকেন। তাহাদের এরূপ মিলন সুখের নহে। অন্নাভাবে

মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় সাময়িক প্রীতিবন্ধন মাত্র। কি কারণে দিন দিন এই উদার একান্নবর্ত্তি-প্রথা হ্রাস পাইতেছে, তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গৃহ-বিবাদ

নানা কারণে আমাদের ঘরের বউ-ঝির মন দিন দিন দুর্ব্বল ও স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে। আবার আমরা অনেক সময়ে স্বার্থপর হইয়া তাঁহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতে বিরত থাকি। এমনকি কখনও কখনও স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দিয়াও থাকি। আমাদের দুর্ব্বলতা, শিক্ষার অভাব প্রভৃতির সুযোগ পাইয়া পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, ঘর-ভাঙ্গানীর দল তাহাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছে, পাড়াদরদী আসিয়া কহিলেন—"আহা! বউমা, অনিল আমার এত টাকা রোজগার করে, কিন্তু আজও তোমার গায়ে একখানাও গয়না উঠেনি?" সরলা বধূ হাসিমুখে উত্তর করিলেন—"কেমন ক'রে হবে, ছোট খুড়ীমা! সংসারে অনেক খরচ, তাই কুলাইয়া উঠা ভার।" "ওমা! তোর আর কিসের খরচ, তোর একটী ছেলে ও একটী মেয়ে বইতো নয়? আর সব টাকাগুলি ত ভূতভুজ্জি হচ্ছে। অনিল আমার একেলে ছেলের মত নয়, তাই সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হচ্ছে। কিন্তু বউমা, পরিণামের ভাবনা ত ভাবতে হয়। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তোমারও পাঁচটি হ'তে চলল; তাদের মুখের দিকে চাওয়া ত দরকার। তার উপর লোকের সময়-অসময় আছে, শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে, সব দিক্ ভেবেচিন্তে সংসার করতে হয়। লোকে কথায় বলে—'পরের বিড়াল খায়, আর বন পানে চায়'। যতই কর না কেন, অসময়ে কিন্তু কেউ থাক্‌বে না। অনিল না হয় আমার বড় ভাল মানুষ, কিন্তু তুমি ত মা আমার ছেলেমানুষটী নও; তুমিও কি ছাই কিছুই বুঝতে পারছ না? দেখ বউমা! তোমাকে বড় ভালবাসি বলেই এ কথাগুলি বল্‌লুম, পরে বুঝতে পার্‌বে কিরণ বামনীই ঠিক কথা বলেছিল।"

সরলা বধূর কাণে দরদী এই যে বিষ ঢালিয়া দিয়া গেল, কালে তাহা অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ সংসারটীকে শ্মশানে পরিণত করিল। প্রথমে জায় জায়, ক্রমে ননদিনী ও শাশুড়ীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ হইতে চলিল। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সংসারে থাকিয়া সহসা পৃথক্ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িলে কেহ কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, কেহ বা সে স্থানে অস্বাস্থ্যের অছিলা করিয়া স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থলে বাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

সংসারে ঝগড়া-বিবাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্য কারণ হইতেই সুরু হয়। আজ অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক অমুকের বই ছিঁড়িয়া দিয়াছে; বালকের এরূপ বালসুলভ ব্যাপার লইয়া মায় মায় ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। আমরা দেখিয়াছি, যে সময়ে উক্তরূপে ঝগড়া লইয়া উভয় মাতা রণচণ্ডী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, ঠিক সেই সময়েই কলহপরায়ণ শিশু দুইটী গলা ধরাধরি করিয়া পরমানন্দে পুতুল খেলায় বিভোর। সুতরাং ইহাকে ঝগড়া কিরূপে বলি? ইহা স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যজনিত পরস্পরের প্রতি হিংসা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সকলে সাংসারিক কাজকর্ম্ম কখনও সমানভাবে করিতে পারে না। কারণ, কেহ দুর্ব্বল, কেহ বা সবল; কেহ বা কর্ম্মনিপুণ, কেহ বা কর্ম্মকুশলতাহীন; কাহারও বা পাঁচটী ছেলে মেয়ে, কাহারও বা একটী। সুতরাং তুল্য অংশে বা তুল্যরূপে সকল কার্য্য কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এক্ষেত্রে যদি পরস্পরের টান থাকে এবং সেই প্রীতিতে এ উহার সুসার সারিয়া লন, তবেই সংসার নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। তাহা না হইলে প্রতি পদে ঝগড়া, কিচকিচি আরম্ভ হয় এবং সংসার শীঘ্রই অশান্তিময় হইয়া উঠে।

ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র 'লাগালাগি'। সংসারে মানুষ মাত্রেরই অভাব-অভিযোগ, ভুল-ভ্রান্তি আছে। কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপ্রিয় আচরণে কাহারও মনে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলে ব্যথিত ব্যক্তি স্বভাবতঃ তাহার কষ্ট-লাঘবের জন্য কোন না কোন আত্মীয়ের নিকটে নিজের মনের দুঃখ প্রকাশ করেন। লোকে পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও এরূপ অভিযোগের কথা সময়ে সময়ে বলিতে বাধ্য হয়। যে তোমাকে একান্ত আপনার ভাবিয়া তাহার প্রাণের কথাটী তোমার নিকট বলিল,

কোন্ প্রাণে তুমি সেই কথাটী অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট লাগাইয়া দাও? লাগাইয়া দিয়াই বা কেমন করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাও? এ যে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা—এ যে মহাপাপ। যদি সংসারের এর কথাটী ওকে, ওর কথাটী একে না লাগান হয়, তাহা হইলে সংসারের পনের আনা বিবাদ কমিয়া যায়।

তাহার পর উপার্জ্জনের কথা। কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপার্জ্জন করেন, কাহারও স্বামী হয়ত কম উপার্জ্জন করেন। কাজেই সংসারের খরচ প্রথমার স্বামীকে অধিক দিতে হয়। তাহাতে যদি তিনি গর্ব্বিতা হয়েন এবং ঝগড়াঝাঁটির অছিলায় নির্ম্মম শ্লেষ করেন, তবে কতদিন আর তাহা সহ্য হয়? তাহার সে বিদ্রূপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সংসার ভাঙ্গিতে হয়। পরিবারস্থ উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি যদি সমদর্শী না হন, তিনি যদি নিজের ও নিজের স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অলঙ্কার-ঐশ্বর্য্যের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে থাকেন, তবেই পরিবারস্থ অপর সকলের মনে আঘাত লাগে, এবং স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও হিংসা জন্মিয়া থাকে; এইরূপেই প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়।

আজ তোমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভিতর থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছ ও যে প্রকারে একজন অন্য জনকে পৃথক্ করিয়া দিতেছ তাহা ত তোমাদের সন্তানগণের অগোচর থাকিতেছে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারাও সেইরূপ আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমারই উপার্জ্জনশীল পুত্রেরা যদি তোমারই উপার্জ্জনহীন পুত্রকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তখন তোমার মনে কিরূপ ব্যথা লাগে? জননী হইয়া, গৃহিণী হইয়া, সন্তানের প্রাণে অবহেলায় এ বিষ কখনও ঢালিয়া দিও না। ইহাতে তোমরাও জ্বলিয়া মরিবে, সন্তানেরাও জ্বলিয়া মরিবে।

উক্ত প্রকার কলহ-বিবাদ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় ইহার একমাত্র উপায় গৃহিণীদেরই হাতে। গৃহিণীগণ যদি আত্মসুখপরায়ণা না হন, তাঁহারা যদি স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হন, তাহা হইলে সংসার-জীবনে এ সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা যদি অন্যান্য জায়ের হাতের তাগাবালা গড়াইয়া দিয়া পরে নিজে তাগাবালা পরেন, তাহা হইলে সে সংসারে ঝগড়া-বিবাদ ঘটিতে পারে না, সে সংসার

অমৃতময় হয়। জননীগণ! আর্য্যবংশে আপনাদের জন্ম, হিন্দুর উচ্চ আসন আপনাদের জন্য; উর্ম্মিলাদেবী স্বীয় প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম, স্ত্রীজাতির একমাত্র আশ্রয়, স্বামী লক্ষ্মণকে, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, আর আপনারা সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাদের স্বামীর তুচ্ছ উপার্জ্জনের অংশ দিতে পারিবেন না? যাঁহার স্বামী উপার্জ্জনশীল, তাঁহার উপার্জ্জনের অংশ পাঁচজনে উপভোগ করে, সে কি দুঃখের কথা? নারী-জীবনে ইহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য।

জননীগণ! আপনারা স্নেহময়ী জগদম্বার অংশভূতা, কেমন করিয়া আপনারা অপরের শিশু-সন্তানের উপর 'দুই দুই' করেন? আপনাদের দুর্ব্ব্যবহারে যখন সুকুমার শিশু কাতর নয়নে আপনাদের মুখের দিকে চায়, তখন কি আপনাদের মাতৃহৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না? কেমন করিয়া অন্য শিশুকে বঞ্চিত করিয়া আপন সন্তানের মুখে সুমিষ্ট খাদ্য তুলিয়া দেন? তাহারা যখন ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তখন কি আপনার স্নেহভরা বুকখানি ফাটিয়া যায় না? যদি না যায়, আপনাকে হিন্দুনারী কেমন করিয়া বলিব? কুন্তীদেবী যে অপরের সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনার প্রাণপুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন। আপনার জা, ননদিনী ও সংসারস্থ অন্যান্য পরিজন যে আপনার ভগিনী-স্বরূপা, সঙ্গীস্বরূপা; কেমন করিয়া চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ বা অসদাচরণ করিতে পারেন? আপনার সুখ কি এতই বড়? সামান্য সুখের জন্য এই সকল আত্মীয়ের মনঃপীড়া দিতে কি আপনাদের একটুও বাধে না? এখন যে সামান্য কার্য্যের অছিলা করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়া করিতেছেন, পৃথক্ হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক কার্য্যের ভার নিজের ঘাড়েই ত লইতে হইবে। তবে অনর্থক সোনার সংসার ছারখারে দেন কেন? সংসার করিতে গেলে নানারূপ সুবিধা-অসুবিধা, নানাকার্য্যে মতের অমিল হইয়া থাকে সত্য, তাহা সহ্য না করিলে চলিবে কেন? আপনারা যদি একটু ধৈর্য্য ধারণ করেন, একটু কষ্ট সহ্য করেন, একটু যদি পরের প্রতি স্নেহশীলা হয়েন, তাহা হইলে বোধ হয় সাংসারিক বিবাদ-বিসম্বাদ সেই মুহূর্ত্তেই দূর হইয়া যায়। পরস্পর হাসিয়া খেলিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া সংসার করিলে, সংসার

আনন্দে পূর্ণ হয়, সংসারই শান্তির স্থান হয়, তখন সর্ব্ববিধ কল্যাণ আপনিই আসে; তাহাতে আপনাদের জীবন ধন্য হয় এবং পরিবারস্থ সকলে দরিদ্র হইলেও সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারেন।

দানপ্রার্থীর প্রতি কর্ত্তব্য

মানুষ যখন একান্ত দুর্দ্দশায় পতিত হয়, আর উপায়ান্তর দেখিতে পায় না, তখনই সে সাহায্য-প্রত্যাশায় প্রার্থিরূপে গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হয়। প্রত্যেক মানুষের একটা স্বাভাবিক লজ্জা আছে, যাহার জন্য সে সহজে ভিক্ষা করিতে চায় না। কিন্তু যখন সে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না, তখন জঠরজ্বালার তাড়নে সমস্ত লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া একান্ত কুণ্ঠিতভাবে প্রার্থিরূপে দণ্ডায়মান হয়। এই অবস্থায়ও যখন সে ভিক্ষালাভে অকৃতকার্য্য হয়, তখন গভীর নৈরাশ্যে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; দুঃখের আতিশয্যে অনেক সময় আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে। তাহাদের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিলে পাষাণ হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হয়। এই সব দুর্ভাগা বস্তুতঃই দয়ার পাত্র। কুললক্ষ্মীগণ কদাচ ইহাদিগকে বিমুখ করিবেন না। ভিক্ষুকগণ অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। সামান্য কিছু পাইলেই ইহারা দুই হাত তুলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রোগী প্রভৃতিকে নারায়ণজ্ঞানে যথাসাধ্য সেবা করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য; অন্যথায় ধর্ম্মলোপ হয়। আমাদের শাস্ত্রে গৃহস্থের জন্য প্রত্যহ দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেওয়া আছে। অপরাপর দান শক্তিতে না কুলাইলেও মুষ্টিভিক্ষাদান প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ম্ম। পুরুষগণ ভিক্ষুকের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলেও দয়াবতী পুরমহিলাগণের নিকট হইতে তাহারা প্রায়ই নিরাশ হয় না। অবশ্য দুই একস্থলে যে ইহার ব্যতিক্রম না দেখা যায়, তাহা নহে। দুঃখের বিষয় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, রমণী দয়ার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি; স্নেহ-করুণার

আধাররূপেই সৃষ্টবস্তু। করুণাময় ভগবান্ সৃষ্টিরক্ষার জন্যই পুরুষ অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে দয়া-মমতার অধিক সমাবেশ করিয়াছেন। যিনি এই পবিত্র দয়াগুণের অধিকারিণী হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া বলিতে পারা যায় না। অবস্থা চিরদিন কাহারও সমানভাবে যায় না। আজ আমার দান করিবার ক্ষমতা আছে, কাল হয়ত ভিক্ষুক হইতে পারি, তখন আমার অবস্থা কি হইবে? এইরূপ চিন্তা করিলে ভিক্ষুকের প্রতি সহানুভূতি স্বতঃই উদিত হয়। পুরললনাগণ যদি তাঁহাদের বিলাসিতার উপকরণ দুই একটা কমাইয়াও অন্ততঃপক্ষে কিছু কিছু দরিদ্রপোষণে মনোযোগ করেন, তবে অপব্যয় ঘটে না এবং গৃহস্থের ধর্ম্মও রক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে ভিক্ষুকগণের পোষণের ব্যবস্থা সরকারই করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাদৃশ কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যাপক ব্যবস্থা নাই। সুতরাং আমাদিগকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। পাশ্চাত্ত্যভাবের অন্ধ অনুকরণে আমরা এখন সনাতন আতিথ্যধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থপরতার পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছি। আশা আছে—আর্য্য নরনারীগণ আর্য্যধর্ম্মে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সনাতন আদর্শ বজায় রাখিবেন।

অতিথিসেবা ও ধর্ম্মকার্য্য

আমাদের শাস্ত্রে আছে :—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতিং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

"ভগ্নমনোরথ হইয়া অতিথি যদি গৃহস্থের বাটী হইতে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমুদয় পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের সমুদয় পুণ্য লইয়া চলিয়া যান।" অতিথিসেবা গৃহস্থমাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। সংসার-পালন যেমন গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, অতিথিসেবাও সেইরূপ সংসার-পালনের একটী প্রধান অঙ্গ। এই অতিথিসেবা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ভগবান্ তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে গৃহস্থের প্রতি একান্ত প্রীত হন এবং গৃহস্থের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করেন। এই সেবাধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার

জন্যই আর্য্যঋষিরা মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে ভূয়োভূয়ঃ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে কথিত আছে—"স্বয়ং ভগবান্ দরিদ্ররূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান; যে গৃহস্থ দরিদ্রসেবা করে না, দরিদ্রকে আশ্রয় দেয় না, সে ভগবান্‌কে তুচ্ছ করে, ভগবান্‌কে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে গৃহস্থের মঙ্গল হয় না, হইতেই পারে না।" ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীর আরাধনা না করিয়া যেমন জলগ্রহণ করিতে নাই, সেইরূপ দরিদ্ররূপী 'অতিথিনারায়ণের' সেবা না করিয়া গৃহস্থের জলগ্রহণ করিতে নাই।

দুঃখের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃই আমাদের দেশ হইতে এই সৎপ্রবৃত্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফলে—দেশে দিন দিন অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল গৃহস্থ যদি সমভাবে সাধ্যানুরূপ দরিদ্রসেবার ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় দেশের এত অধিক দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু এই সৎপ্রবৃত্তি লোপের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? আমরা বলি, আমাদের গৃহিণীগণ। কারণ, দেশ-কাল অনুসারে পুরুষেরা জীবিকার্জ্জনে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এসব সৎকার্য্য-সম্পাদনের অবসর তাঁহারা খুব কম পান। অনেক ক্ষেত্রে আবার অবসর পাইলেও দরিদ্রতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। কিন্তু সেবাপরায়ণা গৃহিণীর পক্ষে এসব সৎকার্য্য-সাধনের যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর আছে। যদি তাঁহাদের স্বামীরা এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাঁহারা সহজেই মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহাদিগের মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহাদের সহস্র আব্দার যদি স্বামীরা বহন করিতে সমর্থ হন, তবে এ শুভ আব্দারও সহজেই তাঁহারা সহ্য করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ অবশ্য পাঁচজনের জন্যই রন্ধনের আয়োজন করেন। তাহা হইতে যদি একজনের খাদ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেও বোধ হয় পরিজনবর্গের বিশেষ কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

ক্ষুধিতের মুখে অন্নদান যে কি পুণ্য, কি তৃপ্তি যাঁহারা সে অন্ন দান করেন, তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। আশ্রয়হীন, সহায়হীন, দরিদ্র উদরের জ্বালায় কাতর হইয়া আপনার দ্বারে আসিল, আপনি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন; সে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইল। সে যে কি যন্ত্রণা, তাহা একবার

ভাবিয়া দেখিলে বা সে যন্ত্রণা একবার অনুভব করিলে কেহ কি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? আপনারা প্রস্থতি—সন্তানের জননী; দরিদ্র আপনার সন্তানস্বরূপ। পুরুষেরা যা করে করুক, আপনি কোন্ প্রাণে সন্তানের অনাহার-ক্লেশ দেখিবেন? অবশ্য এমন হইতেছে না যে, নিত্য দলে দলে আপনার দ্বারে অতিথি আসিতেছে। যে দিন আসিল, সেদিন সন্তানের জন্য না হয় একটু কষ্টই করিলেন। সমস্ত জগতের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য আমরা বলিতেছি না। সাধ্যপক্ষে একজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ত পারেন। দাতা কর্ণের পুণ্যবতী স্ত্রী, তিনি ত আপনাদেরই মত একজন জননী। তিনি যে একদিন অতিথিসেবার জন্য স্বহস্তে প্রিয়পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এ গৌরব, এ মহিমা কি আপনাদের প্রাণে জাগে না? আপনারা হিন্দু-নারী, ধর্ম্মই আপনাদের সারসর্ব্বস্ব, পুণ্যই আপনাদের চির সহচর। অতিথিসেবায় বিমুখ হওয়ায় শকুন্তলার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা কি আপনাদের মনে নাই? অতিথিকে অবমাননা করায় তাঁহাকে যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইতে হইয়াছিল। নারীজীবনে যে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর নাই। অতিথিসেবার জন্য আপনাদের আদি জননী আর্য্যদেবীরা যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, আর আপনারা তাঁহাদেরই বংশে জন্মিয়া একগ্রাস অন্নও দিতে পারিবেন না?

আপনারা সহধর্ম্মিণী, আপনাদের সহযোগে ও সহায়তায় পুরুষের ধর্ম্মজীবন পূর্ণ হয়। কঠোর কর্ম্মশীল পুরুষের জীবনে আপনারাই শান্তিময়ী স্নেহধারা। আপনারা যদি ধর্ম্মপরায়ণা না হন, স্বামীর জীবনে শান্তিরসের সুধাধারা কেমন করিয়া প্রবাহিত হইবে? আপনারাই ত ব্রতপরায়ণা হইয়া স্বামীকে সংযমী করিয়া তুলিবেন; আপনারাই ত ভক্তিমতী হইয়া স্বামীকে ভক্তিমান্ করিয়া তুলিবেন। সংসারের সমস্ত কঠোরতা আপনাদের স্বামীর স্কন্ধে ন্যস্ত; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা, স্নেহ-মমতা আপনাদিগকেই আশ্রয় করিয়া আছে। আপনারা যদি সেই সমস্ত সদ্‌গুণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সংসার যে দানবের লীলাভূমি হইবে, ধর্ম্মের সংসার পাপে ছারখার হইয়া যাইবে। একদিকে পুরুষ যেমন আপনাদিগকে জগতের সমুদয় বিঘ্ন, সমুদয় বিপদ, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন, অন্যদিকে আপনারাও তাঁহাদিগকে সমুদয় নির্ম্মমতা, সমুদয় কঠোরতা, সমুদয় নৃশংসতা হইতে প্রেমের বন্ধনে ফিরাইয়া

আনিবেন! এই ত স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধ। একের অভাবে অন্যের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। পুরুষ কর্ম্ম, স্ত্রী ধর্ম্ম। পুরুষের সমুদয় কর্ম্মজীবনকে আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মালোকে চির উজ্জ্বল করিয়া তোলা আপনাদের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মহীন কর্ম্ম হইলে সে ত বিনাশের কারণ হয়। যাহা লইয়া আর্য্যনারীর মহত্ত্ব, যাহা লইয়া আর্য্যনারীর গৌরব, যাহা লইয়া আর্য্যনারীর অস্তিত্ব, আর্য্যনারী হইয়া বিলাসস্রোতে সেই চিরপবিত্র ধর্ম্মব্রত ভাসাইয়া দিয়া পিশাচিনী সাজিবেন না।

ব্রত-নিয়ম-পালন

আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার যুগে, আমাদের পিতৃপুরুষ-প্রবর্ত্তিত ব্রত-নিয়ম 'জঘন্য কুসংস্কার' বলিয়াই নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ধারণা হইয়াছে। হইবারও কথা; কারণ, যখন কোন জাতি পতনের মুখে অগ্রসর হয়, তখন আপাতমধুর এবং পরিণামবিরস জিনিসই তাহার কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। প্রচলিত ব্রত-নিয়ম মানবসমাজের কত কল্যাণ বিধান করে, মানুষকে কতবড় সংযমী করে এবং মনুষ্যত্বলাভের কিরূপ সহায়ক, তাহা এখন কেহ চিন্তা করেন না। হিন্দুশাস্ত্রের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত ও বিশ্ব-কল্যাণের নিমিত্তই লিপিবদ্ধ। ইহা তাঁহারা না জানিয়া বা জানিবার চেষ্টা না করিয়াই উপহাস করেন। ছন্দঃ প্রভৃতি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা-উপাসনাদির দ্বারা যেমন সহজে উপাস্যদেবতার অনুগ্রহ লাভ করা যায়, তেমনি শ্রদ্ধার সহিত ব্রত-নিয়ম-পালনে গৃহলক্ষ্মীগণের উন্নতি সাধিত হয়—একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। ব্রতকথায় যে সব ফললাভের কথা আছে আমাদের মনে হয়, ব্রত-নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিলে সেই সব ফললাভ এই জীবনেই অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন।

ব্রতের অর্থ নিয়ম। ব্রত-পালনের অর্থ আপনাকে নিয়মের ভিতর আনা; ব্রত-পালন করিতে উপবাস আবশ্যক। কারণ, উপবাসাদি দ্বারা সংযমশিক্ষা এবং উপাস্যের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ইহা 'উপবাস' শব্দের অর্থ দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

নিজেকে নিয়মে আবদ্ধ করিলে একাগ্রচিত্তে সর্ব্বকার্য্যসাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যদি উপবাসাদি দ্বারা দেহকে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া নিজের পাকস্থলীর ব্যাধিরও উপশম হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ?

যে ব্রত-পালন করিতে আরম্ভ করা হউক না কেন, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন-পণ করিয়া সেই ব্রত পালন করিলে ব্রত-পালনের ফল পাওয়া যায়। যদি কেহ একটী কাজ নানারূপ নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ হইয়া করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মনের শক্তি বাড়িবে, তাহাতে তিনি ভবিষ্যতে অনেক দুঃসাধ্য কার্য্যও করিতে পারিবেন। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে ব্রত পালন হয় না। একটী ব্রতে কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে সংসারের প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার ধৈর্য্যহীন হইবার সম্ভাবনা।

দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ঈশ্বরোপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা প্রধানতঃ আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা এই তিন অংশে বিভক্ত। শাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষভেদে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। স্ত্রীলোকের উপযোগী ব্রতাদিরূপ উপাসনাও —এই প্রধান তিন অংশ হইতে বাদ পড়ে নাই। প্রত্যেক ব্রতেই আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনাগুলি সুস্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভ এবং কাম্য অভিলাষ সিদ্ধ হইয়া থাকে ; ইহা কবির কল্পনা নহে, পরন্তু অভ্রান্ত সত্য। ব্রতের অঙ্গ—পূজা ও উপবাস দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া পবিত্রতা আসে এবং প্রার্থনা দ্বারা অভিলষিত-সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্য আবহমানকাল হইতেই আমাদের দেশে ব্রতাদির অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। আমাদের কুললক্ষ্মীগণ দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া সেই ব্রতেও বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ব্রত-নিয়ম-পালন প্রত্যহ করিতে হয় না, সুতরাং ইহাতে পরাঙ্মুখী হওয়া শ্রমশীলা হিন্দুললনাগণের কর্ত্তব্য নহে। আমরা আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবতী হইবেন।

সতীত্ব ও সহমরণ

আর্ত্তার্ত্তে মোদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে চ ম্রিয়তে পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥

যে রমণী স্বামীর দুঃখে দুঃখিতা, স্বামীর সুখে সুখিনী, স্বামী প্রবাসী হইলে মলিনা ও কৃশাঙ্গী হন এবং যিনি স্বামীর মরণে সহমৃতা হন, শাস্ত্রে তাঁহাকে পতিব্রতা রমণী কহে।

উক্ত শাস্ত্রবচন আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সুখে-দুঃখে, হর্ষে-বিষাদে পত্নী যখন পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যান, তাঁহার সকল অস্তিত্ব যখন স্বামীতে বিলীন হইয়া যায়, তখন যথার্থ তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সাধিত হয়। পতির সহিত এই একত্ব অর্থাৎ তাঁহার সকল কার্য্যে পূর্ণভাবে মিলিয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে, বিশিষ্ট সাধনসাপেক্ষ। সেইজন্য কুমারীকাল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষা ও সাধনা আবশ্যক।

পরমারাধ্যা শঙ্করপত্নী 'সতী' সতীত্বের পূর্ণমূর্ত্তি। তাঁহার সেই পুণ্যময় চরিত্র হইতে সতীত্বের উৎপত্তি। কুমারীগণ এই কারণেই জ্ঞানোদয়ের পর হইতে সতীর আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিবপূজানিরতা হন এবং এই কারণেই কুমারীকালে শিবপূজা শাস্ত্রের বিধান। আজকাল কুমারীগণের এই ব্রত লোকাচারে পরিণত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার মহত্ব কয়জন অভিভাবক, বালিকাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন? উদ্দেশ্যহীন কার্য্যের ফল যেমন অকিঞ্চিৎকর, বর্ত্তমান শিবপূজার ফলও সেইরূপ নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে। শিবপূজার সঙ্গে সঙ্গে কুমারীগণ যাহাতে সতীচরিত্র আলোচনা ও উপলব্ধি করিতে পারেন, প্রত্যেক অভিভাবকেরই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই পুণ্যব্রত সতীত্বলাভের সোপানস্বরূপ। ইহাতে একাধারে পুণ্য, পবিত্রতা, দেবভক্তি ও চরিত্র লাভ হয়।

বর্ত্তমানকালে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্র-বিশেষে কুমারীচরিত্রে সতীত্ববিরোধী রেখাপাত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বিবাহ এখন

কেনা-বেচার নামান্তর। যৌতুকের মূল্য-হিসাবে পাত্র নির্ব্বাচিত হয় এবং সে নির্ব্বাচন-প্রথাও একান্ত অভদ্রোচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ গুণ, চরিত্র, বংশমর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে। আশানুরূপ অর্থ পাইলেই সকল ত্রুটি সারিয়া যায়।

বিবাহক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিচার্য্য বিষয় কন্যার রূপ। সভামধ্যে সঙ্কুচিতা, শঙ্কিতা কুমারীকে লইয়া গিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, চলনভঙ্গী, বচনচাতুর্য্য; পরীক্ষা করা হয়। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে; নচেৎ সহস্রগুণের অধিকারিণী হইলেও সে কুমারীর বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। আবার পাত্র গিয়া স্বয়ং কন্যা দেখিয়া আসার প্রথাও বিরল নহে। কুমারী জানিল ইনি আমার ভাবী স্বামী; তাহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল। কিন্তু অর্থের অভাবেই হউক বা পাত্রের অনভিমতেই হউক বিবাহ হইল না। ইহাতে কি কুমারীর পাতিব্রত্যের উপর আঘাত করা হইল না?

শিক্ষিত আমরা, ভদ্র আমরা, সভ্য আমরা, ঘরের একটী কুমারী কন্যা লইয়া সাধারণ-সমক্ষে এরূপভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা করা কি আমাদের লজ্জার বিষয় নয়? ইহাতে কি আমাদের লজ্জাবোধ হয় না? পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিতের সাক্ষাতে এরূপভাবে রূপ সম্বন্ধে পরীক্ষিত হওয়া বয়স্থা কুমারীর পক্ষে যে কি সঙ্কোচ তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাই না? এরূপ ব্যবহার যে আমাদের জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, ইহা কি আমরা তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিই না?

তৃতীয়তঃ, হয়ত কন্যা পছন্দ হইল, পাকা দেখাশুনাও হইয়া গেল, কন্যা আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাত্রের গুণরূপাদির বিষয় ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিল; কুমারী মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল; তাঁহার চিন্তায় ও তাঁহার ধ্যানে কিছু কাল অতিবাহিত হইল; হঠাৎ দেনাপাওনা লইয়া কি বিসম্বাদ হইল, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন কি বিবাহসভা হইতে পাত্র উঠিয়া গেল। কুমারীর পবিত্র পাতিব্রত্য লইয়া এরূপ ধূলাখেলা করিতে আর্য্যসন্তানের কি লজ্জা করে না? কুমারী অবস্থায় যে-কোন পুরুষকে একবার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে কুমারী যে পতিতা হয়েন, হিন্দু হইয়া

একথা কি আমরা জানি না? সাবিত্রী, দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত কি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? আমাদের কর্ত্তব্য বিবাহ স্থিরসিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বে পাত্রসম্বন্ধীয় কোন কথা কোনরূপে কুমারীর কর্ণগোচর হইতে না দেওয়া, এবং যাহাতে এই বাজার-যাচাই প্রথা উঠিয়া গিয়া কুমারীগণের সম্মান রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

এ ত গেল সমাজের কথা। এক্ষণে নারীগণের সতীত্ব-ধর্ম্ম পালনের সম্বন্ধে দুই একটী কথা আলোচনা করিব। স্বয়ং ভগবান্ স্বামিরূপ ধারণ করিয়া সাধ্বী রমণীগণের সেবা গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। সুতরাং স্বামী ভগবানের স্বরূপ এ বিষয়ে সংশয় নাই। স্ত্রী-জীবনে স্বামিসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ। স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া ধর্ম্ম নাই, স্বামিসেবা বই কর্ম্ম নাই, স্বামিচিন্তা ব্যতীত ধ্যান নাই। সেইজন্যই আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ স্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি গুরুদেবকে প্রণামও স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বামিসেবা শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহা জীবনের সারসর্ব্বস্ব। যে অভাগিনী সে সুখে বঞ্চিতা, তাহার মত হতভাগিনী আর কে আছে? সাধ্বী রমণীরা কস্মিনকালে স্বামীর কোন কথার প্রতিবাদ করেন না। স্বামীর ব্যবহার সুখপ্রদ হউক, আর কষ্টকর হউক, সানন্দে তাহা সহ্য করেন। স্বামীর গুণাগুণ সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করা সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য নহে। কেবলমাত্র দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিলেই সতী হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে একান্তে স্বামিপরায়ণা হইতে হয়।

একজাতীয়া সাধ্বী রমণী আছেন, যাঁহারা জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও পুরুষ বলিয়া চিন্তা করেন না। আর একজাতীয়া রমণী আছেন, যাঁহারা স্বামী ভিন্ন অন্য সকলকেই সন্তানস্থানীয় দেখেন। সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপরের দুইটী মতই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হয়। অপর পুরুষকে ঐভাবে ভাবিলে এবং সে চিন্তা হৃদয়ে দৃঢ় হইলে পরপুরুষ-সম্বন্ধীয় কোন চিন্তাই আর মনে স্থান পায় না বা সামাজিক হিসাবে কোন হাস্যপরিহাসও চলিতে পারে না। সতীচরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ আমরা স্থানান্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি। সেই সমুদয় পুণ্যময় কাহিনীপাঠে সাধ্বী পাঠিকারা সবিশেষ ফললাভ করিতে পারিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সাধ্বীগণের চরমগতি সহমরণ। পূর্ব্বকালে তাঁহারা সানন্দে মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিতেন। সে কি মহিমময় দৃশ্য! সুস্থ দেহে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বধূবেশে সজ্জিতা হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিমুখে স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে স্বদেহ উৎসর্গ করা, আর্য্যনারীর কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিই ছিল। এ পুণ্যময় অনুষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্য, এ চির-উজ্জ্বল সতীত্বের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই আত্মা পবিত্র হয়। কিন্তু কালে যখন সে অন্তিমব্রত মাত্র লৌকিক প্রথায় পরিণত হইল, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অভিভাবকেরা যখন লোকনিন্দা ভয়ে বলপূর্ব্বক নারীদেহ দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন রাজশক্তি সে প্রথা উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইল। তদবধি মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সহমরণ উঠিয়া যায় নাই। বহু সতী এখনও স্বামীর মৃত্যুর পর অবলীলাক্রমে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে মিলিত হইবার জন্য চলিয়া যাইতেছেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আবার বৈধব্যের পর সাধ্বী রমণীরা যেভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা মৃত্যু ছাড়া আর কি? অশন-বসন, বিলাস-বিভ্রম, লালসা-কামনা, ভোগ-বাসনা, দৈহিক ও মানসিক সুখের পূর্ণ ত্যাগই কার্য্যতঃ মৃত্যু। জীবিতের যা কিছু শক্তি থাকে, সে শক্তিও তাঁহারা স্বামীর সন্তানের ও পরিজনবর্গের সেবায় নিতান্ত নিষ্কামভাবে নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং ব্রত-উপবাসাদিতে দেহ শুষ্ক করিয়া স্বামীচিন্তায় অতিবাহিত করেন। আকাঙ্ক্ষাময় সংসারে বাস করিয়া এ পবিত্র সন্ন্যাসব্রত পালন করা, বোধ হয়, সহমরণ অপেক্ষা আরও কঠিন, আরও শ্লাঘ্য, আরও পূজার্হ। সাধ্বী বিধবার পুণ্যময়ী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ভক্তিবিগলিত হয়? **হিন্দুজাতির এ অগৌরবের দিনে যদি কোন গৌরব থাকে, তবে তাহা তাহাদের সাধ্বী স্ত্রী ও ব্রতপরায়ণা আত্মত্যাগিনী বিধবা।**

ভারতের নারী

(২)

সতী-কথা

"প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল, লজ্জায় হোক্, ধর্ম্মোৎসাহে হোক্ প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন। বাংলার সেই প্রাণবিসর্জ্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনই সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ।"

—রবীন্দ্রনাথ

সতী

সতীত্বের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি 'সতী' ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা। শৈশব হইতে কঠোর সংযম সাধনা করিয়া তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। পাগল ভোলা শ্মশানে-মশানে পাগলবৎ ভ্রমণ করেন, ছাই-ভস্ম দেহে লেপন করিয়া আপনার ধ্যানে সদাই বিভোর থাকেন। রাজার নন্দিনী সতী তাঁহারই মত পাগলিনী সাজিয়া সেই পাগল ভোলার সেবা করিয়া ধন্য হন। জগতের ঐশ্বর্য্য উভয়ের নিকট সমান তুচ্ছ।

এক সময়ে দেবতাদের এক যজ্ঞ হয়, তাহাতে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। বড় বড় দেবতার মধ্যে অনেকেই দক্ষের জামাতা। দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবামাত্রই সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। করিলেন না কেবল পিতা ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণু এবং পরমযোগী মহাদেব। সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কেবলমাত্র দক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্য জামাতাদের মত— শ্বশুরকে কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। যিনি আত্মচিন্তায়—ভগবদ্ধ্যানে বিভোর, তাঁহার কি কোন লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান থাকে? দক্ষ মহাদেবের মহত্ত্ব না বুঝিয়া নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া মহাদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এইরূপ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে অজস্র গালি দিলেন। আশুতোষের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। দক্ষের এই তিরস্কারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তিনি সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিলেন। কেবলমাত্র করিলেন না তাঁহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাতা দেবাদিদেব মহাদেবকে। মনে ভাবিলেন, ইহাতে মহাদেবকে বিলক্ষণ অপমান করা হইল। দক্ষ প্রকৃতই অন্ধ, তাই তিনি না বুঝিয়া নিজের বিপদ্ নিজেই ডাকিয়া আনিলেন।

দক্ষযজ্ঞে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন, দক্ষের অন্যান্য কন্যারা সকলেই

আসিলেন। বাকী রইলেন কেবল সতী। সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই, কেননা তিনি মহাদেবের পত্নী।

নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছিল নারদের উপর। তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হইবে না।" নারদ চলিয়া গেলেন।

সতী মহাসমস্যায় পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা পিতা, অন্যদিকে তাঁহার একমাত্র আরাধ্য-দেবতা স্বামী। সতী স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্ম্মই করেন না। তিনি স্থির জানেন 'শিব' তাঁহার স্বামী, আশুতোষ কখনই তাঁহার পিতৃকৃত এই অপমান গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার পিতা শিবনিন্দা করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিতেছেন। এক্ষণে তিনি যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া শিবের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কন্যার উপযুক্ত কার্য্য করা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি এই অপমান সত্ত্বেও পিতৃগৃহে যাইবার জন্য স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভগিনীরা আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন ও করযোড়ে ভোলানাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রেমের সাগর ভোলানাথ সতীর মনোবাসনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। নন্দী মাতাকে লইয়া দক্ষালয়ে চলিলেন। মহাদেব সতীর ভাবী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্থির-ধীর-গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

সতীর মাতা সতীকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। সতীও অনেক দিন পরে মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সতীর অন্যান্য ভগিনীদের বড় বড় দেবতাদের সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের বেশভূষার সীমা নাই। সতীকে নিরাভরণা দেখিয়া সকলে দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সতীর মত হতভাগিনী আর কেহ নাই, এক ভিখারীর হাতে পড়িয়া সতীর কোন সাধই মিটিল না।" কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেই সতীর ও তাঁহার ভিখারী স্বামীরই সৃষ্ট। যাঁহারা সকলকে ঐশ্বর্য্য দেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যে স্পৃহা হইবে কেন?

সতী যজ্ঞসভা দেখিতে চলিলেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে

দাঁড়াইয়া রহিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও মহাদেবের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট কটূক্তি করিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে আসার জন্য সতীকেও বিলক্ষণ অপমানিত হইতে হইল। পিতার দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। বলিলেন, "আমার স্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেন নাই। বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াছি আমি, আপনি আমাকে তিরস্কার করুন। স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা, আমার সম্মুখে আপনি তাঁহার নিন্দা করিবেন না।" সতীর কথায় দক্ষ আরও অধিক রাগান্বিত হইলেন এবং শিবকে আরও অধিক দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। সতী অস্থির হইলেন; তখনও দক্ষ অজস্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সতী কম্পিতা হইলেন, স্বামিনিন্দা আর সহ্য করিতে পারিলেন না; ভোলানাথের অভয়পদ ভাবিতে ভাবিতে সতী নিজের সতীত্ব মহিমায় যোগাগ্নি সৃষ্টি করিয়া সমস্ত দেবতা, সমস্ত ঋষিগণের সাক্ষাতে সেই অগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন। দক্ষ স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সতীত্বের বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

নন্দী নিকটেই ছিলেন। মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি উন্মত্তের মত কৈলাসে ছুটিয়া গিয়া মহাদেবের নিকটে সব বলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবের কিছুই অগোচর ছিল না; সতী-শোকে তিনি অধীর হইলেন। উন্মত্তের মত 'হা সতি! হা সতি!' বলিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, দেবতারা প্রমাদ গণিলেন। মহাদেব মস্তকের একগাছি জটা ছিঁড়িয়া মাটিতে আঘাত করিলেন। সহসা সংহারমূর্ত্তি বীরভদ্রের সৃষ্টি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দিকে ছুটিলেন, অনুচরেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মুহূর্ত্তে যজ্ঞসভা লণ্ডভণ্ড হইল; বীরভদ্র দক্ষের মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিলেন; ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলাইল। অনেকের দুর্দ্দশার সীমা থাকিল না। শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল।

মহাদেব উন্মত্তের মত যজ্ঞস্থলে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহারই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া আছেন। তিনি সেই শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং উন্মাদের মত শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, জগতের কোন চিন্তাই আর তাঁহাতে স্থান পাইল না।

পার্ব্বতী

মহাদেব সতীর শব স্কন্ধে লইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংহারকর্ত্তা সংহারকার্য্য ভুলিয়া, জগতের চিন্তা ভুলিয়া, আজ সতী শোকে উন্মাদ। দেবতারা বড় চিন্তিত হইলেন; সকলে মিলিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু দেখিলেন, সতীর শব মহাদেবের নিকট হইতে পৃথক করিতে না পারিলে, আর কোনও উপায় নাই। সুতরাং অলক্ষ্যে সুদর্শনচক্রের দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৫২ অংশে বিভক্ত হইয়া দেহখানি ভারতের ৫২ স্থানে পড়িল। প্রত্যেক স্থান মহাপীঠস্থানে পরিণত হইল। সতী-মহিমার পবিত্র কীর্ত্তি সেই সকল পীঠস্থান আজও পর্য্যন্ত সকলের নিকট পূজিত হইয়া আসিতেছে।

মহাদেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সতীর দেহ আর তাঁহার স্কন্ধের উপর নাই, তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, তাঁহার আরও অধিক বৈরাগ্যভাব আসিল। শ্মশানে-মশানে আর ভ্রমণ না করিয়া তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত প্রদেশে মহাতপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত; কে জানে তাঁহার কিসের কামনা! বুঝি পুনরায় সতীলাভের জন্যই এই তপস্যা!

পর্ব্বতরাজ হিমালয় ও তাঁহার সাধ্বী-স্ত্রী মেনকার অনেকগুলি সন্তান। মৈনাক তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজদম্পতী বহুকাল হইতে ভগবতীকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ও প্রেমের সাগর ভোলানাথের প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে বহুদিনের আরাধ্যধন ও ভোলানাথের তপস্যার ফল 'সতী' ভূমিষ্ঠ হইলেন। আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। তিনি শশিকলার মত দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। সতীর সৌন্দর্য্য শরীরে আর ধরে না, তাঁহার মুখের তুলনা নাই, তাঁহার চরণের তুলনা নাই, তাঁহার গতির তুলনা নাই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যরাজি যেন একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সতীর চরণভরে স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিত,

নূপুরনিক্বণে কলহংস লজ্জা পাইত। আদর করিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকিত পার্ব্বতী, কেহ ডাকিত গৌরী, কেহ ডাকিত উমা। সখীদের সঙ্গে পুতুলখেলায় পার্ব্বতীর কতই আনন্দ; মাটির শিবই তাঁহার পুতুল। কখনও সেই মাটির শিব লইয়া তিনি খেলা করিতেন, কখনও তাঁহার পূজা করিতেন, কখনও তাঁহার বিবাহ দিতেন। এই পুতুলখেলায়—তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন।

ক্রমে ক্রমে পার্ব্বতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। সৌন্দর্য্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বজন্মের বিদ্যা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের সহিত পার্ব্বতী মাটির শিবের পূজা করিতে লাগিলেন। কন্যার এইরূপ গুণ ও শিবপূজার এই আসক্তি দেখিয়া মহাদেবকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া হিমালয় তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি পাছে অস্বীকার করেন, এজন্য মহাদেবের কোন অনুমতি চাহিতে তাঁহার সাহস হইল না।

একদিন নারদ আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, মহাদেবের সহিতই তাঁহার পার্ব্বতীর বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সখীদের সহিত পার্ব্বতী তপস্যা-নিরত মহাদেবের নিকট যাইয়া তাঁহার পূজা করিতেন। মেনকা প্রথম প্রথম বারণ করিতেন; কিন্তু নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি তিনি ও হিমালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পার্ব্বতীকে শিবপূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন; উদ্দেশ্য পার্ব্বতীকে দেখিয়া যদি মহাদেব স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহা হউক, পার্ব্বতী এখন হইতে প্রত্যহ সখীদের সঙ্গে শিবপূজা করিতে যাইতেন। এখন আর মাটির পুতুল নহে, স্বয়ং শিবই তাঁহার উপাস্য দেবতা।

এদিকে দেবতাগণ তারকাসুরের উৎপাতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সকলেই নিজের নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশিষ্টরূপে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরে তারকাসুর অজেয়, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন না। একদিন দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "একমাত্র শিবের পুত্রই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, অন্যথা কোন উপায় নাই। কিন্তু শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্ন; যদি গিরিরাজ কন্যা পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব।" দেবতারা সকলে মিলিয়া

মদনকে হিমালয়ে পাঠাইলেন ; আশা—মদনই শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবেন।

একদিন পার্ব্বতী যথারীতি শিবপূজায় আগমন করিয়াছেন। মদনও অবসর বুঝিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে বসন্তও আসিয়াছে। বসন্তের আগমনে হিমালয় নূতন শ্রী ধারণ করিল ; মোহনবেশে মদন উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পার্ব্বতী মহাদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পদ্মবীজের মালা তাঁহার হস্তে দিতেছেন, ভক্তবৎসল মহাদেবও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে মদন ফুলধনুতে সম্মোহন নামক শর যোজনা করিলেন। মহাযোগী ক্ষণিক বিচলিত হইয়া পার্ব্বতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, পরে আত্মদমনপূর্ব্বক নিজের চিত্তবিকৃতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখেন—সম্মুখে মদন। অমনি তৃতীয় নেত্র ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল, অগ্নিজ্বালা সবেগে ছুটিল, মুহূর্ত্তে মদন ভস্মীভূত হইল। দেবতারা আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। মহাদেব অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, পার্ব্বতী ক্ষুণ্ণমণে গৃহে ফিরিলেন।

পার্ব্বতী এখন বুঝিলেন, রূপে শুদ্ধপ্রেমের সম্ভব হয় না। বিনা সংযমে, বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায় প্রেম-লাভ হয় না। সুতরাং পরা-প্রেম-লাভের নিমিত্ত তিনি মহাতপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া তিনি বল্কল ও চীরবাস ধারণ করিলেন। অনাহার, অনিদ্রা ও সর্ব্ববিধ কঠোরতা সহ্য করিতে লাগিলেন। শীতকালে আকণ্ঠ শীতল জলে দাঁড়াইয়া, দারুণ গ্রীষ্মে চারিপার্শ্বে ভীষণ অগ্নি জ্বালাইয়া, যোগিনীবেশে যোগ করিতে লাগিলেন। মুখে শুধু শিবনাম, হৃদয়ে শুধু অভীষ্টদেবতা, হৃদয়দেবতার অভয়পদচিন্তা। এইরূপে বহুকাল গত হইল ; হিমালয় তাঁহার সোনার পার্ব্বতীর এই অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন।

মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তবৎসল ভোলানাথ এইরূপ তপস্যায় ভক্তের নিকটে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর নিকট আসিয়া দেখা দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জন্য পার্ব্বতী তপস্যা করিতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি পার্ব্বতীর ভক্তি-পরীক্ষার জন্য কৃত্রিম বিদ্রূপের সহিত শিবের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন এবং শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে নিকৃষ্ট,

তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে যথেষ্ট দুঃখভোগ করিতে হইবে, অন্য দেবতার সহিত বিবাহ হইলে বিলক্ষণ সুখভোগের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বলিয়া পার্ব্বতীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী এই শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন। মুহূর্ত্তে ছদ্মবেশ অন্তর্হিত হইল। তাঁহার উপাস্যদেবতা, তাঁহার হৃদয়দেবতা সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। পার্ব্বতীর তপস্যা সিদ্ধ হইল।

হিমালয় ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং সত্বরই বিবাহের আয়োজন করিলেন। হিমালয় স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দেবতারা মহানন্দে বিবাহোৎসবে যোগদান করিলেন। ভোলানাথ তাঁহার হারানো সতী ফিরিয়া পাইলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শিবের অনুগ্রহে মদনও পুনরায় জীবন পাইলেন।

সাবিত্রী

অতি পূর্ব্বকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার কোন সন্তানাদি হয় না; অবশেষে সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিয়া তিনি এক কন্যা লাভ করিলেন এবং তাঁহার নাম রাখিলেন 'সাবিত্রী'। দেবতার বরে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবিত্রী দেবতার ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। রূপের প্রভায় দিগন্ত আলোকিত হইল। কন্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর উপযুক্ত পতি মিলিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অশ্বপতি কন্যাকে স্বয়ং পতির অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন। পিতার আদেশে সাবিত্রী পতির অন্বেষণে স্বয়ং বহির্গত হইলেন।

বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সাবিত্রী অবশেষে এক তপোবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। শাল্বদেশের রাজা দ্যুমৎসেন বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে,

তাঁহার শত্রুগণ কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পত্নী সুবর্চ্চা ও পুত্র সত্যবান্‌কে লইয়া ঐ তপোবনে বাস করিতেছিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের সাক্ষাৎ হইল। সাবিত্রী সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে মনে মনে স্বামিরূপে বরণ করিলেন। সিদ্ধমনোরথ হইয়া সাবিত্রী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও "তপোবনবাসী সত্যবান তাঁহার স্বামী" এই কথা পিতাকে বলিলেন। নারদ এ বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন—"সত্যবান্ অল্পায়ুঃ, অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার মৃত্যু হইবে।" অশ্বপতি সাবিত্রীকে অন্য কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন। সাবিত্রী কহিলেন—"আমি মনে মনে সত্যবান্‌কেই স্বামিরূপে বরণ করিয়াছি, পুনরায় অপরকে কিরূপে বিবাহ করিব? সত্যবান্ অল্পায়ুঃ হইলেও তিনি আমার স্বামী।" কন্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানিয়া অশ্বপতি বাধ্য হইয়া তপোবনে দ্যুমৎসেনের নিকট গমন করিলেন এবং শুভক্ষণে সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতার সহিত তপোবনেই রহিলেন।

নারদের বাক্য সাবিত্রীর মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিল। তিনি সর্ব্বক্ষণই সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের তিন দিন পূর্ব্বে তিনি স্বামীর মঙ্গলকামনায় ত্রিরাত্রব্রত আরম্ভ করিলেন। অবশেষে সেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইল।

সত্যবান্ যথারীতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্য বনে চলিলেন। সাবিত্রী সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, সত্যবান্ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অগত্যা সত্যবান্ তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। সাধ্বী স্বামীকে যেন গণ্ডীর মধ্যে বেষ্টন করিয়া চলিলেন।

কাঠ কাটিতে কাটিতে সত্যবানের অত্যন্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। সত্যবানের চেতনা লোপ পাইল। ভীষণ রাত্রি উপস্থিত হইল। বনের অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকারকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে এক দেবজ্যোতি বিকশিত হইয়া উঠিল; সাবিত্রী চাহিয়া দেখেন—হস্তে দণ্ড, মস্তকে কিরীট, অঙ্গে

জ্যোতিঃপুঞ্জ—এক বিরাট্ মূর্ত্তি! সাবিত্রী প্রণাম করিলেন। দেবতা কহিলেন—"মা সাবিত্রী, আমি ধর্ম্মরাজ যম, তোমার স্বামীর পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে। আমার অনুচরেরা তোমার সতীত্বতেজে অগ্রসর হইতে পারিল না, আমি স্বয়ং আসিয়াছি; তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহে গমন কর। মর্ত্ত্যবাসী সকল জীবের অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, আমি আশা করি তুমি এজন্য দুঃখ করিবে না।" যমরাজের অনুরোধে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছুদূর সরিয়া গেলেন। মৃত্যুরাজ সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষমূর্ত্তি বাহির করিয়া তাহা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রীও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে তাঁহার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। সাবিত্রী যমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবলই তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন এবং কহিলেন—"পিতঃ, আপনি বলিলেন 'মৃত্যুই বিধির বিধান', আবার সেই বিধির বিধানেই সতীর আত্মা পতির আত্মার সহিত চির-অবিচ্ছিন্ন; সুতরাং নারী স্বামীর অনুসরণ করিতে বাধ্য। অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন কেন?" ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমি তোমার ধর্ম্মজ্ঞানে পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। স্বামীর পুনর্জ্জীবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী কহিলেন—"আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাভ করুন।" যমরাজ কহিলেন—"তথাস্তু"। আবার কিছুদূর গিয়া যম পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিত্রীকে উন্মাদিনীর ন্যায় আসিতে দেখিয়া বলিলেন—"বৎসে! তোমার স্বামীর আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, তুমি গৃহে গমন কর; তোমার উপর আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পতি ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বর প্রার্থনা করিলেন—"আমার শ্বশুর হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হউন।" যম উত্তর করিলেন "তথাস্তু"। সাবিত্রী পুনরায় চলিতে লাগিলেন। যম কহিলেন—"অনর্থক কেন আসিতেছ? গৃহে যাও।" সাবিত্রী বলিলেন—"আমি গৃহে ফিরিতে অসমর্থ; কি এক অলক্ষ্য শক্তি যেন আমাকে স্বামীর পশ্চাতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যেখানে স্বামী থাকিবে সেইখানেই স্ত্রী থাকিবে। আমার আত্মা ত পূর্ব্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইতেছে।" আবার যমরাজ বলিলেন—"স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বলিলেন—"আমার পিতার পুত্র হউক।" যমরাজ "তথাস্তু" বলিয়া চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীকে আবার পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া যমরাজ বলিলেন—"মা, তুমি বড়

অবোধের ন্যায় কাজ করিতেছ। স্বামী পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে স্ত্রীরও কি সেখানে যাইতে হইবে?" সাবিত্রী বলিলেন—"ধর্ম্মরাজ, স্বামী জীবিতই হউন আর মৃতই হউন, স্ত্রীলোক স্বামীর পূজা করিবেই। স্ত্রীর সহিত স্বামীর ইহকাল-পরকালের সম্পর্ক। স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সঙ্গিনী। অতএব স্বামীর পাপে স্ত্রী নরকে যাইতেও প্রস্তুত, পৃথগ্‌ভাবে স্বর্গে যাইতেও প্রস্তুত নয়।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন—"তোমার ধর্ম্মজ্ঞানে অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু কি করিব, আয়ু শেষ হইলে কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। অতএব তুমি স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য সব বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী কহিলেন—"পিতঃ, যখন এত অনুগ্রহ করিলেন তখন সত্যবানের পুত্র রাজা হইবে এই বর দিন।" যমরাজ সাবিত্রীর কথায় এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"তথাস্তু"। সাবিত্রী আশ্বস্ত হইলেন; বুঝিলেন স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। তিনি পুনরায় যমরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। যম এইবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন—'তোমার প্রার্থিত সকল বরই দান করিয়াছি, আর কি তোমার প্রার্থনা করিবার আছে? তোমার স্বামীর জীবনকাল শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আর কোন উপায় নাই, তুমি গৃহে গমন কর।" সাবিত্রী কহিলেন—"ধর্ম্মরাজ, এইমাত্র আপনি বলিলেন যে, সত্যবানের পুত্র রাজা হইবে; তিনি ত মৃত, তবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আপনার বাক্য কি অন্যথা হইবে?" ধর্ম্মরাজ চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট তিনি পরাস্ত হইয়াছেন। সন্তুষ্টচিত্তে ধর্ম্মরাজ সত্যবানকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। অকপট অব্যভিচারিণী পতিভক্তির নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যুদেবতাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে লইয়া হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। সত্যবান্ যেন নিদ্রা হইতে উঠিলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদও জানেন না। রাত্রি হইয়াছে, অথচ সাবিত্রী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। পরে সাবিত্রীর মুখে তাঁহার মহানিদ্রার কথা ও তাঁহার চেষ্টায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন শুনিয়া ধন্য হইলেন।

সত্যবান ও সাবিত্রীকে বহুক্ষণ দর্শন না করিয়া অন্ধ রাজা ও তাঁহার পত্নী বড়ই শোকাকুল হইলেন। সহসা অন্ধের নয়ন দর্শনক্ষম হইল; উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সত্যবান্ ও সাবিত্রী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কুটীরে আগমন করিলেন। তাঁহাদের নিকট

সমস্ত শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজা ও রাণী সাধ্বী-সতী সাবিত্রীকে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন। অপুত্রক পিতার শতপুত্র হইল। সাবিত্রী পুত্রের জননী হইয়া রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য যমের নিকটে যাইতেও ভীত হন না।

অনসূয়া

ভারত-রমণীর সতীত্বের অন্যতম উজ্জ্বল আদর্শ—ঋষিপত্নী অনসূয়া। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রির সহধর্ম্মিণী। তৎকালে ইঁহার সতীত্বমহিমা বিশ্ববিশ্রুত ছিল। কেবলমাত্র পাতিব্রত্য দ্বারাই ইনি অসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে মহর্ষি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অগত্যা অনসূয়াকেই অতিথি-সৎকারের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি যথাবিধি পাদ্য-অর্ঘ্যাদি প্রাথমিক আতিথ্য প্রদানপূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত অতিথিগণের জন্য যথাশক্তি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণগণকে আহারার্থ আহ্বান করিলেন। খাইতে বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—"আমরা প্রত্যেকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন ব্যক্তি পরিবেশন করিলে আমরা সে অন্ন স্পর্শ করিব না।" অতিথিগণের এই কথায় সাধ্বী অনসূয়া মহাসমস্যায় পড়িলেন। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ভোজনের আসনে উপবিষ্ট—স্বামী কখন আসিবেন তাহার কোন ঠিক নাই; তিনিই বা কেমন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণের সম্মুখে বস্ত্রাচ্ছাদিত না হইয়া পরিবেশন করিবেন? অভুক্ত অতিথি বসিয়া থাকিলে বা উঠিয়া চলিয়া গেলে আশ্রমধর্ম্মের হানি হয়; অথচ পরিবেশন করিতে গেলে সতীত্বধর্ম্ম ব্যাহত হয়। এখন সতী উভয়সঙ্কটে পড়িয়া সঙ্কটহারী মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া মন্ত্রপূত জল অতিথিগণের মস্তকে ছিটাইয়া দিলেন। সতীত্বমহিমায় তৎক্ষণাৎ

অতিথিগণ সদ্যোজাত শিশুর আকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন অনসূয়া শিশু তিনটিকে কোলে লইয়া তাহাদিগকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন।

এদিকে সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং পার্ব্বতী- স্ব স্ব স্বামীর অদর্শনে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ত্রিমূর্ত্তির এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিতা হইলেন এবং তাঁহাদের উদ্ধার-মানসে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যার ফলে তথায় দেবাদিদেবের আবির্ভাব হইল এবং ত্রিমূর্ত্তি তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইলেন। অনসূয়া যখন দেখিলেন যে, অতিথিত্রয় ছদ্মবেশী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, তখন তিনি তাঁহাদের পদতলে পড়িয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রিমূর্ত্তি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অনসূয়া বলিলেন যে, "যদি আপনারা আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে বর দিন যে, আমি যেন আপনাদের মত গুণসম্পন্ন পুত্র লাভ করি।" মূর্ত্তিত্রয় 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কালক্রমে ইঁহার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের অবতারস্বরূপ মহর্ষি দত্তাত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন। সতী অনসূয়া সতীত্ব মর্য্যাদায় চিরদিনই পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

অরুন্ধতী

ভারতের নারীকুলশিরোমণি বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী। সতীত্বের এমন গরিমাময় আদর্শ, এমন বিদুষী ও ক্ষমতাপরায়ণা তাপসী নারী ভারতের চিরযুগের পূজা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। যজ্ঞাগ্নি হইতে যাঁহার জন্ম, যিনি আজীবন পূতচরিত্রা ও শুদ্ধচিত্তা, তিনি যে সকল নারীর আদর্শের পাত্রী হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

শাস্ত্রে লিখিত আছে—ব্রহ্মার মানসকন্যা সন্ধ্যাই অরুন্ধতীরূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। লোহিত সাগরের তীরে চন্দ্রভাগা নামে এক পর্ব্বতে ইনি আরাধ্য দেবতা

বিষ্ণুর সাক্ষাৎলাভের আশায় বহুকাল তপস্যা করিলেন; কিন্তু অতি কঠোর তপস্যাতেও বিষ্ণুর সাক্ষাৎলাভ হইল না। তপস্যার ত্রুটি কিছুই হয় নাই, তথাপি আরাধ্যদেব সাক্ষাৎ দিলেন না কেন, এই চিন্তায় সন্ধ্যার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। শাস্ত্রে বলে, কোন ইষ্টগুরুর নিকট দীক্ষা না লইলে তপস্যা সফল হয় না। তপস্যা আরম্ভের পূর্ব্বে অরুন্ধতী কোন দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে এরূপ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে প্রজাপতি ব্রহ্মার দয়া হইল। সন্ধ্যাকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবকে পাঠাইলেন। সন্ধ্যা বশিষ্ঠের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার সন্ধ্যার কঠোর তপস্যায় আরাধ্যদেব স্বয়ং আসিয়া সন্ধ্যাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা সুখশান্তি, ধন-ঐশ্বর্য্য, রাজবৈভব প্রভৃতি কিছুই না চাহিয়া শুধু পাতিব্রত্য বর প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন—"এ জন্মে তোমার এই তপস্যার জন্য তুমি মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ জন্মে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে। তুমি এ জগতে সতীত্বের চরম আদর্শ রাখিয়া অবশেষে স্বামীর সহিত নক্ষত্রমণ্ডলে চিরদিন বাস করিবে।"

কিছুকাল পরে চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ এক তপোবনে মেধাতিথি ঋষি জগতের মঙ্গলের জন্য জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। স্বর্গের সকল দেবতাই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হইতে সকল দেবতাই মেধাতিথির যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। যজ্ঞশেষে ভস্মরাশি সরাইবার সময় তিনি সেই ভস্মমধ্যে এক পরমাসুন্দরী শিশু-কন্যা দেখিতে পাইয়া খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল—"ইনি ব্রহ্মার মানসকন্যা; পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া জগতে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিলেন।"

মেধাতিথি তৎক্ষণাৎ শিশু-কন্যাটিকে কোলে লইয়া খুব আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন ইহার নাম রাখিলেন 'অরুন্ধতী', অর্থাৎ যিনি কোন কারণে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন না।

খুব কম ঋষিই বিবাহ করেন এবং ইঁহাদের সন্তানাদি কমই হয়, কিন্তু প্রত্যেক ঋষির শিষ্য থাকে অনেক। মেধাতিথির আশ্রমেও বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল।

মেধাতিথি, তাঁহার পত্নী ও বহু শিষ্যের অপার স্নেহে ও পরম যত্নে অরুন্ধতী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যখন অরুন্ধতী সকল রকম স্ত্রীশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইলেন, যখন তাঁহার হৃদয় জ্ঞানে, করুণায়, শুচিতায় পূর্ণ হইল, যখন যৌবনের পরিপূর্ণ রূপলাবণ্য সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল, তখন সকলে দেখিলেন একটী সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা।

অরুন্ধতী যৌবনে পদার্পণ করিবার কিছুকাল পরেই দৈবক্রমে মেধাতিথির আশ্রমে বশিষ্ঠদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতীর প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হইলেন। অরুন্ধতীও বশিষ্ঠদেবকে দেখিয়া বিচলিতা হইলেন। মনে হইল, ইনিই যেন তাঁহার ইহকালের ও পরকালের দেবতা। অরুন্ধতী এই ভাবান্তরের কথা ঋষিপত্নীর নিকটে গিয়া কহিলেন। ঋষিপত্নী কহিলেন, "মহর্ষি বশিষ্ঠদেবই এ জগতে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ। গত জন্মে ইনিই তোমাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়াই তুমি বিষ্ণুর সাক্ষাৎ-দর্শনলাভ করিয়াছিলে। ব্রহ্মার ইচ্ছায় ইনিই এ জন্মে তোমার স্বামী হইবেন। এই মহর্ষির সেবা করিয়াই তুমি জগতে সতীত্বের আদর্শ রাখিয়া যাইবে।"

ঐ আশ্রমে বশিষ্ঠদেবের হঠাৎ আগমনে মেধাতিথি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ ঋষি বুঝিলেন অরুন্ধতীর বিবাহকাল উপস্থিত বলিয়া দৈবক্রমে বশিষ্ঠদেব তাঁহার আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। তিনি বশিষ্ঠদেবের নিকট অরুন্ধতীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বশিষ্ঠদেব কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে স্বর্গের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মেধাতিথি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের হস্তে তাঁহার বড় আদরের, বড় স্নেহের কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। দেবতারা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বিবাহের পর স্বামীর সেবাই অরুন্ধতীর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি ধন্যা হইলেন।

কালে সতী অরুন্ধতী শতপুত্র প্রসব করেন। পুত্রগণও বশিষ্ঠদেবের ন্যায় সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী হইয়াছিলেন। পুত্রপালনকালেও অরুন্ধতী কোনদিন স্বামিসেবা ভুলিয়া যান নাই। অরুন্ধতীও স্বামীর ন্যায় ক্ষমাশীলা ছিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে

শত পুত্রের নিধনে যেদিন বশিষ্ঠ ক্ষমা ও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেদিন অরুন্ধতী স্বামীর ক্রোধ নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ মহাপাপে লিপ্ত হইতে দেন নাই। তখনকার ব্রাহ্মণ বা ঋষি তাঁহাদের ভগবদ্-তুল্য শক্তির প্রভাবে কোন কোন স্থলে ব্রহ্মশাপ দিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয় করিতে বাধ্য হইতেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আবার বহুকাল কঠোর সাধনা করিয়া পাপক্ষালন করিতেন। কিন্তু বশিষ্ঠদেব অরুন্ধতীকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে পাইয়া ঐরূপ পাপে কোন দিন লিপ্ত হন নাই।

এ জগতে বহুকাল সংসার করার পর অরুন্ধতী স্বামীর সহিত স্বর্গে যাইয়া তাঁহার সহিত এখনও বসবাস করিতেছেন। আজ পর্য্যন্তও ইঁহারা সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকিয়া আমাদের পুণ্যকর্ম্মের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। উত্তর আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের নীচেই এই সপ্তর্ষিমণ্ডল। এই সাতটী নক্ষত্রের মধ্যে যে উজ্জ্বল ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটী বশিষ্ঠের সহধর্ম্মিণী সতীশিরোমণি অরুন্ধতী।

কত হাজার বৎসর আগে অরুন্ধতী স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সতীত্ব-মহিমা আজও বিলীন হয় নাই। আজও সেই পুণ্যমহিমা চির-উজ্জ্বল। হিন্দুনারীর বিবাহের সময়ে এই সতীর নাম ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে হয়, এবং বর কন্যাকে আকাশে অরুন্ধতীকে দেখাইয়া দেন। কন্যাও অরুন্ধতীকে লক্ষ্য করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করেন—

"হে অরুন্ধতি! আমি যেন তোমারই মত আমার পতিতে কায়মনোবাক্যে লগ্ন হইয়া থাকিতে পারি।"

সীতা

যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিত্র তাহা সীতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বংসহা সীতার মত হওয়া সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্দেশ্য। এই সীতা মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনকের কন্যা। প্রবাদ আছে, যজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়া জনক রাজা এক রূপলাবণ্যবতী কন্যা প্রাপ্ত হন এবং সেই কন্যাকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় লালনপালন করেন। লাঙ্গলের সীতা অর্থাৎ ফলা হইতে উঠিয়াছিলেন বলিয়া সেই কন্যা 'সীতা' নামে অভিহিতা হন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ দশ দিক্ আলোকিত করিতে লাগিল। তাঁহার গুণের সীমা ছিল না। পিতার নিকট হইতে যখন সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বধর্ম্ম শিক্ষা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

রাজর্ষি জনক কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে দান করিতে মনস্থ করিলেন। বহু সাধনায় প্রাপ্ত হরধনু তাঁহার গৃহে ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে-কেহ সেই ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। একে একে সকল দেশের রাজকুমারগণ আসিলেন, কিন্তু ধনু ভঙ্গ করা দূরে থাকুক, অনেকেই তাহা তুলিতেও পারিলেন না। লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণও ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন, তিনিও অসমর্থ হইয়া লজ্জা, ক্ষোভ, অপমান লইয়া ফিরিয়া গেলেন। জনক মহাচিন্তিত হইলেন।

বিশ্বামিত্র ঋষি তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যার রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে তাড়কাবধের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাড়কাবধের পরে বিশ্বামিত্র রামকে সীতার উপযুক্ত পাত্র মনে করিলেন এবং দুই ভাইকে লইয়া জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম অবলীলাক্রমে সেই ধনু ভঙ্গ করিলেন। দশরথ সংবাদ পাইয়া মিথিলায় আসিলেন। রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল। জনকের তিন ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রামের অপর

তিন ভ্রাতারও বিবাহ হইল। সীতা ও অন্যান্য বধূদের লইয়া দশরথ অযোধ্যায় ফিরিলেন।

অযোধ্যায় গিয়া সকলেরই কয়েক বৎসর বেশ সুখে কাটিল। দশরথ অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু রাণী কৈকেয়ী দাসী মন্থরার প্ররোচনায় নিজপুত্র ভরতকে রাজা করিবার উদ্দেশ্যে কৌশলে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস ঘটাইলেন। রামের বনগমনই স্থির হইল।

রাম একে একে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শেষে জানকীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। কহিলেন—"জানকি! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমাদের চিরদিনই সুখে কাটিবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য আমি বনবাসী হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর গুরুজন সেবায় নিযুক্ত থাকিও। আমায় বিদায় দাও।" এই কথায় সীতা কহিলেন—"তুমি যদি বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি কি সুখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমি আমার একমাত্র গুরু; তুমি যখন যেভাবে থাকিবে, আমিও সেইভাবে থাকিব। তোমারই নিকট হইতে শুনিয়াছি, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। তুমিই ত বলিতে, স্বামীর জীবনই স্ত্রীর জীবন; স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। তুমি যদি বনে যাও, আমি দাসী হইয়া সঙ্গে যাইব। দাসীর সেবায় তোমার কষ্টের অনেক লাঘব হইবে।" রাম এই দুঃখের মধ্যেও সুখী হইলেন, কিন্তু অশেষ প্রকারে সীতাকে বনবাসের ক্লেশের কথা বুঝাইলেন। সীতা উত্তর করিলেন—"তোমার সঙ্গে তরুতলে বাস করিলেও আমি তাহা স্বর্গ বলিয়া মনে করিব; তোমার সঙ্গে থাকিয়া ধূলি-ধূসরিত হইলেও তাহা চন্দন-শোভিত বলিয়া মনে করিব। কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহা তোমার স্নেহ-চুম্বন বলিয়া মনে করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।" সীতার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া বনে চলিলেন। এদিকে পুত্রশোকে রাজা দশরথ দেহত্যাগ করিলেন।

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরত চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম অনেক বুঝাইয়া ভরতকে আশ্বস্ত করিলেন। ভরত তখন নিরুপায় হইয়া রামের

পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। এই পাদুকার নীচে থাকিয়া ভরত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাম অনেক বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চবটি বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনজনে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে রাক্ষসের বড়ই উৎপাত। সেখানে লঙ্কার রাজা রাবণের ভগিনী শূর্পণখা একদিন রাম-লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া রামকে বিবাহার্থ অনুরোধ করেন। ইহাতে তিনি রাম-লক্ষ্মণের নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়া ভ্রাতার নিকট গিয়া নিজের দুঃখের কথা বলিলেন। রাবণ শূর্পণখার মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য মারীচ নামে এক রাক্ষসকে পাঠাইয়া দেন এবং নিজেও সঙ্গে আসেন। মারীচ স্বর্ণমৃগরূপে রামকে কুটীর হইতে অনেক দূরে লইয়া যায়। মারীচের কৌশলে লক্ষ্মণকেও কুটীর ত্যাগ করিতে হইল। সেই সুযোগে দুষ্ট দশানন সন্ন্যাসিবেশে সীতার কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলহৃদয়া সীতা তাহাকে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইবামাত্র ভণ্ড নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সীতাকে সবলে রথে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। তারপর সীতা এইরূপে রাম হইতে পৃথক্ হইলেন এবং লঙ্কায় রাবণের বন্দিনীরূপে থাকিতে বাধ্য হইলেন। রামের বিরহে সীতা মৃতপ্রায় হইলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ বহুকষ্টে সীতার সন্ধান পাইলেন। সুগ্রীব ও হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব হইল। বায়ুনন্দন হনুমান্ এক লাফে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং সন্ধান করিয়া জানিলেন, সীতা অশোকবনে চেড়ীগণে বেষ্টিতা হইয়া আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্য কাজে যাইলে হনুমান্ সীতার কাছে গিয়া বলিলেন—'দেবি, আপনার স্বামী বহুকষ্টে আপনার সন্ধান পাইয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং আপনি এখানে আছেন নিশ্চয় জানিলে তিনি সসৈন্যে লঙ্কা আক্রমণ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।" সীতার মলিন বেশ ও ম্লান মুখ দেখিয়া হনুমান্ ভাবিলেন, মাকে আর বেশীদিন এখানে রাখা উচিত নয়। তাই তিনি বলিলেন—"মা, যদি কষ্ট একেবারে অসহ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে সাগর পার হইয়া

আপনাকে শ্রীরামের নিকট লইয়া যাইব।" সীতা যদিও হনুমানের নিকট নিদর্শন পাইয়াছিলেন যে, হনুমান্ শ্রীরামেরই ভক্ত ও চর, তথাপি পরপুরুষের স্কন্ধে উঠিয়া রক্ষা পাওয়া এবং বীরশ্রেষ্ঠ হরধনুভঙ্গকারী রামের ভার্য্যার পক্ষে চোরের মত পলায়ন করা তাঁহার স্বামীর অগৌরবের হইবে ভাবিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। বাধ্য হইয়া হনুমান্ ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন; শ্রীরামচন্দ্র বানরগণের সাহায্যে সাগরের উপর ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত এক সুবৃহৎ সেতু বাঁধিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিলেন এবং রাবণ ও তাঁহার সৈন্যগণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার করিলেন।

এতকাল পরগৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া প্রজারা যদি সীতার উপর কোন কলঙ্ক আরোপ করে এবং তাহাতে যদি বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষা করাইলেন। সাধ্বী সীতা ইহা নীরবে অনুমোদন করিলেন। সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া নিজে তদীয় ভৃত্যের ন্যায় প্রজাপালন করিতেছিলেন। এখন শ্রীরামকে পাইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল, কিন্তু তখনও সীতার দুঃখের অবসান হইল না। অগ্নিপরীক্ষা প্রজারা কেহ চক্ষে দেখে নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়া অনেকে সীতার উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে লাগিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রজারঞ্জক রাম পুনরায় সীতার বনবাসের ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া কৌশলে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন।

সীতার দুঃখের সীমা রহিল না। সীতা তখন পূর্ণগর্ভা। রাজরাণী মুনির কুটীরে যমজপুত্র প্রসব করিলেন। রাজকুমারদিগের জন্মের কথা রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি জানিলেন না। বাল্মীকি যথাকালে তাহাদের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার করাইয়া সর্ব্বশাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করাইলেন। পূর্ব্বেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন; এই সময়ে লব-কুশকে রামায়ণ-গান শিখাইলেন। লব-কুশের মুখে বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ-গান শুনিয়া সীতা স্বামিবিরহ ভুলিয়া যাইতেন।

অতঃপর মহাসমারোহে শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে—কোন ধর্ম্মকার্য্য স্ত্রী-বর্ত্তমানতায় স্বামী একাকী করিতে পারেন না। সেই যজ্ঞের জন্য সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি গড়াইতে হইল। সমস্ত রাজা ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হইল। বাল্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়া লব-কুশকে দিয়া রামায়ণ-গান করাইলেন। সকলেই লব-কুশের রাম-চরিত গান শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। রামের সীতা-স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় তিনি অস্থির হইলেন। বাল্মীকি সীতাকে অযোধ্যায় আনিলেন। সীতার মনে স্বামীর প্রতি কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। কেবলমাত্র প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যই যে তাঁহার স্বামী এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তিনি বিশিষ্ট-রূপে জানিতেন। তাই স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য বাল্মীকি রামকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পুনরায় পরীক্ষার কথা উঠিল। পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতার নিজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। বারবার এই মর্ম্মান্তিক অপমান সীতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও, আমি তোমার বক্ষে প্রবেশ করি"; এই বলিয়া সীতা মূর্চ্ছিতা হইলেন। সহসা সভাস্থল দ্বিখণ্ড হইল। পাতাল হইতে এক দেবীমূর্ত্তি উঠিয়া সীতাকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। সীতা পৃথিবী হইতে উঠিয়াছিলেন, আবার পৃথিবীতেই লীন হইলেন।

শৈব্যা

ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। শৈব্যা তাঁহার মহিষী। রাজপুরীতে কোন অভাবই ছিল না। বহুদিন প্রার্থনার পর রাজদম্পতি এক পুত্র লাভ করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন রোহিতাশ্ব। শৈব্যার সুখের সীমা রহিল না।

কিন্তু সুখের দিন কাহারও চিরকাল থাকে না, শৈব্যারও থাকিল না। হরিশ্চন্দ্র একদিন মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে একস্থানে রমণীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন—এক ঋষি ত্রিবিদ্যা সাধন করিতেছেন। ত্রিবিদ্যা ঐরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র উহাতে ব্যথিত হইয়া ঋষিকে ঐ জঘন্য পৈশাচিক কার্য্যের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার করিলেন। সেই ঋষি অপর কেহ নহেন, তিনি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজা অনেক অনুনয় করায় তিনি শান্ত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র আত্মপরিচয় দিলে, তিনি কহিলেন—"তোমার কর্ত্তব্য কি?" রাজা উত্তর করিলেন—"দান"। বিশ্বামিত্র কহিলেন—"আমাকে কি দান করিবে?" রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী দান করিলেন এবং দানের উপযুক্ত দক্ষিণা সহস্র স্বর্ণমুদ্রাও দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যখন সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী দান করিয়াছেন, তখন রাজকোষ পর্য্যন্ত দান করা হইয়াছে; সুতরাং অর্থ কোথায় পাইবেন? অধিকন্তু বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তাঁহার প্রদত্ত পৃথিবীর মধ্যেও বাস করিতে দিলেন না। হরিশ্চন্দ্র তিন দিনের ভিতর দক্ষিণা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে—বারাণসী বিশ্বনাথের ত্রিশূলের উপর অবস্থিত অতএব পৃথিবীর বাহিরে; সুতরাং তাঁহার বারাণসী গমনই স্থির হইল।

রাজমহিষী শৈব্যা, যিনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীশ্বরের পত্নী, তখন তিনি ভিখারিণীর বেশে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেন। রাজকুমার রোহিতাশ্ব তখন পথের ভিখারী।

বসন-ভূষণে পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার নাই; কেন-না, হরিশচন্দ্র সমস্তই বিশ্বামিত্রকে দান করিয়াছিলেন।

দক্ষিণাদানের শেষদিন উপস্থিত হইল। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিতে হইবে, অথচ ভিখারী হরিশ্চন্দ্রের হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই। হরিশ্চন্দ্র একমনা হইয়া ধর্ম্মকে ও ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন এবং কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—"হে ধর্ম্মরাজ! যেন অধর্ম্মে পতিত না হই।"

ধর্ম্মরাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দাসদাসী-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শৈব্যাকে দাসীরূপে পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং এক চণ্ডালের নিকট পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রীত হইলেন। বিশ্বামিত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা পাইলেন; হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম রক্ষা হইল। রোহিতাশ্ব মাতার সহিত রহিলেন।

রাজনন্দিনী শৈব্যা এখন ক্রীতদাসী। যে দেহ পূর্ব্বে নিত্য নূতন বসন-ভূষণে আচ্ছাদিত হইত, রাজভোগে পরিপুষ্ট হইত, তাহা এক্ষণে ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে অর্দ্ধ-আবৃত হইতে লাগিল, অনাহারে-অর্দ্ধাহারে সে দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই, সুতরাং তিনি রোহিতাশ্বকে খাইতে দিতেন না. শৈব্যা প্রভুর প্রদত্ত মুষ্টিমেয় অন্নের অধিকাংশই রোহিতাশ্বকে দিয়া নিজে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। রাজার সন্তান, কাঙ্গালের ধন রোহিতকে লইয়া তিনি স্বামিশোক সহ্য করিতে লাগিলেন। স্বামীর এই অযথা দান ও দক্ষিণায় তাঁহার বিরক্তির ভাব আসিত না বরং স্বামীর যে ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে, এই চিন্তাতে তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন।

কিন্তু তাহাতেও দুঃখের শেষ হইল না। রোহিতাশ্ব একদিন ঐ ব্রাহ্মণের পূজার জন্য বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছিল, এমন সময় একটী সর্প তাহাকে দংশন করিল। দেখিতে দেখিতে শৈব্যার নয়নমণি, শৈব্যার শেষ অবলম্বন, রোহিতাশ্ব, শৈব্যার ক্রোড়েই মহাঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল। অনাথিনী শৈব্যাকে একাই নিজপুত্রের সৎকারের জন্য শ্মশানে যাইতে হইল।

এদিকে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে শ্মশানে শবসৎকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, প্রজাপালন ত্যাগ করিয়া শবদাহ-কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। শবদাহকারীদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক গ্রহণ, তাহাদিগের শবদাহকার্য্যে সহায়তা ইহাই এক্ষণে তাঁহার নিত্যব্রত।

অন্ধকারময়ী ভীষণ রাত্রি! আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া রাত্রির ভীষণতাকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে; প্রকৃতির সেই ভীষণতার মধ্যে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র তাঁহার প্রভুর কার্য্য করিবার জন্য শ্মশানে গমন করিলেন। অদূরে বামাকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক নারী একটী মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছেন। নারী আর কেহই নহেন—হরিশ্চন্দ্র-পত্নী শৈব্যা, পুত্র রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন—"আমার প্রাপ্য রাখিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার পুত্রের সৎকার করিব।" শৈব্যা কহিলেন—"আমার এক কপর্দ্দকও দিবার ক্ষমতা নাই, আমার স্বামী জীবিত, আমি এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী।" স্বামী জীবিত! স্ত্রী ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী! শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র বিচলিত হইয়া কহিলেন—"ইহার পিতা কি নিষ্ঠুর! পুত্র মৃত, স্ত্রী উন্মাদিনী, সে এখানে এখনও উন্মাদ হ'য়ে ছুটে এসে পড়েনি?" চণ্ডালের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া শৈব্যা বিচলিত হইয়া বলিলেন—"চণ্ডালরাজ, আপনি এ স্থানে আমার একমাত্র বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া আমার স্বামীর নিন্দা করিতেছেন কেন? জানেন কি—স্ত্রীলোকের নিকট স্বামী কত বড়? স্ত্রীলোকের ইহকাল-পরকাল যে স্বামী! তাঁহার নিন্দা স্ত্রীলোকের কাছে করা উচিত নয়। স্বামীর নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সব আপনারা বোধ হয় জানেন না। স্ত্রীলোকেরা সেই সতীর অংশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব তাঁহারা স্বামিনিন্দা শুনিয়া স্থির থাকিবেন কিরূপে? আর আমার স্বামী একমাত্র ধর্ম্মের জন্যই এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে রাখিয়াছেন। পরে তাঁহার ক্রন্দনে প্রকাশ পাইল যে, পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব, স্বামীর নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র আছে! আরও রোহিতাশ্ব আছে!—হরিশ্চন্দ্র বড়ই অস্থির হইলেন; মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকিত হইল।

সকল সন্দেহের ভঞ্জন হইল; সেই আলোকে হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহারই পত্নী শৈব্যা তাঁহারই একমাত্র বক্ষের ধন রোহিতাশ্বকে লইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। সেই মৃত্যুবিবর্ণ দেহের উপর হরিশ্চন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে সেই আকুল বিলাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া শোকে জ্ঞানহারা হইয়া ভাগীরথীগর্ভে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মরিবার জন্য প্রভু চণ্ডালের আদেশ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। এই ভীষণ স্থানে ভীষণ সময়ে বিশ্বামিত্র সহসা উপস্থিত হইলেন এবং তপঃপ্রভাবে রোহিতাশ্বকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। রাজর্ষির আশীর্ব্বাদ লইয়া হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীপুত্র-সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিলেন। শৈব্যার দুঃখের রজনী শেষ হইল।

দময়ন্তী

বিদর্ভ দেশের রাজা ভীম অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। অবশেষে তিনি দমন মুনির বরে দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা এবং দমন নামে এক পুত্র লাভ করেন। দময়ন্তীর রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। শশিকলার ন্যায় বাড়িতে বাড়িতে দময়ন্তী ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার রূপের ও গুণের কথা বিস্তৃতি লাভ করিল। রাজা কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন।

ইতোমধ্যে একদিন দময়ন্তী অন্তঃপুরমধ্যে এক উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক সুন্দর রাজহংস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া দময়ন্তী হংসটীকে ধরিলেন। হংস দময়ন্তীকে বলিল—"রাজকুমারী, আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব।" ইতঃপূর্ব্বে দময়ন্তী অনেকবার নলের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজহংসের মুখে নলের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য

ব্যাকুল হইলেন। হংস দময়ন্তীর নিকট নলের রূপ-গুণ এবং তাঁহার প্রতি নলের আসক্তি প্রভৃতির কথা, সবই বলিল। দময়ন্তী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ করিলেন। হংস স্বস্থানে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবরের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এক এক করিয়া রাজারা উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নলও সংবাদ পাইয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলেন তাঁহারাও দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে দময়ন্তীর নিকট দূতস্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। নল স্বীকৃত হইলেন। নলরাজা বিবাহার্থী দেবতাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট চলিলেন। নল ভিন্ন এ কার্য্য আর কাহারও দ্বারা কি সম্ভব? দেবতাদের অনুগ্রহে নল অলক্ষ্যে চলিলেন।

আজ স্বয়ংবরের দিন। দময়ন্তী উপযুক্ত বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় যাইবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিব্য পুরুষ-মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে অকস্মাৎ এরূপ পুরুষের আগমনে দময়ন্তী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। পুরুষমূর্ত্তি কহিতে লাগিলেন—"রাজকুমারী! আমি দেবতাদের দূত। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা আপনার পাণিগ্রহণমানসে আমাকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন।" দময়ন্তী প্রণাম করিয়া নিষ্কম্পভাবে উত্তর করিলেন—"দূত। দেবতারা আমার পূজনীয়, তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি পূর্ব্বেই একজনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে, দেবতাই হউন বা যে কেহই হউন, অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব; দেবতারা ধর্ম্মের রক্ষক, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তাঁহাকেই যেন লাভ করিতে পারি।" দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে আপনার অভীষ্ট স্বামী?" দময়ন্তী উত্তর করিলেন —"নিষধরাজ নলই আমার স্বামী।" দেবদূত সোল্লাসে বলিলেন—"আমিই নিষধরাজ নল।" মুহূর্ত্তে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন। দময়ন্তী স্তম্ভিতা হইলেন।

স্বয়ংবর-সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়া দময়ন্তী অবশেষে

নিষধরাজ নলের নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—সেখানে নলের ন্যায় আরও চারিজন নলের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। কে প্রকৃত নল, তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সতী কাহাকে মাল্যদান করিবেন? দময়ন্তী স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই এ দেবতাদের ছলনা। মনে মনে দেবতাগণের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"দেবগণ! আপনারা ধর্ম্মরক্ষক; আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন। সতীধর্ম্মের অপেক্ষা নারীর নিকট আর কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে। আজ আমার সেই সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখুন।" মুহূর্ত্তে দেখিলেন যে, নানাবিধ লক্ষণে চারিজন অপর একজন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। চারিজনের চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে ঘর্ম্ম নাই, তাঁহারা ভূমিস্পর্শ করেন নাই, আর একজনের মধ্যে এ সকল লক্ষণ নাই। অবিলম্বে সতী প্রকৃত নলকে চিনিতে পারিলেন। শঙ্খরোলের মধ্যে পুষ্পমাল্যের সহিত দময়ন্তী নলকে হৃদয় দান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

নিষধে দময়ন্তীর দিন সুখে কাটিতে লাগিল; কিন্তু সে সুখ বহুকাল স্থায়ী হইল না। নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর। নলের এ সুখ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। দুরাত্মা অক্ষক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা পারদর্শী ছিল। সে এক্ষণে নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিল। এ ক্রীড়ায় নলেরও যথেষ্ট আসক্তি ছিল। কলির প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া নল পুষ্করের সহিত পণ রাখিয়া পাশাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কলির প্রভাবেই নল প্রত্যেকবারই হারিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাজ্য, ধন, যাহা কিছু ছিল সবই হারিলেন; রাজ্যে আর তাঁহার স্থান নাই। নিষধরাজ আজ পথের ভিখারী; বনবাস ভিন্ন আর উপায় নাই। সতী দময়ন্তী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

রাজদম্পতি রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন। নল দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন —"প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় এ ক্লেশ স্বীকার করিলে?" সতী উত্তর করিলেন—"নাথ! স্ত্রী কি কেবল সুখের অংশভাগিনী, দুঃখের অংশভাগিনী নয়? আপনার সুখের অংশ আমি তুল্যরূপেই ভোগ করিয়াছি, দুঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না? আপনি যেখানে থাকিবেন,

সেইখানেই আমার স্বর্গ। এ আমার স্বর্গবাস, আমি নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই ; আমার চিন্তা—আপনার কত ক্লেশ হইতেছে।"

এক বসনে রাজদম্পতি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কলির মায়ায় একদিন একটী সুবর্ণপক্ষ বিহঙ্গম ধরিতে গিয়া নল নিজের বসনখানি হারাইলেন। তখন দময়ন্তী নিজের বস্ত্রের অর্দ্ধেক স্বামীকে দান করিলেন।

অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন। নল মনে করিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে পাশাক্রীড়া শিক্ষা করিয়া পুষ্করকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিবেন। কিন্তু এ হীনবেশে ছিন্নবসনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গমন করা কিরূপে সম্ভব? অগত্যা নল দময়ন্তীকে কহিলেন—"প্রিয়ে! তুমি বনবাসে বড় কষ্ট পাইতেছ, কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে গমন কর, দেখি—যদি আমি কোনরূপে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।" সতী উত্তর করিলেন—"নাথ! তুমি বনবাসে ক্লেশ ভোগ করিবে, আর আমি তোমার পত্নী হইয়া পিতৃগৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইব? প্রাণ থাকিতে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না।" নল যখন দেখিলেন, দময়ন্তী তাঁহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না, তখন একদিন রাত্রিকালে নিদ্রিত দময়ন্তীর ভার একমাত্র ভগবানের উপর দিয়া, অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি সেই বন ত্যাগ করিলেন। সতী দময়ন্তী কিছুই জানিতে পারিলেন না।

নিদ্রাভঙ্গে সতী দেখিলেন, স্বামী তাঁহার পার্শ্বে নাই। তিনি উন্মাদিনীর মত নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পতির এই ব্যবহারে সতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব আসিল না। ভাবিলেন, "আমারই দোষ, কেন আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম?" পতির অদর্শনে সতী উন্মাদিনী হইলেন।

এইরূপ অবস্থায় দময়ন্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হইলেন। প্রাণভয়ে দময়ন্তী দৌড়াইতে লাগিলেন। সর্প তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, এমন সময়ে মুহূর্ত্তমধ্যে একটী তীর আসিয়া সর্পকে বিদ্ধ করিল। সর্প গতাসু হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। দময়ন্তী দেখিলেন, এক ব্যাধ তাঁহার প্রাণদাতা। তিনি

জীবনদাতার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলেন যে, জীবনদান করাই ব্যাধের উদ্দেশ্য নয়, পাপাভিলাষ পূর্ণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। সতী তাহাকে ধিক্কার দিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন।

উন্মাদিনীর ন্যায় ছিন্নবসনে কর্দ্দমাক্তশরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে দময়ন্তী ক্রমে চেদীরাজ্যের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। একদিন চেদীনগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী হইলে রাজমাতা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দাসীদ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার পরিচয় পাইয়া সস্নেহে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। পরে রাজমাতা নলের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া দেখেন, দাবানলে এক প্রকাণ্ড সর্প দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। স্বভাবকরুণ নল নিজের বিপদ তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সর্পকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হিংস্র সর্প তাহার নিজের স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিল না; সে নলকে দংশন করিল। তাহার বিষে নলের সর্ব্বশরীর বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রণদ্বারা বিকৃত হইয়া গেল। এরূপ বিকৃতি ছদ্মবেশের উপযুক্ত হইল।

নল অশ্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া ঋতুপর্ণের নিকটে সারথ্য স্বীকার করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল বাহুক। ঋতুপর্ণ নলের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এদিকে কন্যা ও জামাতার বনগমন-সংবাদে বিদর্ভরাজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহে আনিবার জন্য সকল দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। নানা বনে নানা দেশে অন্বেষণ করিয়া দূতগণ চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইল। সেখানে দময়ন্তীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে সসম্মানে বিদর্ভরাজ্যে লইয়া গেল।

পিতৃগৃহে সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে দময়ন্তী আরও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বক্ষণই পতির চিন্তায় মগ্না; সর্ব্বক্ষণই পতির জন্য তাঁহার অশ্রুবিসর্জ্জন। বিদর্ভরাজ তখন জামাতার অন্বেষণে পুনরায় চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন।

এক দূত আসিয়া দময়ন্তীকে ঋতুপর্ণের সারথির কথা বলিল। তাঁহার গুণের পরিচয়, দময়ন্তীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ, ইত্যাদিতে দময়ন্তী তাঁহাকে নল বলিয়া মনে

করিলেন, কিন্তু তাঁহার রূপের বর্ণনায় তিনি একটু সন্ধিহান হইলেন। যাহা হউক তাঁহাকে দেখিবার জন্যই দময়ন্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

ঋতুপর্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া দময়ন্তী জানাইলেন যে, নল নিরুদ্দিষ্ট, দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর উপস্থিত। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপ-গুণের কথা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে অতি সত্বর বিদর্ভে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নল এই কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। যাহা হউক, নল ঋতুপর্ণের সারথি হইয়া বিদর্ভে আসিলেন।

দময়ন্তী গোপনে বাহুককে ডাকাইয়া তাঁহার আচার-ব্যবহারে তাঁহাকে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পুনরায় উষ্ণ অশ্রুপূত দুইটী হৃদয় মিলিত হইল। এইরূপে নলের পরিচয় হইল; অতঃপর নল ও দময়ন্তী নিজেদের রাজ্যে গমন করিলেন।

নিষধে পৌঁছিয়া নল পুষ্করকে পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। নল ঋতুপর্ণের নিকটে পাশাক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুষ্করকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন অশেষ ক্লেশভোগের পরে পুনরায় তাঁহাদের সৌভাগ্যের উদয় হইল। সতীত্বজ্যোতিঃ কলি-মল ধ্বংস করিয়া পুণ্যপ্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল।

শকুন্তলা

কোন সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি মহাতপে নিমগ্ন হন। দেবতারা সেই তপস্যা-দর্শনে ভীত হইয়া মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য প্রেরণ করেন। মেনকা রূপমোহে বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করেন। ফলে মেনকার গর্ভে তাঁহার ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা সদ্যঃপ্রসূতা সেই কন্যাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দেবতারা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রও কন্যাটীকে গ্রহণ করিলেন না। অসহায়া কন্যাটীকে একটী শকুন্ত (অর্থাৎ পক্ষী) তাহার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবযোগে মহর্ষি কণ্ব সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কন্যাটীকে সেই অবস্থায় দেখিতে পান। স্বভাব-করুণ ঋষি শিশুটীকে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিয়া নিজের কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত (পক্ষী) পালন করিয়াছিল বলিয়া মেয়েটীর নাম রাখিলেন শকুন্তলা।

মুনির আশ্রমে শকুন্তলা দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে লাগিলেন এবং সেখানে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুইটী সহচরীর সহিত মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তিনি আশ্রমের বৃক্ষমূলে জলসেচন করেন, তরুলতার বিবাহ দেন, আদর করিয়া তরুলতার কত নাম রাখেন। সখীরা তাঁহার সকল কাজে সহায়তা করে। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা যৌবনদশায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে একদিন মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। কণ্ব সে সময়ে প্রতিকূলদৈব-প্রশমনের নিমিত্ত তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। আশ্রমের ভার শকুন্তলার উপর ছিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন এবং শকুন্তলাও দুষ্মন্ত-দর্শনে মুগ্ধা হইলেন। সখীদের মুখে রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে বিবাহযোগ্য মনে করিয়া গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিলেন। বিবাহের সাক্ষ্যস্বরূপ একটী অঙ্গুরীয় শকুন্তলাকে দিয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন যে, তিনি সত্বরই তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন।

একদিন শকুন্তলা কুটীরদ্বারে বসিয়া দুষ্মন্ত-চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। শকুন্তলা পতিচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্যা, তিনি দুর্ব্বাসার কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন—"তুই যাহার চিন্তায় মগ্না হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, আমি অভিশাপ দিতেছি যে, তুই স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবে না।" শকুন্তলা কিছুই জানিতে পারিলেন না; সখী অনসূয়া নিকটে ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে ঋষির নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বহু আরাধনায় ঋষির ক্রোধ একটু প্রশমিত

হইল। তিনি কহিলেন—"যদি কোন চিহ্ন দর্শাইতে পারে, তবে সে ইহাকে স্মরণ করিবে, অন্যথা নয়।" অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে এ সংবাদ জানাইল। শকুন্তলাকে কেহ কিছু বলিল না।

কণ্ব তীর্থে থাকিয়া দৈববাণী হইতে জানিলেন যে, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং শকুন্তলা গর্ভবতী। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শকুন্তলার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহের সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কেননা দুষ্মন্ত অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত পাত্র কেহ ছিলেন না। তিনি সত্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

শুভদিনে কণ্ব দুই শিষ্য ও ভগিনী গৌতমীকে সঙ্গে দিয়া শকুন্তলাকে রাজধানীতে পাঠাইলেন। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা ও অন্যান্য গুরুজন, সখীগণ ও আশ্রমের বৃক্ষ-লতা সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সখীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে নিভৃতে বলিয়া দিলেন, "রাজা অবিশ্বাস করিলে এই অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দেখাইও।" তাঁহারা আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

পথে শচীতীর্থে স্নান করিবার সময়ে শকুন্তলার সেই অঙ্গুরীয় স্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইল। শকুন্তলা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন।

দুর্ব্বাসার শাপে শকুন্তলার সম্বন্ধে কোন কথাই দুষ্মন্তের মনে ছিল না। সুতরাং তিনি কোনক্রমেই শকুন্তলাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। শকুন্তলা লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন।

শিষ্যদিগের সহিত রাজার অনেক তর্কের পর শকুন্তলা নিজেই তাঁহার পত্নীত্ব প্রমাণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে অঙ্গুরীয়ের কথা তাঁহার মনে পড়িল; কিন্তু দেখাইতে গিয়া দেখিলেন অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকটে নাই। শকুন্তলা নিরুপায় হইলেন। শিষ্যেরা শকুন্তলাকে সেখানে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। শকুন্তলা একাকিনী কাঁদিতে লাগিলেন। মাতা মেনকা আকাশপথে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া সুমেরু পর্ব্বতে ভগবান্ কশ্যপের নিকটে রাখিলেন। কশ্যপ

তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যথাকালে শকুন্তলা সেখানে একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল ভরত।

ইতোমধ্যে এক ধীবর শচীতীর্থে একটী রোহিত মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়ার্থ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উদরমধ্যে একটী অঙ্গুরীয় পাইল। সে উহা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত এক স্বর্ণকারের নিকট উপস্থিত হইলে, স্বর্ণকার উহা রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া নগরপালের হস্তে সমর্পণ করিল। নগরপাল চোরকে অঙ্গুরীয় সহিত রাজার নিকট উপস্থিত করিলে সেই অঙ্গুরীয় দর্শনমাত্রেই শকুন্তলার সম্বন্ধে সমস্ত কথা রাজার মনে পড়িল। তিনি শকুন্তলার প্রতি স্বকৃত দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং কিরূপে শকুন্তলাকে পুনরায় লাভ করিবেন, সেই চিন্তায় দিবানিশি অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন ইন্দ্র-সারথি মাতলি আসিয়া 'দানব-বিজয়ের জন্য ইন্দ্র আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন' বলিয়া দুষ্মন্তকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাতলি সুমেরু পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে রাজা দুষ্মন্ত মহর্ষি কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দুষ্মন্ত রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে মহর্ষির কুটীরের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, একটী বালক এক ভীষণ সিংহকে নির্য্যাতন করিতেছে। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। বালক কাহারও কথা শুনিতেছে না। অবশেষে 'খেলনা দিব' এই কথায় সে শান্ত হইল।

বালককে দর্শনাবধি দুষ্মন্তের মনে এক অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, শিশুটী তাঁহার পুত্র, তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন; একটী মাটীর ময়ূর আনিয়া বালককে দেওয়া হইল। "দেখ, কেমন শকুন্ত-লাবণ্য দেখ"—এই কথা শুনিয়া বালকটী বলিয়া উঠিল—"কৈ মা কৈ?" রাজা বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এ কি শকুন্তলার পুত্র! ঘৃণিতা, অপমানিতা, বিতাড়িতা, নিজের পরিণীতা পত্নী শকুন্তলার পুত্র! রাজা অস্থির হইলেন। কিছু পরেই শকুন্তলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—দীনা, হীনা, মলিনা, ব্রহ্মচারিণী। উভয়েই

উভয়কে চিনিতে পারিলেন। উভয়ের চক্ষুজলেই যেন সমস্ত অপরাধ ধৌত হইয়া গেল। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষির আশীর্ব্বাদ পাইয়া, পত্নী-পুত্র সঙ্গে লইয়া দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। যথাকালে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুষ্মন্ত সস্ত্রীক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। সম্ভবতঃ শকুন্তলার পুত্র ভরত হইতেই আমাদের দেশের নাম হইয়াছে 'ভারতবর্ষ'।

দ্রৌপদী

[দ্রৌপদী—দ্রুপদ রাজার কন্যা। এই নাম ভিন্ন তাঁহার আরও কয়েকটি নাম আছে—কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী, পাঞ্চালী ইত্যাদি। দ্বাপরযুগে আবির্ভাবের পূর্ব্বেও দ্রৌপদীর আর তিন জন্ম অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু যে যুগে ভারতের ধর্ম্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সেই যুগেই লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, ধর্ম্মপালন প্রভৃতির সম্যক্ পরিস্ফুরণের নিমিত্তই পাণ্ডবকুলে দ্রৌপদীর আগমন হইয়াছিল। বীরত্ব, তেজস্বিতা, অহঙ্কারশূন্যতা, দয়াদাক্ষিণ্য, সেবাশুশ্রূষা প্রভৃতি সকল গুণই একাধারে দ্রৌপদীতে বর্ত্তমান ছিল। অর্জ্জুন যেমন আদর্শ পুরুষ, দ্রৌপদীও সেইরূপ আদর্শ রমণী। রাজকার্য্য-পরিচালনায়, যুদ্ধে মন্ত্রণাদানে এবং গৃহকর্ম্মে দ্রৌপদীর সমকক্ষ কেহ ছিল না। সংসারের কর্ত্তব্য, রাজমহিষীর কর্ত্তব্য, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির পালনব্রত দ্রৌপদীর আখ্যায়িকা হইতে শিক্ষণীয়। দ্রৌপদীর জীবন আলোচনা করা এই পুস্তকে অসম্ভব। তাঁহার চরিত্র ভারতের ইতিহাসের এক প্রধান চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দ্বাপরযুগের যুগনায়ক কৃষ্ণাদ্রৌপদীও সেইরূপ সেই যুগের প্রধান যুগনায়িকা। পাপাসক্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার নিমিত্তই যজ্ঞ হইতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। নিরপেক্ষ আলোচনা হইতে সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে যে, দ্বাপরযুগের পূর্ণত্ব সংঘটন করিবার নিমিত্তই দ্রৌপদীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

কেহ কেহ তাঁহার পঞ্চস্বামী প্রভৃতির সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত ও চরিত্র-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলে সহজেই এই ভ্রম দূর হইতে পারে। দৈবকৃত বলিয়া যাহা উপহাস করা হয়, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে জগৎসংরক্ষণের হেতু মাত্র। বিকৃতমস্তিষ্ক, শিশ্নোদরপরায়ণ বলিয়াই অনেকে জগৎ-পালয়িত্রীর সমগ্র-রূপ পরিপূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না।]

তিন জন্ম পূর্ব্বে দ্রৌপদী দক্ষের এক কন্যারূপে স্বামিলাভের জন্য হিমালয়ে

তপস্যা করিবার সময় গো-মাতার বিরক্তিসূচক কাজ করিয়াছিলেন। সেইজন্য গো-মাতা ইঁহাকে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে না এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচজন স্বামী হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন। কিছুদিন পরে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া ইঁহার পাণিপ্রার্থনা করেন। দেবগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও বিষ্ণুর নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করায় বিষ্ণু দেবগণকে এই বলিয়া শাপ দিলেন—"তোমরা দেবতা হইয়াও যেমন নরকন্যা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ, তেমনি তোমরা নররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ কন্যাকে একদিন লাভ করিবে। আমিও নরলোকে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ও অধর্ম্মের বিনাশের জন্য সেই সময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইব।"

প্রথম জন্মে পাছে বহুপতি-লাভ ঘটে, এজন্য ঐ কন্যা গঙ্গার জলে অকালে দেহত্যাগ করেন। দ্বিতীয় জন্মে ইনি এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্বামি-লাভের জন্য প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া পাঁচ বার 'পতিং দেহী' বলিয়া বর চাহিতেন। পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব একদিন বলিলেন—"তথাস্তু" অর্থাৎ তোমার পঞ্চস্বামী হইবে। এবারও তাঁহার পঞ্চপতি হইবে এই আশঙ্কায় গঙ্গার শরণ লইলেন।

তৃতীয় বার তিনি কাশীর রাজকুমারী হইয়া হিমালয়ে সংস্বামি-লাভের জন্য শিবপূজায় নিরতা হন এবং ইন্দ্র, ধর্ম্ম, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নয়নপথে পতিত হন। এবার দেবতারা ইঁহাকে বলিলেন—"আমাদের কাহাকেও তুমি পতিরূপে বরণ কর।" কিন্তু সকলের আকার-প্রকার একই রকম হওয়ায় কাহাকে অপমান করিয়া কাহাকে সম্মানিত করিবেন, যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"আমরা সকলেই তোমার স্বামী হইব।" এবারেও তিনি গঙ্গার আশ্রয় লইলেন।

যাহা হউক চতুর্থ জন্মে প্রাক্তন ফল এড়াইতে না পারিয়া পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের যজ্ঞ হইতে পূর্ণযৌবনা কৃষ্ণার উদয় হইল। পরে হস্তিনার রাজপরিবারের পঞ্চপাণ্ডব ইঁহার স্বামী হইলেন।

দ্বাপরযুগে হস্তিনাপুরে বিচিত্রবীর্য্য নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্য শাসন করিতেন। কালে অন্ধরাজের ঔরসে, গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন,

দুঃশাসন প্রভৃতি শতপুত্রের জন্ম হয়। ইহারা কৌরব নামে খ্যাত। পাণ্ডুমহিষী কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়, ইহাদের নাম হইল পাণ্ডব। কিছুদিন পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হইল। যুধিষ্ঠির ন্যায়ধর্ম্মানুযায়ী রাজা হইবেন—স্থির হইলে, কৌরবেরা ছলে ও কৌশলে ইহাদের পাঁচ ভাই ও মাতা কুন্তীকে বারণাবত নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন এবং সেখানে যে গৃহে ইহারা বাস করিতেন তাহা দগ্ধ করিয়া ইহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করেন। ইহারা কৌশলে সেই গৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইহারা সংবাদ পান দ্রুপদকন্যার বিবাহে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহারাও দ্রুপদরাজার সভায় ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হন।

এদিকে দ্রুপদরাজ সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না পারিয়া এক স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করিলেন। তখন তিনি রাধাচক্র নামে একটী চক্রযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া খুব উচ্চে স্থাপন করিলেন এবং ঐ যন্ত্রটীর ঠিক মধ্যস্থলে এক ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া উহার উপরে একটি স্বর্ণমৎস্য স্থাপন করিলেন। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেহই ঐ ঘূর্ণায়মান রাধাচক্রের ছিদ্র দিয়া ঐ মৎস্যের সন্ধান পায় না। তাই উহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিবার জন্য নিম্নে একটী স্বচ্ছ জলের চৌবাচ্চা করাইলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, জলের ভিতর প্রতিবিম্ব দেখিয়া যে ক্ষত্রিয়-কুমার ঐ রাধাচক্রের উপরিস্থিত মৎস্যের চক্ষু বাণ-বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন।

বিভিন্ন দেশ হইতে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে পাইবার নিমিত্ত দ্রুপদ রাজার সভায় আগমন করিলেন; কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া একে একে সকলেই ব্যর্থকাম হইয়া লজ্জায় ও অপমানে অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ঘোষণা করা হইল—"ক্ষত্রিয় রাজাই হউক কিংবা ব্রাহ্মণাদি অন্য কোন জাতীয়ই হউক, যে-কেহ ঐ লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।" অর্জ্জুন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া সেই বৃহৎ ধনুতে শর যোজনা করিয়া

লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন। ইহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইলেন; কিন্তু সকলেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

স্বয়ংবর-সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন অর্জ্জুন মাতাকে জানাইলেন—'আজ ভিক্ষায় একটী নূতন রত্ন পাইয়াছি,' তখন কুন্তীদেবী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সে রত্ন না দেখিয়াই বলিলেন—"যাহা পাইয়াছ তাহা তোমরা পাঁচ জনে ভাগ করিয়া লও।" তখন সমস্যা গুরুতর হইল। দ্রৌপদী ভাবিয়া আকুল হইলেন। মাতা কুন্তী যখন জানিলেন, অর্জ্জুন দ্রৌপদীর প্রকৃত স্বামী এবং সতীত্বধর্ম্ম-বিরোধী আজ্ঞা তিনিই দিয়া বসিয়াছেন, তখন তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে সত্য রক্ষা হয় সে বিচারের ভার জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিলেন সমস্ত ঋষি ও গুরুজনদের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। অগত্যা দ্রৌপদীও ভগবানকে স্মরণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

সেইদিন যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতা ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইলেন, যুধিষ্ঠির তাহা কুন্তীদেবীর আদেশে দেবতা, ব্রাহ্মণ, মাতা, স্ত্রী ও পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। বিবাহের প্রথম দিনই রাজকন্যা ভিক্ষান্ন ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না এবং রাত্রিকালে কুশশয্যায় শয়নেও ক্লেশ বোধ করিলেন না।

দ্রুপদরাজ এ সংবাদ শুনিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন। তখন তিনি দেশের রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তে মহাসমারোহে দ্রৌপদীকে সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে দ্বারকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় অগ্রজ বলদেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এ বিবাহ সমর্থন করিলেন।

দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে ফিরিয়া স্বয়ংবর-সভার সংবাদ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ও ধার্ম্মিক উপদেষ্টা ও আত্মীয়-স্বজন এবং সভাসদ্গণের কথামত পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে আনাইয়া অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর ইহাদের রাজধানী হইল ইন্দ্রপ্রস্থ। যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মরাজকে পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সকল শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ

হইল। গৌরবে, শ্রীসম্পদে, সুরম্য হর্ম্যে, ইন্দ্রপ্রস্থ সকল রাজধানীকে পরাজিত করিল। পাণ্ডবগণ আনন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া পাণ্ডবদিগকে বলিলেন—"পাঁচ ভাইয়ের যখন একই স্ত্রী, তখন পাছে এই স্ত্রী লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ হয়, এইজন্য তোমরা এক এক জন এক বৎসর করিয়া দ্রৌপদীকে গৃহে রাখিবে। যদি কোন ভাই অপর ভাইয়ের আশ্রয়কালীন দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস যাইতে হইবে।"

একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাহ্মণকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র আনিতে অর্জ্জুনকে বাধ্য হইয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হয় এবং দ্বাদশবর্ষ বনবাসে যাইতে হয়। সেই বনবাস সময়ে অর্জ্জুন দেবকার্য্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে তিনি নাগকন্যা উলূপী, মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার বনবাস-সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সুভদ্রাকে গৃহে আনিলেন।

নববিবাহিতা স্ত্রী সুভদ্রাকে লইয়া গৃহে আসিয়া প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা করিলেন এবং একে একে সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রৌপদীর নিকট গিয়া সুভদ্রাকে উপহার দিলেন। দ্রৌপদী স্বামীর পর পর কয়েকটী বিবাহবার্ত্তা শুনিয়া একটু অভিমান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামী আসিয়া যখন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে উপহার দিলেন এবং সুভদ্রা যখন বলিলেন—"দিদি, আমি তোমার দাসী" তখন দ্রৌপদীর সপত্নী-দুঃখ, কোথায় উড়িয়া গেল। স্বয়ংবর-জয়ী বীরশ্রেষ্ঠ স্বামীর নূতন বিজয়গৌরব সুভদ্রা, এই কথা যখন তাঁহার মনে হইল, তখন তিনি সুভদ্রাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"বোন, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি চির স্বামী-সোহাগিনী হও।"

কিছুকাল পরে সুভদ্রার এক পুত্র হইল, তাহার নাম রাখা হইল অভিমন্যু। পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীরও পর পর পাঁচটী পুত্র হইল। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞসভা অসাধারণ কারুকার্য্যময় হইল। যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে বলদেবও আসিলেন। অন্যান্য রাজারাও আসিয়াছিলেন এবং

হস্তিনাপুরের বর্ত্তমান রাজা কৌরবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধন এবং তাঁহাদের মাতুল শকুনি আসিয়া পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন।

ক্রূরমতি দুর্য্যোধন প্রভৃতি হস্তিনায় ফিরিয়া পাণ্ডবদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পথও আবিষ্কৃত হইল। মাতুল শকুনি পাশাখেলায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন—কপট পাশাখেলায় পাণ্ডবদিগকে হারাইয়া উহাদের রাজ্য হরণ ও অপমান না করিতে পারিলে, যুদ্ধে উহাদিগকে পরাজিত করা যাইবে না। সেকালে ক্ষত্রিয় রাজাদের নিয়ম ছিল—যুদ্ধ বা পাশাখেলায় আহ্বান করিলে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাতে যোগদান করিতে হইবে। কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় আহ্বান করিলেন এবং বার বার হারাইয়া দিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য ও নিজের সহিত পাঁচ ভাইকে পণ রাখিয়া হারিয়া গেলেন। শেষে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন এবং এবারেও হারিয়া গেলেন।

কৌরবেরা দ্রৌপদীকে কৌরবসভায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে তিনি সভায় আসিতে অস্বীকার করিলেন এবং দূতকে বলিয়া পাঠাইলেন "জানিয়া আইস, ধর্ম্মরাজ আগে আমায় পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, না নিজে হারিয়া আমায় পণ রাখিয়াছেন?" এ কথার জবাবে বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতি সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্রৌপদীর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া দুর্য্যোধনকে জানাইলেন যে, দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অধিকার ধর্ম্মরাজের নাই, কারণ ধর্ম্মরাজ আগেই পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য দুঃশাসনকে পাঠাইলেন। দ্রৌপদী এবারও আপত্তি করায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে সভায় লইয়া আসিলেন। দ্রৌপদী ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতা না হইয়া সভাস্থ সকলকেই বিনয়ে জানাইলেন—"ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে হারিয়া পরে আমাকে পণ রাখিয়াছেন, অতএব আমাকে অপমান করিবার অধিকার কৌরবদের নাই। পরন্তু, তাহারা আমাকে এইরূপভাবে অপমান করিতে যখন বদ্ধপরিকর, তখন কি বুঝিতে হইবে ধর্ম্ম একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? কৌরবগণই ত ধর্ম্ম-রাজকে পাশাখেলায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিয়াছে এবং শকুনি চাতুরী অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে হারাইয়াছে; বুঝিলাম না—ধর্ম্মরাজ কি হিসাবে হারিলেন?" ইহাতেও

যখন তাঁহার কথায় কেহ সদুত্তর দিল না, অধিকন্তু কৌরবেরা 'দাসী' বলিয়া কেবলই তাঁহাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি স্বামিগণের তেজ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্বাধীন নহেন—সকলকেই যুধিষ্ঠির পণে হারাইয়াছেন।

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় ভীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমগর্জ্জনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জুয়াড়ীরা দাসদাসীকে কখনও পণ রাখিতে পারে না। আপনি সমস্ত রাজ্য, দাসদাসী ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন। আপনি নিজেকে হারাইয়া পরে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, অতএব দ্রৌপদীকে অপমান করিতে আমি দিব না।"

পাছে ভীম ক্রোধের বশে ধর্ম্মরাজকে আরও রূঢ় কথা বলেন, এজন্য অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি ভীমের পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া নিরস্ত করিলেন। ইহাতে কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল না দেখিয়া, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার জন্য সকলের সমক্ষে কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

তখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া সভাস্থ গুরুজন ও স্বামীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজ গুরুজন ও সভ্যদের সমক্ষে পিশাচেরা স্ত্রীজাতির সর্ব্বস্ব লজ্জা নষ্ট করিতে উদ্যত! সভাস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন না। বুঝিলাম, এতদিনে ভারতের সর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে চলিল। স্বামিগণ অতুলনীয় বীর হইয়াও ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া আজ তাঁহারা স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতেছেন না। কিন্তু জানিও যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন ভগবান্ নিজে আসিয়া সতীদের রক্ষা করিবেন এবং দুষ্কৃতেরা তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।"

দুঃশাসন ছাড়িবার পাত্র নহেন। দ্রৌপদীর ধর্ম্মকথায় কর্ণপাত না করিয়া কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী বস্ত্রধারণে অপারগ হইয়া করযোড়ে কায়মনো-বাক্যে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন, দুঃশাসন আর কোন বাধা না পাইয়া সজোরে কাপড় টানিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতই কাপড় টানেন, ততই নানাবর্ণের রাশি রাশি কাপড় দ্রৌপদীর গাত্র হইতে বাহির হয়। রাজসভাস্থল

কাপড়ে ভরিয়া গেল, কিন্তু দ্রৌপদী বিবস্ত্রা হইলেন না! ভীম ধৈর্য্য হারাইয়া আবার উঠিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন—"পাষণ্ড! তোর ইহাতেও জ্ঞান হইতেছে না? তোদের সকলকে মেষপালের মত মনে করিয়া এযাবৎ ক্ষমা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আর ক্ষমা করিব না; তোর বক্ষ নখের আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া জীবন্ত হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া রক্তপান যদি না করি, এবং সেই রক্তে কৃষ্ণার বেণী বন্ধন না করিয়া দিই, তাহা হইলে যেন আমার সদগতি না হয়।"

সভাস্থ সকলেই ভয়বিহ্বল, হতভম্ব! দুর্য্যোধন এই সময়ে দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করিয়া উরুতে বসিতে বলিলেন। তখন ভীম ভ্রাতাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বলিলেন—"যে উরুতে ঐ পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে বসাইবার বাসনা করিতেছে, অচিরেই সেই উরু ভঙ্গ করিব তবেই আমার ভীম নাম সার্থক হইবে। উহাদের মারিবার জন্যই আমি ইহাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া বা জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া মরি নাই।"

যখন ব্যাপার ক্রমেই জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গলধ্বনি উঠিতেছে, তখন সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। গান্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দ্রৌপদীকে কোলে লইয়া গর্ভের কলঙ্ক নিজ পুত্রদের শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং দ্রৌপদীকে সকল রকম বর দিতে চাহিলেন। দ্রৌপদীও শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন।" ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার হুকুম দিয়া বলিলেন—"মা, আর কোন বর প্রার্থনা কর।" দ্রৌপদী বলিলেন—"নিজগুণে যদি আমায় আর কোন বর দিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে আমার আর চারি স্বামীকে মুক্তি দিন।" অন্ধরাজ পাণ্ডবদের সকলকেই মুক্ত করিবার আদেশ দিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনার জন্য দ্রৌপদীকে অনুরোধ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন—"হে ভরতকুলতিলক! আপনার ত জানাই আছে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর প্রার্থনা করিবার অধিকার কাহারও নাই। তাহার উপর অন্য সুখসম্পদ্ যাহা কিছু প্রার্থনীয় তাহা আমি স্বামীদের নিকট হইতে না লইয়া কাহারও বরে সুখসম্পদ্ ভোগ করিবার অভিলাষ করি না।" ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—"মা আমার, সতী-সাবিত্রীর ন্যায় তোমার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক এবং চিরদিন তুমি স্বামিসেবা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর।"

মুক্ত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আপনার হুকুম বহাল থাকুক, কিন্তু উহাদিগকে আবার ফিরাইয়া আহ্বন। এবার আমরা যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা খেলিয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাসের ব্যবস্থা করিব।" পুত্রবৎসল অন্ধ রাজা পুত্রদের অনুরোধে পাণ্ডবদের ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দিলেন। পাণ্ডবেরা গুরুজনদের আজ্ঞা অবহেলা করিতে না পারিয়া পাশাখেলায় পুনরায় প্রবৃত্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন।

পাণ্ডবেরা গুরুজনদের প্রণাম করিয়া মাতৃদেবী কুন্তীকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিদুরের ঘরে এবং সুভদ্রাকে দ্বারকায় কৃষ্ণের আশ্রয়ে রাখিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া বনবাসে যাত্রা করিলেন। বনগমনকালে দ্রৌপদী কুরুকুলনারীগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বলিলেন—"তোমাদের স্বামীরা যেমন আমাকে বিবস্ত্রা করিয়াছেন এবং খোলা চুলে আমাকে এই পথে যাত্রা করাইতেছেন, তেমনি আমরাও ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের ঐ দশা দেখিব,—আর দেখিব কি!—দেখিব তোমরা পতিপুত্রকন্যাহীনা হইয়া এই বেশে মৃতগণের তর্পণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছ।"

বনে গিয়া পাণ্ডবেরা সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ধর্ম্মরাজ আসিয়াছেন শুনিয়া নানাদিগ্‌দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। পাণ্ডবগণ ইঁহাদের যথোচিত সমাদর করিতেন এবং দ্রৌপদী স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম ও রন্ধন করিয়া অতিথি-অভ্যাগত সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইতেন এবং সর্ব্বশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন।

যখন কৌরবেরা শুনিলেন পাণ্ডবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার সুখ ভোগ করিতেছেন এবং দ্রৌপদীর গুণে অজস্র অতিথি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়া যাইতেছে, তখন ইঁহারা দ্রৌপদীর সতীত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য এবং পাণ্ডবদের অতিথিসৎকারে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য দুর্ব্বাসার শরণাপন্ন হন। যখন দুর্ব্বাসা মুনি বহুসহস্র শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদের অতিথি হইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন দ্রৌপদী ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। উপায় কি? দ্রৌপদী ভগবানের শরণাপন্না হইলেন। ভক্তবৎসল আসিয়া দেখা দিলেন এবং দ্রৌপদীর

হাঁড়িতে কিছু আছে কিনা সন্ধান লইয়া দেখিলেন—দ্রৌপদীর ভুক্তাবশিষ্ট একটী শাক আছে, তাহাই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"তৃপ্তোঽস্মি"। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্" সঙ্গে সঙ্গে জগৎ তৃপ্ত হইল। দুর্ব্বাসা শিষ্যগণসহ ভোজনের তৃপ্তিলাভ করিয়া উদ্গার করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সেই সময়ে ভগবান্‌কে নিকটে পাইয়া দ্রৌপদী কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মধুসূদন। আমি পরম বীর্য্যবান্ পাণ্ডবগণের পত্নী, আমার পুত্রগণ সকলেই বীর, আমি দ্রুপদরাজ-কন্যা, বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, তথাপি আমাকে কৌরবেরা কি করিয়া অপমান করিল ?" প্রত্যুত্তরে ভগবান্ বলিলেন—"অধর্ম্মনাশের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তুমি কাঁদিও না, অধর্ম্মের বিনাশ তোমার স্বামিগণ দ্বারাই করাইব। অর্জ্জুনের শরজালে বা ভীমের গদাঘাতে কেহই রক্ষা পাইবে না।"

একদা পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে বনে একাকী রাখিয়া মৃগয়ায় যান। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সময় ঐ বনে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে একাকী দেখিয়া তাঁহার সতীত্ব হরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। দ্রৌপদী ধর্ম্মকথায় জয়দ্রথকে পাপবাসনা পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু জয়দ্রথ ধর্ম্মকথা না শুনিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক রথে উঠাইলেন। দ্রৌপদী শত্রু বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভীমসেন আসিয়া রথসমেত জয়দ্রথকে ধরিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে আনিলেন। ধর্ম্মরাজ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী ভীমকে বলিলেন,—"উহাকে আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাইয়া, মাথা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দাও।" দ্রৌপদীর কথায় জয়দ্রথ সম্মত হইলে ভীম তাঁহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন।

দ্বাদশবর্ষ এইরূপে কাটিয়া গেল। এবার অজ্ঞাতবাসের পালা। এই সময়ে সকলে ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বিরাটরাজার আশ্রয়ে চাকুরীর অন্বেষণে গেলেন। বিরাট-রাজ সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম পাচকরূপে, দ্রৌপদী রাজপরিবারের বেশ-বিন্যাস-কার্য্যে 'সৈরিন্ধ্রী' নামে এবং আর সব ভাই অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। বিরাট-রাজগৃহে সৈরিন্ধ্রীর রূপলাবণ্য দেখিয়া দুষ্টের দল কুমন্ত্রণা করিতে

লাগিল। রাজশ্যালক কীচক নিজ বীরত্বে বিরাটের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন সৈরিন্ধ্রীকে তাঁহার গৃহে যাইতে বলায় রাণী সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে পাঠাইলেন। কীচক সৈরিন্ধ্রীকে একাকিনী পাইয়া নিজ কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সৈরিন্ধ্রী এই অজ্ঞাতবাসে নিজ পরিচয়দানে অক্ষম হইয়া বলিলেন—"আমার পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামী আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। কোনরূপে আমাকে লাভ করিতে চাহিলেই তাঁহারা তোমাকে সংহার করিবেন।" কীচক তবুও পাপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। একাকিনী রমণী কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া ভগবানের শরণ লইলেন। কীচক তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিলেন। ইহাতে সৈরিন্ধ্রী ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া নিজ বস্ত্র ছিনাইয়া লইবার জন্য এমন জোরে টান দিলেন যে, কীচকের মত বীর, বিরাট-রাজের প্রধান সেনাপতি, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্রৌপদী রাজসভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কীচকও ক্রোধে এবং অপমানে অস্থির হইয়া সভামাঝে আসিয়া দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে দ্রৌপদী ভীমকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হে মধ্যম পাণ্ডব, তুমি ভিন্ন এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহই নাই,"—পরে বিরাটরাজকে বলিলেন—"মনে করিয়াছিলাম আপনি ধার্ম্মিক, কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দ্দোষ নারীর উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন না। আরও দেখিতেছি, আপনার সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেহই ধার্ম্মিক নহেন।" সেই সময়ে ধর্ম্মরাজ ইঙ্গিত করিলে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

ইহাতে দ্রৌপদীর ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না; তিনি ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। ভীম বলিলেন—"যদি কীচক পুনরায় পাপ-প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে নৃত্যশালায় লইয়া আসিও; সেখানে আমি তাহার প্রাণবধ করিব।" কীচকের লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্রৌপদী প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি পুনরায় পাপ-বাসনা ব্যক্ত করিলেন। এবার দ্রৌপদী তাঁহাকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সৈরিন্ধ্রীবেশী ভীম এক লাথিতে কীচককে বধ করিলেন।

কীচকের অন্যান্য ভ্রাতা দ্রৌপদীকেই কীচকের মৃত্যুর হেতু জানিয়া কীচকের সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীরও সৎকার করিবেন বলিয়া দ্রৌপদীকে শ্মশানে ধরিয়া লইয়া গেলেন। ভীম ঐ সংবাদ পাইয়া শ্মশানে গিয়া কীচকের একশত পাঁচ ভাইকে বধ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল—দ্রৌপদীর গন্ধর্ব্ব স্বামীরাই সর্ব্বনাশ করিতেছে। বিরাটরাজও ভয় পাইয়া দ্রৌপদীকে তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার আদেশ দিলেন। দ্রৌপদী ১৩ দিন সময় চাহিলেন। ইতোমধ্যে বিরাটরাজের বিরুদ্ধে কৌরব ও ত্রিগর্ত্তরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শত্রুপক্ষ ভীম ও অর্জ্জুনের বিক্রমে পলাইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। বিরাটরাজ ইহাদের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর সহিত নিজ কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজ রাজ্য চাহিয়া কৌরবদের নিকট দূত পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিয়া দিলেন, "যদি রাজ্য দিতে কৌরবদের অসম্মতি থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচ ভাইয়ের বাস করিবার জন্য পাঁচখানি গ্রাম দিলেই আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারিব।" দুষ্ট দুর্য্যোধন দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।"

নিরুপায় হইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরব পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বড় বড় বীর ও রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কেবল-মাত্র দ্রুপদরাজ, তাঁহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ পাণ্ডবপক্ষে রহিলেন। দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ তখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। পাণ্ডবেরা তাঁহাকেই দূতরূপে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কৌরবদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু দ্রৌপদী ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে মধুসূদন। ধর্ম্মরাজ জ্ঞাতিবধভয়ে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছা নহে জ্ঞাতিবধ হয়, কিন্তু বধ্যকে বধ না করিলে যে পাপ হয়, তাহা তুমি ত জান। অতএব আমি বিশেষ কিছু বলিব না, কেবল এই কথা বলি—যদি আমাদের হৃতরাজ্য কৌরবেরা প্রত্যর্পণ না করেন, তাহা হইলে সন্ধি করিও না।"

বাসুদেব কৌরবসভায় সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলে উঁহারা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত

করিলেন না বরং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"পরে বলিব।" কিছুদিন পরে কৌরবদের যাতায়াতে শ্রীকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হইয়া বলিলেন—"আমার নিদ্রাভঙ্গে যাহার মুখ আগে দেখিব, সেই দিকে যাইব।" ধনমদে গর্ব্বিত দুর্য্যোধন সর্ব্বাগ্রে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশে আসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন পায়ের নীচে আসন লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ উঠিবার সময় অর্জ্জুনকেই প্রথমে দেখিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে জানাইলেন, 'পাণ্ডবপক্ষেই আমাকে যাইতে হইবে, তবে আমার সমস্ত সেনা কৌরবপক্ষে থাকিবে।' অতঃপর দুর্যোধনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না জানাইলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮ দিন ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। অর্জ্জুন জ্ঞাতিবধভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণকে রথ ফিরাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ১৮ দিন যুদ্ধের সময় নানারূপ ধর্ম্মকথা বলিয়া ও যৌগিক পন্থা দেখাইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। ঐ উপদেশবাণী **গীতা** নামে অভিহিত। ভীম কৌরববংশ ধ্বংস করিলেন, এবং কৃষ্ণার অপমানকারী দুঃশাসনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া হৃৎপিণ্ডের তপ্ত রক্ত পান করিলেন। পর্ব্বের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইল। পরে তিনি দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়া দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ লইলেন। দ্রৌপদী তাঁহার পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্য ভীমকে অনুরোধ করিলেন। ভীম অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মস্তকমণি আনিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এইরূপে ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ একরূপ নির্ম্মূল হইল। কৌরবপক্ষের পরাজয় হইল এবং তাঁহাদের পাপকার্য্যের ফল ফলিল। পাণ্ডবগণ বহু জ্ঞাতিবধ দেখিয়া মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। উত্তরার শিশুপুত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্রৌপদী ও সত্যভামা-সংবাদ

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে একদিন কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা স্বামীর সহিত দ্রৌপদী দর্শনে যাত্রা করেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন— "সখি! তোমার স্বামিগণ অদ্বিতীয় বীর, উঁহারা তোমাতে সর্ব্বদাই অনুরক্ত। তুমি

কি মন্ত্রবলে, ব্রত উপবাসে বা তীর্থ-জপযজ্ঞের দ্বারা উঁহাদিগকে এতাদৃশ বশীভূত করিয়াছ?" দ্রৌপদী সত্যভামার কথায় হাসিয়া বলিলেন—"সখি! এরূপ অদ্ভুত কথার জবাব দিবার শক্তি আমার নাই। ঐ সব উপায়ের কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। মন্ত্র, যাদু বা ঔষধাদি অশিক্ষিতা নারীগণেরই স্বামি-বশীকরণের ঔষধ। ইহাতে স্বামী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বশীভূত হন না, পরন্তু ঔষধাদি প্রয়োগে নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হন। অতএব এইরূপ আচরণ নারীগণের কর্ত্তব্য নহে। সাধ্বী নারী কখনও ওসব পথ অবলম্বন করেন না, বরং ঘৃণা করেন। স্বামী ঐ সব আচরণের কথা জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অনুরক্ত না হইয়া বরং তাহাকে ঘৃণাই করেন এবং জীবন সংশয় বোধ করিয়া সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে দূরে থাকেন; সাপ লইয়া গৃহ-বাসের ন্যায় সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করেন। অতএব সখি! ওসব উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করা যায় না!

"আমি পঞ্চপাণ্ডবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি, এ কথা যদি সত্য হয় স্বামীরা আমাতেই একান্ত অনুরক্ত, যদি মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হইল আমি কি করিয়া স্বামীদের মনোরঞ্জন করিয়াছি।

"ভগিনি! আমি ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদের সেবা-শুশ্রূষা করি। অভিমানিনী না হইয়া, কোনরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বা কোনরূপ অবাধ্য না হইয়া তাঁহাদের সকলের ইঙ্গিতমাত্র সব আদেশ পালন করি। তাঁহাদের না দেখিলে প্রতিমুহূর্ত্ত আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয়। তাঁহারা কোথাও গেলে আমি ভোগবিলাস পরিত্যাগ করি এবং তাঁহাদের মঙ্গল-কামনায় তপস্যা প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করি। আমি প্রত্যহ অতি যত্নে গৃহ-মার্জ্জনাদি করি, যথাসময়ে রন্ধন করিয়া স্বামীদের পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাই।

"কখনও কোন দুষ্টস্বভাব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশি না, একাকিনী যেখানে সেখানে যাই না, বা গৃহদ্বারে ও গবাক্ষপথে দাঁড়াই না। স্বামিগণের সহিত পরিহাসচ্ছল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উচ্চহাস্য করি না, এবং সর্ব্বদা সত্যপথে থাকিয়া স্বামীদের সেবা করি।

"আমার স্বামিগণ যে দ্রব্য আহার করেন না, তাহা আমি কদাচ আহার করি

না বা স্পর্শ করি না। তাঁহাদের আদেশে আমি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হই। শাশুড়ী ও গুরুজনেরা আমাকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমি পালন করি। আমার স্বামিগণ ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তস্বভাব, তথাপি আমি শ্রদ্ধা ও ভয়ের সহিত তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকি।

"হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম; পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই গর্হিত। পতির মত দেবতা নারীর আর কেহই নাই। পতি আমাদের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মূল। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমি কখনও শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না। আমি প্রাণান্তেও শাশুড়ীর নিন্দা করি না, শাশুড়ীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করি না, কখনও তাঁহাকে বাদ দিয়া উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করি না।

"আমি ধর্ম্মরাজের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং পোষ্যগণের ভরণপোষণে ত্রুটি করি না। আমি নিজে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন করিয়া থাকি। সমুদ্র যেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে, আমিও সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপুল রাজ্য ও সংসারের হিসাব রাখি।

"সকলে নিদ্রিত হইলে আমি শয্যা গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করি এবং সর্ব্বদা সত্যে রত থাকি। সখি! আমি যে-প্রকারে স্বামীদের বশীভূত করিয়াছি, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিলাম। তুমি যদি আমার স্বামিসুখে হিংসা কর এবং আমার মত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে চাও তাহা হইলে আমার মত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্য ও ধর্ম্ম পালন কর।

"ভগিনি! তোমাকে উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি তুমি যখন সখীভাবে আমায় বিদ্রূপ করিয়াছ, তখন প্রত্যুত্তরে সখীভাবেই তোমাকে উপদেশ দিতেছি—"স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল। স্ত্রী—স্বামীর ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সঙ্গিনী।"

দ্রৌপদীর কথায় সত্যভামার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে ভাবিলেন—প্রিয়সখীকে না ঘাঁটাইলে ভাল হইত। বলিলেন—"ভগিনি! না বুঝিয়া তোমাকে ঠাট্টা করিয়াছি

বলিয়া ত্রুটি লইও না। দুই সখী এইবার দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। পরে সত্যভামা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গান্ধারী

মহাভারতের যুগে আমরা যে-কয়টী উন্নতচরিত্রা ভারত-রমণীর পরিচয় পাই, তাঁহাদের মধ্যে গান্ধার-রাজকন্যা ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর চরিত্র শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বলিয়া মনে করি। স্বভাব-দুর্ব্বল ভোগবিলাসময় নারীজীবনে গান্ধারী যে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, ধর্ম্মানুরাগ ও আত্মত্যাগের পূর্ণজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা খুব কম নারীচরিত্রে দৃষ্ট হয়। শত বীরের জননী রাজরাজেশ্বরীর এমন সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি সত্যই দুর্লভ।

গান্ধারের অধিপতি রাজা সুবল স্বীয় কন্যা গান্ধারীর বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইলে হস্তিনাপুর হইতে এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, ভীষ্মদেব গান্ধারীর সহিত জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বীরত্বে ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা ভাল পাত্র আর কেহ না থাকিলেও, গান্ধারীর পিতামাতা জন্মান্ধকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী গান্ধারী বুঝিতে পারিলেন—ভীষ্মদেবের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যদি তাঁহার পিতা ভীষ্মদেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে সবংশে নিহত হইবেন। গান্ধারী পিতাকে বলিলেন—"বিধির বিধান খণ্ডাইবার শক্তি কাহারও নাই। পতি খঞ্জ বা অন্ধ হইলেও তিনিই পরম গুরু, তিনিই আমার দেবতা। আমি যেন অন্ধ রাজাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে মনে প্রাণে ভালবাসিয়া নারীজীবন সার্থক করিতে পারি।"

গান্ধার-রাজ ও তাঁহার পত্নী কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া গান্ধারীকে সাধারণ নারী বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না; ভাবিলেন ইনি সাক্ষাৎ দেবী; মর্ত্ত্যলোকে নারীচরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ রাখিবার জন্যই ইহার জন্ম।

শুভদিনে শুভক্ষণে মহাসমারোহে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ হইয়া গেল। স্বামীর দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়া নিজেও দৃষ্টিসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন, এজন্য বিবাহের পূর্ব্বেই গান্ধারী চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেও অন্ধ সাজিয়াছিলেন। চারি চক্ষের শুভদৃষ্টি না হইলেও মনে প্রাণে শুভমিলন হইয়া গেল। গান্ধারী শ্বশুরঘর করিতে হস্তিনাপুরে চলিলেন।

হস্তিনাপুরে গান্ধারী পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুবংশের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল। গান্ধারী ও তাঁহার দেবরপত্নী কুন্তীদেবী সন্তানাদি প্রসব করিয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। গান্ধারীদেবী শত পুত্রের জননী হইলেন। তাঁহার সকল রকম সৌভাগ্য লাভ হইল। স্বামী অন্ধ বা নিজে অন্ধ সাজিয়াছেন বলিয়া কোন দুঃখ রহিল না।

সুখ চিরদিন স্থায়ী হয় না। গান্ধারীর সুখও স্থায়ী হইল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনের মদোন্মত্ততা ও ক্রূর স্বভাব দেখিয়া গান্ধারী ভীতা হইলেন। দুর্য্যোধনের সঙ্গে সঙ্গে শত-পুত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। অন্ধরাজা মৃদুভাবে দুর্য্যোধনকে অসৎপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না; কিন্তু গান্ধারীর ন্যায়বিচার ও শাসনে দুর্য্যোধন কম্পিত হইলেও, অন্ধ পিতাকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন বুঝিয়া গান্ধারীর নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতেন। ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত সামান্য সামান্য বিরোধ দেখিলে গান্ধারী বিচারের জন্য অন্ধ-রাজাকে বলিতেন; কিন্তু পুত্রবৎসল দুর্ব্বলহৃদয় ধৃতরাষ্ট্র কঠোর শাসন করিতে না পারিয়া দুর্য্যোধনকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করিতেন।

গান্ধারী বলিতেন—"মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি"। কঠোর শাসন ভিন্ন দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে স্ববশে আনা অন্ধরাজার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই গান্ধারী পুত্রদিগকে কঠোর শাসন করিবার জন্য রাজাকে বলিতেন। রাজা বলিতেন—"আমি জন্মান্ধ বলিয়া রাজা হইতে পারি নাই; আমার পুত্রেরা আমার অপরাধে রাজ্য পাইবে না। এইজন্য বুদ্ধিমান্ পুত্রগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া মাঝে মাঝে পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত বিরোধ বাধাইলেও ন্যায়ধর্ম্মের বিচারে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অসৎপথ পরিত্যাগ করিবে।"

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রগণের যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া নানা ছলে, নানা কৌশলে পাণ্ডুপুত্রগণকে হত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন বারণাবতের জতুগৃহে পাণ্ডবগণকে পাঠাইয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করাইলেন। মহামতি বিদুর দিব্যদৃষ্টির বলে এ সব জানিতে পারিয়া পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া ছদ্মবেশে থাকিতে পূর্ব্বেই উপদেশ দেন। জতুগৃহে অগ্নিসংযোগের ফলে পাণ্ডবদের মৃত্যু হইয়াছে স্থির হইল এবং দুর্য্যোধন ইহার জন্য চারিদিকে আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। এই সংবাদ গান্ধারীর নিকট পৌছিলে গান্ধারী শোকে অধীর হইলেন। পুত্রগণের এইরূপ নীচতা ও ক্রূরতা দেখিয়া গান্ধারী নিজেই উহাদের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে অস্থির হইয়া তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পুত্রদের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কামনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের এইরূপ নীচতায় অধীর হইলেন এবং পুত্রদের যথোচিত তিরস্কার করিলেন; কিন্তু অন্ধস্নেহের বশে তিনি অন্য কোন দণ্ডাজ্ঞা দিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে জানা গেল যে পাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে থাকিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছে। তখন গান্ধারীর আনন্দের সীমা রহিল না। গান্ধারী তখনই মহাসমারোহে পাণ্ডুপুত্রগণকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন। নববধূ দ্রৌপদীকে তিনি সানন্দে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তোমার স্বামীরা চিরদিন জয়ী হইয়া রাজ্য ও সুখ ভোগ করিবে, তুমিও রাণী হইয়া চিরসুখে এ রাজ্য ভোগ করিবে।"

কিছুদিনের জন্য সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে গান্ধারী নববধূ দ্রৌপদীকে লইয়া সংসার করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন হিংসানলে জলিয়া-পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনার রাজ্য দুর্য্যোধনকে দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য পাণ্ডুপুত্রদের দিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; সমস্ত রাজাই যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। সকলেই রাজসূয় যজ্ঞে এক একটী

কাজের ভার লইলেন। দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির নানাভাবে সম্মানিত করিলেও পাণ্ডবেরা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এ ধারণা জন্মিতে তাঁহার বাকী রহিল না। তিনি উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মাতুল শকুনির আশ্রয় লইলেন। মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় আনাইয়া পাশাখেলাই স্থির হইল। পাশাখেলায় একে একে যুধিষ্ঠির ধন-দৌলত, স্বয়ং এবং চারি ভাই ও দ্রৌপদীকে হারাইলেন; দুর্য্যোধনের আদেশে তদীয় সহোদর দুঃশাসন দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য রাজসভায় টানিয়া আনিয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ অন্তঃপুরে গান্ধারীর নিকট পৌছিবামাত্র তিনি অধর্ম্মাচারী পুত্রগণের পাপাচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া অব্যক্ত মর্ম্মজ্বালায় অস্থির হইয়া রাজসভায় ছুটিয়া আসিলেন। তিনি রাজপদে নিবেদন করিলেন দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিতে; বলিলেন—"বহু আগে দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করা উচিত ছিল, পুত্রের মুখ দেখিয়া তিনি এতদিন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু আর নয়, অত্যাচারের মাত্রা তাহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন, প্রাচীন কুরুবংশের মর্য্যাদার হানি হইতেছে, স্বর্গত পিতৃপুরুষগণ লাঞ্ছিত হইয়াছেন—দুর্য্যোধনকে আর ক্ষমা করিবেন না।" ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর প্রার্থনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, পিতৃস্নেহের দোহাই দিয়া গান্ধারীকে বুঝাইলেন। প্রত্যুত্তরে গান্ধারী বলিলেন—"সন্তানের প্রতি স্নেহ মাতারও আছে, কিন্তু পুত্রের কল্যাণের জন্যই তাহাকে বর্জ্জন করিতে বলিতেছি।"

গান্ধারী পতিব্রতা পুত্রস্নেহময়ী; কিন্তু সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও উদার ধর্ম্মবোধ। সমস্ত নারীর প্রতিনিধি হইয়া নয়নের জলে তিনি রাজপদতলে বিচার প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে রাজা নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন স্বামীও ন্যায়বিমুখ। তখন তাঁহার বেদনা আরও বাড়িয়া গেল। ধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী হইয়া ও শত-পুত্রের জননী হইয়া তিনি বড় আশা পোষণ করিতেন; কিন্তু আজ তাঁহার সব আশা নির্ম্মূল হইল; ধৃতরাষ্ট্রমহিষী হইয়াও তাঁহার পত্নীত্বের মর্য্যাদার হানি হইল, তাই তিনি গর্ভের কলঙ্ক দূর করিবার

জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। স্বামীর কাছে বিচারের আশা নাই দেখিয়া তিনি স্বয়ং বিধাতার কাছে ন্যায়-বিচারের আবেদন করিলেন এবং যতদিন সেই বিচারের ফল দারুণ দুর্দ্দিনরূপে আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততদিন মৌনভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গান্ধারীর মৌনভাব দেখিয়া দুর্য্যোধন তলে তলে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আবার পাশাখেলায় পণ রাখিবার জন্য পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন। এবারেও যুধিষ্ঠির পণে হারিলেন এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীকে লইয়া বনবাসী হইলেন।

বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য দাবী করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র সকলেই দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তারপর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে আসিয়া পঞ্চপাণ্ডবের জন্য মাত্র পাঁচখানি গ্রাম চাহিলেন, কিন্তু দম্ভী দুর্য্যোধন বলিলেন—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"

অগত্যা পাণ্ডবেরা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া কৌরবদের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনদের অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু উঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিলেন না। গান্ধারী সকল সংবাদ জানিয়া পাণ্ডবদের জয় কামনা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অনেক বুঝাইয়া বলিলেন—"তোমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, ধর্ম্মপথের জয় অনিবার্য্য—'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম'॥" উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, সে যুদ্ধে সকলেই ধ্বংস হইল, কেবল পঞ্চপাণ্ডব বাঁচিয়া রহিলেন।

যুদ্ধে জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি ভগ্নহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে আসিয়া গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের পদধূলি লইলেন। শতপুত্র-শোকাতুরা গান্ধারী ন্যায়নীতিতে গরীয়সী হইলেও, মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শোকসাগরে ভাসিয়া গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাত করিলেন।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে নিয়ন্তা! তুমি যখন আমার পুত্রগণকে অধার্মিকরূপে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক ধর্ম্মের জয়ের উদাহরণ দেখাইলে, তেমনি আমিও পতিসেবার ফলে যদি কোন পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে তোমাকে অভিসম্পাত দিতেছি যে, জানিয়া শুনিয়া তুমি যেমন কুরুকুলের ধ্বংস ঘটাইয়া এত দুঃখ দিয়াছ, সেইরূপ তোমার বংশ তোমার দ্বারাই ধ্বংস হইবে এবং তুমিও আত্মীয়স্বজনহীন হইয়া বনমধ্যে ব্যাধের হস্তে নিহত হইবে।"

তখন হইতে পাণ্ডবেরা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিয়া কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাদের পুত্রশোক ভুলাইয়া দিলেন। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারী তপোবনে গিয়া শেষ কয়দিন শ্রীভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। তপস্যায় কিছুদিনের জন্য সুখশান্তি-লাভের পরে ধৃতরাষ্ট্র দেহত্যাগ করিলেন। গান্ধারীও সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত স্বর্গে বাস করিতে চলিয়া গেলেন।

গান্ধারীর চরিত্র ধূলিমলিন পৃথিবীর নহে—উহা অপার্থিব—উহা স্বর্গীয়।

চিন্তা

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের পুত্র মহারাজ শ্রীবৎসের গুণের তুলনা নাই। বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও পাণ্ডিত্যে তাঁহার তুলনা হয় না। যথাকালে চিত্রসেনের কন্যা চিন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন হইল। রূপে, গুণে কেহই চিন্তার সমকক্ষ ছিল না। বহুকাল এই রাজদম্পতি পরম সুখে কাল কাটাইলেন।

কিন্তু সুখ চিরদিন সমান থাকে না। 'কে বড়' এই লইয়া স্বর্গে লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। মীমাংসার ভার অবশেষে মর্ত্ত্যের রাজা শ্রীবৎসের উপর পড়িল। লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই শ্রীবৎসের নিকট আসিলেন। শ্রীবৎস লক্ষ্মীকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন। শনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। লক্ষ্মী শ্রীবৎসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"সর্ব্বদাই আমি ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাতে থাকিব।"

শনির প্রতিহিংসা সত্বরই আরম্ভ হইল। তাঁহার কোপে শ্রীবৎসের রাজ্যে হাহাকার উঠিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে রাজ্য প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল, অগ্নিদাহে সহস্র সহস্র গৃহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। প্রজারা ব্যাকুল ক্রন্দনে রাজার নিকট তাহাদের অবস্থা জানাইতে লাগিল। শ্রীবৎস সব শুনিলেন, সব দেখিলেন, এবং নিজেরই বিচারশক্তির ফলে যে আজ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাও বুঝিলেন। কিন্তু কোন উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব হইল না। অবশেষে শ্রীবৎস বনগমনই শেষ উপায় স্থির করিলেন।

তিনি চিন্তাকে পিতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন; বলিলেন—"আমারই দোষে আজ এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ফল আমি স্বয়ংই ভোগ করিব। তুমি আমার সহিত অনর্থক কষ্ট পাইবে কেন?" কিন্তু চিন্তা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না; বলিলেন—"তোমার বিপদে আমার বিপদ্, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে আর আমি কি সুখে পিতৃগৃহে রাজভোগে থাকিব? সহস্র কষ্টের মধ্যে আমি তোমার সঙ্গে থাকিলেই পরম সুখে থাকিব।" শেষে একত্র বনগমনই স্থির হইল। মণিমুক্তার একটী পুঁটুলী বাঁধিয়া রাজদম্পতি গভীর রাত্রে বহির্গত হইলেন।

শ্রীবৎস ও চিন্তা এক বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন—সম্মুখে এক ভীষণ নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে। একখানি জীর্ণ নৌকা অদূরে ভাসিতেছে; তাহাতে একজন মাঝি বসিয়া আছে। নদী পার করিয়া দিবার জন্য শ্রীবৎস তাহাকে আহ্বান করিলেন। মাঝি কহিল—"পুঁটুলী ও তোমাদের দুই-জনকে একেবারে পার করিতে পারিব না। একসঙ্গে দুইটী করিয়া পার করিতে পারি। যদি তোমরা দুই জনে একসঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পুঁটুলী আগে পার কর, অথবা পুঁটুলী পরে পার করিব।" শনির প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি রাজা পুঁটুলী আগে পার করিবার জন্য নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা ছাড়িল। মুহূর্ত্তে মায়ানদী অদৃশ্য হইল এবং দৈববাণী হইল—"এ তোমারই বিচারশক্তির পুরস্কার।" এইরূপে রাজদম্পতি কপর্দ্দকশূন্য হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধীবরের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কোন মতেই মৎস্য ধরিতে পারিতেছিল না। শ্রীবৎস তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তালবেতালকে স্মরণ করিলেন। তাহারা প্রচুর মৎস্য পাইল। সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা একটী মৎস্য ইহাদিগকে দিয়া গেল। সেই মৎস্য ইহাদের সেইদিনের একমাত্র আহার্য্য হইল।

সেই মৎস্য দগ্ধ করিয়া চিন্তা তাহা ধৌত করিবার জন্য জলাশয়ে গেলেন। 'রাজভোগে অভ্যস্ত রাজা কিরূপে তাহা ভোজন করিবেন' এই চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা জলে নামিয়াছেন, এমন সময়ে সেই দগ্ধ মৎস্য লাফ দিয়া জলে পলায়ন করিল। সাধ্বী হাহাকার করিতে করিতে শ্রীবৎসের নিকট আসিয়া সব বলিলেন। শ্রীবৎস সব বুঝিলেন; সেদিন বন্য ফলমূলে কোনরূপে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন।

এইরূপে বনে কতকাল কাটিল। অবশেষে কোন নগরে যাওয়াই স্থির হইল। একদিন দুই জনে এক কাঠুরিয়াপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। দীনবেশ দেখিয়া কাঠুরিয়াগণ ইহাদের চিনিতে পারিল না। তাহারা সাগ্রহে ইহাদিগকে আশ্রয় দিল।

মহারাজা শ্রীবৎস তখন কাঠুরিয়া। তিনি তাহাদের সহিত বনে কাঠ আনিতে যান এবং বাজারে সেই কাঠ বিক্রয় করেন। চিন্তার গুণে কাঠুরিয়াদের স্ত্রীগণ মোহিত হইল। তাঁহার রন্ধন তাহাদের নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদাগর নৌকায় করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। শনির মায়ায় নৌকা সেই কাঠুরিয়াপল্লীর নিকট আসিয়া চড়ায় আটকাইয়া গেল। নৌকা কিছুতেই চলিল না। সওদাগর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শনি এক গণকের বেশ ধরিয়া সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"যদি কোন সতী আসিয়া তোমার নৌকা স্পর্শ করে, তাহা হইলে নৌকা চলিবে।" সওদাগর উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া কাঠুরিয়াপল্লীর সমস্ত স্ত্রীলোককে আনাইয়া নৌকা স্পর্শ করাইলেন। তথাপি নৌকা চলিল না, অবশেষে শনির কৌশলে চিন্তাকে আহ্বান করা হইল। সতী মহাবিপদে পড়িলেন। 'স্বামী গৃহে নাই, তাঁহার কোন স্থানেই যাওয়া উচিত নয়, অথচ একজন বিপন্ন, তিনি একবারমাত্র গেলেই সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবে।' তাই অনেক আলোচনার পরে অবশেষে তিনি নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল। সওদাগর মহা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ বিপদ্ পাছে ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া সওদাগর বলপূর্ব্বক চিন্তাকে নিজের নৌকায় তুলিয়া লইলেন। নৌকা ভাসিয়া চলিল।

নৌকায় উঠিয়া চিন্তা 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। পাপাত্মা সওদাগর হয়ত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে, এই আশঙ্কায় সতী সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার রূপবিকৃতি ঘটে। দেখিতে দেখিতে চিন্তার অঙ্গে গলিতকুষ্ঠ দেখা দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।

শ্রীবৎস বনে কাষ্ঠসংগ্রহার্থে গিয়াছিলেন; আসিয়া দেখেন চিন্তা কুটিরে নাই। লোকমুখে চিন্তার অবস্থার কথা শুনিয়া তিনি উন্মাদের মত চীৎকার করিতে করিতে নদীতীরে ছুটিলেন। নদীর ধার দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। যাহাকে দেখেন, তাহাকেই চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা করেন।

এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস সুরভির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সুরভির মুখে চিন্তার সকল অবস্থা শুনিলেন। সুরভি তাঁহাকে সেই আশ্রমে থাকিতে বলিলেন। সুরভির দুগ্ধধারে মাটি ভিজিয়া যাইত। শ্রীবৎস তালবেতালকে স্মরণ করিয়া সেই মাটি দুই হস্তে ধরিতেন, আর উহা অমনি স্বর্ণপাট হইয়া উঠিত। এইরূপে তিনি বহু স্বর্ণপাট প্রস্তুত করিলেন।

অবশেষে শ্রীবৎসের লোভ উপস্থিত হইল; তিনি সেই সকল পাট বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নদীতীরে একদিন দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখেন এক সওদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছে। তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া সেই সকল স্বর্ণপাট লইয়া যাইতে বলিলেন। সওদাগর স্বর্ণপাটগুলি নৌকায় তুলিয়া লইল। শ্রীবৎসও সঙ্গে চলিলেন।

এত স্বর্ণের লোভ সওদাগর সংবরণ করিতে পারিল না। সে শ্রীবৎসকে হত্যা করিয়া স্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। হস্তপদ বন্ধন করিয়া সওদাগর শ্রীবৎসকে জলে ফেলিয়া দিল। শ্রীবৎস তালবেতালকে স্মরণ করিয়া জলে ভাসমান রহিলেন। দৈবযোগে সেই নৌকাতেই চিন্তা ছিলেন, তিনি স্বামীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া

একটা বালিশ জলে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীবৎস ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। নৌকা চলিয়া গেল।

ভাসিতে ভাসিতে শ্রীবৎস সুবাহু রাজার দেশে মালিনীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়া তিনি মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিলেন।

সুবাহু রাজার কন্যা ভদ্রা শ্রীবৎসকে দেখিয়া মোহিত হন। রাজা কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন। অনেক দেশ হইতে রাজপুত্রেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রা শ্রীবৎসকে ভিন্ন কাহাকেও মাল্যদান করিলেন না। শ্রীবৎস এক্ষণে রাজ-জামাতা হইলেন এবং রাজগৃহে স্থান পাইলেন।

ঘটনাচক্রে সওদাগর সেই সকল স্বর্ণপাট বিক্রয় করিবার জন্য সুবাহু রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইল। শ্রীবৎস সেই সকল স্বর্ণপাট দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। সওদাগরকে চোর বলিয়া রাজার নিকট অভিযুক্ত করিলেন। সওদাগর ঐ সকল স্বর্ণপাট নিজের বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিল না; রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। শ্রীবৎস সমস্ত স্বর্ণপাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়া দেখেন সেই নৌকাতে চিন্তা রহিয়াছেন। পুনরায় উভয়ের মিলন হইল। সূর্য্যের স্তবে চিন্তার রূপলাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিল। সুবাহু শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলেন। শনির প্রভাবেই এই দুর্দ্দশা হইয়াছে বুঝিয়া তিনি শনির স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবৎসের দুঃখের দিন কাটিল। শুভদিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া শ্রীবৎস নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। সতীর প্রভায় রাজ্য আবার সুখৈশ্বর্য্যে হাসিয়া উঠিল।

বেহুলা

বেহুলা, নিছনি নগরের সায়-সওদাগরের কন্যা। রূপে, গুণে, বেহুলার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তিনি সমস্ত গুণের আধার। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া কেহ মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিত না, সেইজন্য সকলে তাঁহাকে 'বেহুলা নাচুনী' বলিয়া ডাকিত।

তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, বুঝি স্বর্গের কোন অপ্সরা মানুষের দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহুলা বিবাহের উপযুক্তা হইয়া উঠিলেন।

শৈব চাঁদ সওদাগর চম্পক নগরের অধিপতি। মনসাদেবীর প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষভাব ছিল। 'চাঁদ সওদাগর পূজা না করিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হইবে না'—শিবের এইরূপ আদেশ ছিল বলিয়া, মনসাদেবী চাঁদের পূজা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চাঁদ কিছুতেই তাঁহাকে পূজা করিতে সম্মত হইলেন না। মনসাদেবী অবশেষে তাহার প্রতিফল দিবার জন্য বিবিধরূপে চাঁদের অনিষ্ট করিতে লাগিলেন। একে একে চাঁদের ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত করিলেন; তথাপি চাঁদ অবিচলিত, কিছুতেই মনসার পূজা করিলেন না। লোকের সহস্র উপদেশে, পত্নীর অবিরাম অশ্রুপাতে, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনসার কোপে শেষে ধনরত্নসহ চাঁদের চৌদ্দখানি ডিঙা জলমগ্ন হইল। চাঁদ অতিকষ্টে রক্ষা পাইলেন।

কিছুদিন এইভাবে কাটিল। অবশেষে চাঁদের আর এক পুত্র জন্মিল, নাম হইল লক্ষ্মীন্দর। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পত্নী কত বুঝাইলেন, চাঁদ কিছুতেই পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইল।

নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া ঘটক সায়-সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেহুলার সহিত লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু দৈবজ্ঞ চাঁদকে গোপনে বলিয়া গেলেন—"বাসরঘরে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হইবে।"

এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চাঁদ সাঁতালি পর্ব্বতে এক লোহার বাসর নির্ম্মাণ করাইলেন; যাহাতে কোন সর্প সেখানে না আসিতে পারে, তাহার বিশিষ্ট-রূপ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু মনসার আদেশে বাসর-নির্ম্মাতা এক সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখিয়া গেল, চাঁদ তাহা জানিতে পারিলেন না।

মহাসমারোহে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ হইয়া গেল। চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই বাসরে রাখিলেন। ক্রীড়াকৌতুকের পরে লক্ষ্মীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেহুলা জাগিয়া থাকিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীন্দর জাগিয়া উঠিয়া ভাত খাইতে চাহিলেন। বেহুলা কোনরূপে সেইখানেই রন্ধন করিয়া স্বামীকে

খাওয়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে সেই ছিদ্র-পথে কালনাগিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিল। লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেহুলা জাগিয়া দেখেন—তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

প্রত্যূষে চাঁদ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বেহুলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া বুঝিলেন, লক্ষ্মীন্দর আর নাই। দ্বার উন্মুক্ত হইল, দেখিলেন স্বামীর বিবর্ণ-শব ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বরাত্রের পরিণীতা বালিকা বেহুলা হাহাকার করিতেছে। শোকে, ক্ষোভে চাঁদ সংসার ত্যাগ করিলেন।

সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়াই প্রথা; সুতরাং লক্ষ্মীন্দরকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ছাড়িয়া থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমার ন্যায় সেই ভেলায় গিয়া বসিলেন ও স্বামীর শব ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ভেলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়া চলিল—যেন সহস্র সহস্র লোকের অশ্রুপাতেই ভাসিয়া চলিল।

ভেলা ভাসিয়া চলিল। কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা, কিছুতেই বেহুলার ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বামীর শব বক্ষে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বালিকা চলিল। কোথায় যাইতেছে জানে না, তবুও তার দৃঢ় বিশ্বাস—স্বামীকে আবার ফিরিয়া পাইবে। ভেলা ক্রমে পচিতে আরম্ভ করিল; স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন এক বোয়াল মাছ লক্ষ্মীন্দরের এক অঙ্গ কাটিয়া লইয়া গেল। বেহুলার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ও গলিত হইল। এখন নিরুপায়, সেই পূতিগন্ধময় শব বক্ষে ধারণ করিয়া একমনে তিনি মনসাদেবীর স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা ভেলা নূতন হইল, স্বামীর শব অবিকৃত হইতে লাগিল, পরিধেয় বস্ত্রও নূতন হইল।

ভেলা ক্রমে নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নেতার একটী দুষ্ট ছেলে তাহাকে বড় জ্বালাতন করিত; ধোপানী এজন্য তাহাকে মারিয়া সমস্ত দিন ফেলিয়া রাখিত। অবশেষে কাপড় কাচা শেষ হইলে তাহার মৃতদেহের উপর কয়েক ফোঁটা জল ছড়াইয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইত। বেহুলা কয়েক দিন ধরিয়া ইহা লক্ষ্য করিলেন। একদিন গিয়া সহসা তাহার পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। নেতা বেহুলার মুখে সব কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিল। নেতা স্বর্গের ধোপানী। দেবতাদের নিকটে বলিয়া একদিন নেতা বেহুলাকে স্বর্গে লইয়া গেল। স্বামীর শবদেহ কোলে লইয়া বেহুলা স্বর্গে উপস্থিত হইলেন।

দেবতারা সকলে বেহুলাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য সবই করিতে পারেন। স্বামীর প্রাণলাভের আশায় বেহুলা সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। মনসাদেবীর বরে লক্ষ্মীন্দর প্রাণ পাইলেন। বেহুলার প্রার্থনায় লক্ষ্মীন্দরের মৃত ছয় ভ্রাতাও বাঁচিয়া উঠিল। বেহুলা স্বামী ও ভাশুরদিগকে লইয়া মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে সতীত্ব-প্রভাবে মৃত পতিকে বাঁচাইয়া সতী গৃহে ফিরিলেন।

বেহুলা ছদ্মবেশে প্রথমে তাঁহার পিতৃগৃহে আসিলেন, পরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। মৃত পুত্রসকল জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বনবাসী চাঁদ গৃহে ফিরিলেন এবং মনসার পূজা না করিলে কেহ গৃহে আসিবেন না শুনিয়া মনসার পূজা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলেন। সকলেই বাড়ীতে আসিলেন। মহাসমারোহে মনসাদেবীর পূজা হইল, মনসাদেবী আবির্ভূতা হইয়া চাঁদকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মনসার বরে চাঁদের জলমগ্ন ধনরত্নের উদ্ধার হইল। কিন্তু এই আনন্দের মাঝখানে শীঘ্রই এক বিষাদের ছায়া পড়িল। সহসা বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর দেহত্যাগ করিয়া, দিব্য-রথে স্বর্গারোহণ করিলেন।

ভারতের নারী

(৩)

ভারতের নারী-পরিচয়

"...মায়ের কোলে ছেলে, সে ত
ছেলে নয়, সে যে দেশ..."

—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতের নারী-পরিচয়

[আর্য্য-সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র এবং ধর্ম্মে ভারতের বহু নারী এমন এক উজ্জ্বল আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার প্রভাবে ভারতের সর্ব্বস্থল পুণ্য ও পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্র-গাথা যুগে যুগে গীত হইয়া ভারতবর্ষকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। এই শ্রেণীর পুণ্যশ্লোকা কয়েকজন নারীর পরিচয় আমরা সংক্ষেপে দিলাম ; উদ্দেশ্য ইঁহাদের কথা ও কাহিনী পাঠ করিয়া বর্ত্তমান যুগের রমণীকুলও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নারীত্বের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

অদিতি—দক্ষরাজ-কন্যা এবং মহর্ষি কশ্যপের পত্নী। ইঁহার সতীত্ব-মহিমায় পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা ইঁহার দ্বাদশ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পারিজাত পুষ্প লইয়া ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, অদিতি তথায় মধ্যস্থ হইয়া সেই বিবাদ ভঞ্জন করেন।

অনসূয়া—(১০৯ পৃষ্ঠা দেখ)।

অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা — ইঁহারা তিনজনেই কাশীরাজের কন্যা। সে কালের ক্ষত্রনীতি অনুসারে শান্তনুতনয় ভীষ্মদেব স্বয়ংবর-সভা হইতে এই তিন রাজকন্যাকেই বীর্য্যশুল্কে জয় করিয়া আনেন। অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন জানিয়া ভীষ্মদেব তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে শাল্বরাজ অম্বাকে গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে পরে তিনি পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরশুরামের অনেক অনুরোধসত্ত্বেও ভীষ্মদেব স্বীয় সত্যব্রত ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় অম্বাকে যখন গ্রহণ করিলেন না, তখন প্রতিহিংসাবশতঃ সেই ক্ষত্রকুমারী মহাদেবের তপস্যা করেন। দেবাদিদেব আশুতোষ তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই বর দেন যে, পরজন্মে অম্বা দ্রুপদগৃহে শিখণ্ডী নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মবধের কারণ হইবেন। পরে অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করেন।

অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত ভীষ্মদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হয়। বিচিত্রবীর্য্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে রাজবংশ লোপ

পাইবার আশঙ্কায় শান্তনুপত্নী, রাজমাতা সত্যবতীর আদেশে ব্যাসদেবের ঔরসে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়; পরে দুই ভগিনী বনে গমন করিয়া তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন।

অরুন্ধতী—(১১০ পৃঃ দেখ)।

অহল্যা—প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা নারীপঞ্চকের অন্যতমা, ঋষি গৌতমের পত্নী এই অহল্যা দেবী। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শতানন্দ রাজর্ষি জনকের পুরোহিত ছিলেন। একদা ঋষি গৌতম স্নানার্থে গমন করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র সেই অবসরে গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অহল্যার ভ্রম উৎপাদন করিয়া তাঁহার সতীত্ব হরণ করেন। গৌতম ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত ব্যাপার জানিয়া, পত্নীকে অভিশাপ দিয়া তাঁহাকে পাষাণময়ী প্রতিমায় পরিণত করেন। অহল্যা নিষ্পাপা ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্বামী বুঝিতে না পারিয়া সাধ্বীকে অভিশাপ দেন। বহুকাল পরে শ্রীরামচন্দ্র সেই পাষাণস্তূপ স্বীয় পাদস্পর্শদ্বারা প্রাণময়ী করিয়া তুলেন। পাপমোচনের পর অহল্যা জগতে প্রাতঃস্মরণীয়া বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিতা হন।

অহল্যাবাঈ—১৭৩৫ খৃঃ অব্দে মালবদেশে কৃষিজীবী আনন্দ-রাও সিন্দের ঔরসে অহল্যাবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্যা রূপবতী এই বালিকা পিতার শিক্ষার গুণে অল্পবয়সেই শাস্ত্র এবং অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। ইন্দোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর-রাও হোলকারের পুত্র কুন্দ-রাওর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে এক শিশুপুত্র এবং এক শিশুকন্যা লইয়া অহল্যাবাঈ বিধবা হন। স্বামী লোকান্তরিত হইলে তাঁহার বিশাল রাজ্য তিনি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। রাণী অহল্যাবাঈ হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিমতী প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চ গুণদ্বারা মণ্ডিত ছিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রচারকল্পে তিনি ভারতের বহু তীর্থস্থানে লুপ্ত এবং ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। পুণ্যধাম বারাণসীতেই ইঁহার যথেষ্ট কীর্ত্তি আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উত্তরা—বিরাটরাজ-দুহিতা উত্তরা, অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর পত্নী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথী কর্ত্তৃক অভিমন্যু যখন অন্যায়ভাবে নিহত হইলেন, তখন ইঁহার গর্ভে রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন বলিয়া, ইনি স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে পারেন নাই। রাজা পরীক্ষিতের জন্ম হইলে তিনি তপশ্চর্য্যায় দেহত্যাগ করেন। উত্তরার বীরত্ব ও সতীত্ব অনুকরণীয়।

উভয়ভারতী—শাপভ্রষ্টা সরস্বতী। মণ্ডনমিশ্রের পত্নীরূপে মর্ত্ত্যধামে ইনি উভয়-ভারতী নামে পরিচিতা। শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডনমিশ্রের মধ্যে তর্কযুদ্ধে উভয়ভারতী বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। স্বামী পরাজিত হইলে, ইনি নিজে আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। পরে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

উমাসুন্দরী—শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে 'বুনো' রামনাথ নামে এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণীর নাম উমাসুন্দরী। পণ্ডিত-গৃহিণীর সারল্য ও অনাড়ম্বর জীবন তখনকার দিনে অনেক রমণীর আদর্শ ছিল; দৈন্যহেতু শাঁখার পরিবর্ত্তে হাতে একগাছি লালসূতা ও পরিধানে জীর্ণবসন। এই ভূষণেই অলঙ্কৃতা হইয়া তিনি যেরূপ উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণনগরের মহারাণী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সতীত্বপ্রভা ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ দারিদ্র্যদুঃখকে পরাভূত করিয়াছিল। এইরূপ আদর্শ জীবন বিরল।

উর্ম্মিলা—কবিগুরু বাল্মীকির চির-অনাদৃতা এবং মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের অন্যতমা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্যা লক্ষ্মণপত্নী উর্ম্মিলা। সমগ্র রামায়ণ-কাব্যে বিরহের করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ছবি এই নিঃশব্দচারিণী কোমলহৃদয়া রাজবধূ। শ্রীরামচন্দ্রের জন্য লক্ষ্মণের আত্মবিলোপসাধন যেরূপ প্রশংসনীয়, সীতাদেবীর জন্য উর্ম্মিলার আত্মবিলোপসাধনও ততোধিক প্রশংসা পাইবার যোগ্য। ভ্রাতার সহিত বনগমনে তিনি স্বামীকে উৎসাহ প্রদান করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে স্বামী বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিলে কিছুকাল পরে তাঁহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল।

কর্ম্মদেবী—চিতোরের সুপ্রসিদ্ধ রাণা সমরসিংহের অন্যতমা মহিষী। তিরৌরী সমরে ১১৯৪ খৃঃ অব্দে স্বামী সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগ করিলে, ইনি চিতোর ও মেবার রক্ষার জন্য পাঠান সেনাপতি কুতুবউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং অসীম ধৈর্য্য ও বীর্য্যসহকারে স্বামীর রাজ্য রক্ষা করেন। সতীত্বে, শৌর্য্যে, দানে কর্ম্মদেবীর নাম ভারতের নারীদিগের মধ্যে চিরস্মরণীয়।

কৈকেয়ী—কেকয় দেশের রাজকন্যা, রঘুবংশের মহারাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী। যদিও ইনি চিরদিনই অন্তরে শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ পুত্র ভরত অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, তথাপি দৈবনিবন্ধন ইনি শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কারণ হইয়া বিশিষ্টরূপে অনুতপ্তা হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞশেষে কৌশল্যার মৃত্যুর পর ইহার মৃত্যু হয়।

কৌশল্যা—ইনি দশরথের প্রধানা মহিষী, শ্রীরামচন্দ্রের জননী। রামের বনবাস ও তজ্জন্য স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবন অসহনীয় হইয়াছিল। কর্ত্তব্য-অনুরোধে জীবন ধারণ করিলেও কৌশল্যা চিরদুঃখিনী ও ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া জীবনযাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে বসিলে. কৌশল্যা কিছু শান্তি লাভ করেন।

কুন্তী—প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোক নারীপঞ্চকের অন্যতমা এই কুন্তী দেবী। ইনি যদু-বংশীয় শূরসেনের কন্যা, বসুদেবের ভগিনী ও পঞ্চপাণ্ডবের জননী; ইহার প্রকৃত নাম পৃথা। ইনি কুন্তীভোজ রাজার আলয়ে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কুন্তী হইয়াছিল। কুমারী অবস্থায় মহর্ষি দুর্ব্বাসা-প্রাপ্ত মন্ত্রের পরীক্ষার্থ সূর্য্যদেবের কাছে পুত্র কামনা করিয়া ইনি কর্ণ নামে মহাবীর পুত্র লাভ করেন এবং লোকলজ্জার ভয়ে সেই পুত্রকে জলে ভাসাইয়া দেন। পরে পাণ্ডুরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু শাপবশতঃ স্বামীর অসামর্থ্যের জন্য তিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও পবন দেবতার বরে মহাপরাক্রমশালী যে তিনটী পুত্র লাভ করেন, মহাভারতে তাঁহারাই প্রধান পাণ্ডব নামে খ্যাত।

শিশুপুত্রদিগকে লইয়া বিধবা হইয়া ইনি অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে মানুষ করেন ও তাঁহাদের বনবাসকালে নিজেও পুত্রদিগের সঙ্গে বনবাসে যান। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ইনি ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য কুরুরমণীদিগের সহিত বনে গমন করিয়া তপশ্চর্য্যায় দেহত্যাগ করেন।

গার্গী—ত্রেতাযুগে চিরকুমারী ব্রহ্মবাদিনী যে নারী রাজর্ষি জনকের রাজসভায় নিঃশঙ্কচিত্তে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি আর কেহই নহেন, ভারতের নারীপ্রতিভার উজ্জ্বল আদর্শ গার্গী। ইহার তেজস্বিতা ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল।

গান্ধারী—(১৪৬ পৃঃ দেখ)।

গোপা—ভগবান্ বুদ্ধদেবের পত্নী গোপাদেবী কলিঙ্গদেশের নরপতি দণ্ডপাণির কন্যা। গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। পুত্র রাহুলের জন্মের সপ্তদিবস পরে পতি ধর্ম্মার্থে গৃহত্যাগ করিলে পরে গোপা সাত বৎসর ধরিয়া স্বামীর চিন্তায় কালাতিপাত করেন। সাত বৎসর পরে ভিক্ষুবেশে স্বামী গৃহে ফিরিলে, গোপা ভিক্ষুণী হইয়া স্বামীর ধর্ম্মজীবনকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলেন।

চন্দ্রমণি দেবী—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সৌভাগ্যবতী জননী। কামারপুকুর গ্রামে ইনি লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন; আদর্শ ব্রাহ্মণ স্বামী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অর্চ্চনায় ও অতিথি অভ্যাগতের সেবায় চন্দ্রমণি অক্লান্তকর্ম্মিণী আদর্শ রমণী ছিলেন। অকাতরশ্রমশালিনী এই মহিলা সংসারাশ্রমের পরমধর্ম্ম পালনে কখনও অণুমাত্র ত্রুটি বা তাচ্ছিল্য করিতেন না। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে চন্দ্রমণির গর্ভে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। পতিব্রতার ও সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, পতিপ্রাণা চন্দ্রমণি দেবীর সন্তান-বাৎসল্য অনন্যসাধারণ ছিল।

চিন্তা—(১৫১ পৃঃ দেখ)।

ভারতের নারী

জনা—মাহীষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের বীর্য্যবতী মহিষী, বীর প্রবীরের জননী—রমণীকুলমণি এই জনা। স্বাহা নাম্নী ইঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিলেন। মায়ের আদেশে প্রবীর পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ধরেন এবং তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হন। একমাত্র পুত্রের নিধন-সংবাদে জনা কাতর না হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণা হন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন।

তারা—নিত্য-প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চনারীর অন্যতমা কপিরাজ বালি-পত্নী তারা। শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় মিত্র সুগ্রীবকে হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তদীয় অগ্রজ বালীকে বধ করিলে, এই সতী-নারী শ্রীরামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন। তারা অনার্য্যরমণী হইলেও চিরদিন সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

তারাবাঈ—রাজপুতনার অন্যতম বীরাঙ্গনা এই তারাবাঈ। শৈশব হইতে পিতার যত্নে ইনি শস্ত্রবিদ্যা ও অশ্বারোহণে পারদর্শিনী হন। তৎকালীন বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তারাবাঈ স্বামীর সহিত একত্র অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধস্থলে গমন করিতেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই বীরাঙ্গনার কীর্ত্তিগাথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

দময়ন্তী—(১২২ পৃঃ দেখ)।

দেবকী—শ্রীকৃষ্ণের মাতা। ইনি উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের তনয়া ছিলেন; ইঁহার সহিত বসুদেবের পরিণয় হয়। মহারাজ কংসের আদরিণী ভগিনী হইলেও ইনি স্বীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক পতির সহিত কারারুদ্ধা হইয়াছিলেন। কংস কর্ত্তৃক ইঁহার সাতটি পুত্র বিনষ্ট হয়। ইঁহারই অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। বহুকাল পরে যদুবংশ ধ্বংসের পরে বসুদেব যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাঁহার সহগামিনী হইয়াছিলেন।

দ্রৌপদী—(১৩১ পৃঃ দেখ)।

পদ্মাবতী—বঙ্গসাহিত্যের কলকণ্ঠ-কোকিল বৈষ্ণব কবি জয়দেবের সাধ্বী পত্নী পদ্মাবতী। দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জয়দেব, কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে ও ভজনে অতিবাহিত করিতেন। পদ্মাবতীও ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলবিন্দু স্পর্শ না করিয়া স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করিতেন। পদ্মাবতীর ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া জয়দেবের আরাধ্য-দেবতা প্রথমে পদ্মাবতীকে দর্শন দেন। সতীর মাহাত্ম্যেই জয়দেব অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহ লাভ করেন।

পদ্মিনী—চিতোরের রাণা ভীমসিংহের পত্নী, অলোকসামান্যা সুন্দরী বীরাঙ্গনা পদ্মিনী। ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া আলাউদ্দীন তাঁহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া চিতোর আক্রমণ করেন। রাণা পাঠানের হস্তে বন্দী হইলে পদ্মিনী বহু রাজপুত বীরের সাহায্যে আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিয়া রাণাকে উদ্ধার করেন। চরিত্রহীন দুর্দ্দান্ত পাঠানের লোলুপদৃষ্টিতে চিতোর পুনরায় আক্রান্ত হইয়া অসহায় হইয়া পড়ে। সেই সময়ে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পদ্মিনী তাঁহার সহচরীদের লইয়া 'জহর'-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এ ব্রত—জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন্ত প্রবেশ করা। সতীত্বরক্ষার জন্য জীবন ত্যাগ করা রাজপুত রমণীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ছিল।

পার্ব্বতী—(১০২ পৃঃ দেখ)।

প্রমীলা—লঙ্কার অধিপতি ত্রিভুবনবিজয়ী দশাননের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ—প্রমীলা। ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের ইনি উপযুক্তা বীরপত্নী ছিলেন। অসামান্যা সুন্দরী এই রাক্ষসকুলবধূর সতীত্বে ও তেজস্বিতায় স্বয়ং ভগবতী পরিতুষ্টা ছিলেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ-হস্তে স্বামী নিহত হইলে প্রমীলা সহমরণে দেহত্যাগ করেন।

প্রসূতি—সতীর মাতা। ইনি শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সহিত দক্ষ প্রজাপতির পরিণয় হয়। তাঁহার ঔরসে সতী প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক কন্যার জন্ম হয়। দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দায় যজ্ঞধ্বংস ও দক্ষের বিনাশ

হইলে, প্রসূতি স্বীয় সতীত্বমহিমায় মহাদেবের প্রসাদে মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন।

বিশ্ববারা—
ঘোষা—
সূর্য্যা—
যমি—
রোমশা—

ইহারা সকলেই বৈদিকযুগের ব্রহ্মবাদিনী নারী। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ অটুট রাখেন এবং পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেন; ইহাদের সকলেই ঋগ্বেদের কয়েকটী সূক্ত সঙ্কলন করেন। স্বর্গের দেবতা-মণ্ডলী পর্য্যন্ত ইহাদের তপস্যা ও সতীত্বপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া বর প্রদান করিতে বাধ্য হন।

বিষ্ণুপ্রিয়া—নাম ও প্রেমের দেবতা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। চৈতন্যদেব চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। চৈতন্যদেব গৃহত্যাগ করিলে পরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে তীব্র বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক পতির আদর্শকে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় স্বীয় জীবনে সার্থক করিয়া তুলেন, তাহা অতুলনীয় বলিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য ভারতের সাধ্বীগণের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া অন্যতমা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

বেহুলা—(১৫৫ পৃঃ দেখ)।

ভগবতী দেবী—বীরসিংহের সিংহশিশু প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুণ্যশ্লোকা জননী ভগবতী দেবী। কেমন করিয়া স্বীয় পুত্রকে সধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া গড়িতে হয়, তাহা এই হিন্দুনারীর ভাল করিয়াই জানা ছিল। তাই শৈশবে এবং যৌবনকালে বিদ্যাসাগর মাতার নিকট হইতে যতভাবে যত শিক্ষালাভ করেন, পরবর্ত্তী জীবনে তাহাই তাঁহাকে সকল কর্ম্মে ও সকল প্রচেষ্টায় সার্থকতা আনিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনের পশ্চাতে যে সাধনা ছিল, তাহার অনেকখানি প্রেরণাই তিনি নিজের মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার চরিত্রে মাতৃভাব অনবদ্য-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মন্দোদরী—লঙ্কেশ্বর রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী। ইনিই বিশ্বত্রাস মেঘনাদের বীরজননী। শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে স্বীয় পতি নিহত হইলে পরে তাঁহার অনুরোধে ইনি বিভীষণের মহিষীরূপে তৎপার্শ্বে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। মন্দোদরীর সতীত্বগুণে স্বর্গের দেবতামণ্ডলীও বিমুগ্ধ ছিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী—শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত পল্লীর বুকে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ১৮২৭ খৃঃ অব্দে যে মহীয়সী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়া চরিত্রের ঔদার্য্য ও দানশীলতায় অক্ষয় যশোরাশি অর্জ্জন করেন, তিনিই চিরস্মরণীয়া স্বর্ণময়ী। স্বর্ণময়ী প্রকৃতই যেন সোনার প্রতিমা—এমনই অনিন্দ্য তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য্য। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও স্বর্ণময়ী সর্ব্বসুলক্ষণা ছিলেন বলিয়া কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী 'কান্তবাবু' তাঁহার প্রপৌত্র কৃষ্ণনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ দিয়া রাজলক্ষ্মীরূপে ইঁহাকে বরণ করিয়া আনেন। স্বামীর তত্ত্বাবধানে ইনি জমিদারী-সংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার পরলোকগমনের পরে স্বামীর সুবিস্তৃত জমিদারী বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন এবং জনহিতকর বহু কার্য্যে অজস্র অর্থ অকাতরে দান করিয়া সরকারের নিকট হইতে ১৮৭১ খৃঃ অব্দে 'মহারাণী' উপাধি লাভ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। হিন্দুবিধবার আচার ও নিয়ম-নিষ্ঠা সযত্নে পালনপূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই পুণ্যশ্লোকা বঙ্গললনা ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরী—চিরকরুণ বৈধব্যব্রতের চিরশুচিতাময়ী মূর্ত্তি মহারাণী শরৎ-সুন্দরী। ১২৫৩ সালের ২৩শে আশ্বিন, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত পুঁটিয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতা ভৈরবনাথ সান্যাল উপযুক্ত শিক্ষাদানে সৌন্দর্য্যের ললামভূতা কন্যাকে যথোপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১২৬২ সালে পুঁটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্দ্রনাথের সহিত শরৎসুন্দরীর বিবাহ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ হইতে শরৎ-সুন্দরী যেভাবে তাঁহার স্বামীকে স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনেন, তাহাতে তাঁহার

মধ্যে ভারতীয় নারীর আদর্শ যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃতরূপে প্রমাণিত হয়। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী বিধবা হন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত যেরূপ পবিত্রভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত তিনি বৈধব্যের কঠোর নিয়ম পালন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও পরহিত-সাধনে যেরূপ অনন্যমনা ছিলেন, তাহাতে তিনি সর্ব্বযুগের আদর্শ-স্থানীয়া নারী হইয়া থাকিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু বিধবার সেবায়, দেব-মন্দির-প্রতিষ্ঠায় এবং পূজাপার্ব্বণে অর্থব্যয়ে তিনি এমনই অকুণ্ঠা ছিলেন যে, তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া সরকার তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করেন। ১২৯০ সালে ২৫শে ফাল্গুন, এই মহীয়সী বঙ্গললনার মৃত্যু হয়।

মাতাজী তপস্বিনী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৮০৫ খৃঃ) দক্ষিণ-ভারতে ভেলোর নামে এক ক্ষুদ্র করদ রাজ্য ছিল। ভেলোর রাজার কন্যার সহিত এক রাজপুত্রের বিবাহ হয়। এই ভেলোর-রাজদুহিতার গর্ভে মাতাজী তপস্বিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল সুনন্দা দেবী। চির-কুমারী থাকিবার সঙ্কল্প করিয়া সুনন্দা পঞ্চাগ্নি-ব্রত গ্রহণ করেন। এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের পরেও তিনি মাদ্রাজের তাম্রলিপ্তা নদীর তীরে বহুকাল তপস্যা করিয়া নানাগুণে ও আত্মসম্পদে ভূষিত হইয়া মাতাজী নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাজী ভারতবর্ষের বহুস্থানে হিন্দু আদর্শে বালিকাদের জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতার 'মহাকালী পাঠশালা' এই পুণ্যবতী দেবীরই অক্ষয়কীর্ত্তি।

মীরাবাঈ—রাজপুত নারী মীরাবাঈ ভগবদ্ভক্তির আদর্শ। অতি শিশুকাল হইতেই ইনি ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিতা ছিলেন এবং হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরের সুললিত সঙ্গীতের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত করিতেন। চিতোরের মহারাণা কুম্ভের পরিণীতা পত্নী হইলেও রাজপ্রাসাদের বিলাস ও ঐশ্বর্য্য ভক্তিমতী মীরাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। রাজান্তঃপুরের ভোগসুখ বর্জ্জন করিয়া নিভৃতে তিনি রণছোড়জীর (শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের) আরাধনা করিতেন ও সুমিষ্ট সঙ্গীতদ্বারা ইষ্টদেবকে তুষ্ট করিতেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী মীরা

আজীবন এইভাবে কাটাইয়াছিলেন। আজও ভারতের সকল প্রদেশে মীরার গান গীত হইয়া প্রতি মানবহৃদয়ে ভক্তির অমিয় নির্ঝরধারা বর্ষণ করে।

মৈত্রেয়ী—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয়া পত্নী—মৈত্রেয়ী; প্রথমা কাত্যায়নী। মহর্ষি সন্ন্যাসগ্রহণকালে উভয় পত্নীর নিকট যখন অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই সময়ে মৈত্রেয়ী ইহলোকের সর্ব্বসুখ বর্জ্জন করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হন এবং তাঁহার অধ্যাত্মজীবনকে নিজের ত্যাগ ও সেবায় উজ্জ্বল ও সার্থক করিয়া তুলেন।

যশোদা—ব্রজরাজ নন্দ ঘোষের পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদাই যশোমতী নামে পরিকীর্ত্তিতা। সতীসাধ্বী যশোমতা স্ত্রীসুলভ বহু সদ্‌গুণে বিভূষিতা ছিলেন। বাৎসল্য-রসের এমন করুণাময়ী মূর্ত্তি জগতে আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহার মাতৃস্নেহে পরিতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখগহ্বরে মাতাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া কৃতার্থ করেন।

রাণী দুর্গাবতী—মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আকবর শাহের সময়ে যে কয়জন রাজপুত মহিলা বীরত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তন্মধ্যে রোটা ও মোহবার অধিপতি শালিবাহনকন্যা রাণী দুর্গাবতী সর্ব্বপ্রধানা। গড়মণ্ডলের বীররাজা দলপতি সিংহের সহিত ইঁহার বিবাহ হইলেও, অল্পবয়সে বিধবা হইয়া ইনি যেরূপ দক্ষতা-সহকারে স্বামীর সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। মোগল সেনাপতি আসফ খাঁ-ই রাণীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাট্ আকবরকে সংবাদ দেন যেন সম্রাট্ স্বয়ং আসিয়া দুর্গাবতীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অশ্বপৃষ্ঠে আলুলায়িতকুন্তলা ভারত-নারীর সে রণচণ্ডীমূর্ত্তি দেখিয়া দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই শত্রুর বাণে রাণী দেহত্যাগ করেন।

রাণী ভবানী—মোগলশাসনের আমলে বাঙ্গালার রাষ্ট্রজীবনের ঘোর দুর্য্যোগের দিনে ১৭২৪ খৃঃ অব্দে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আত্মারাম চৌধুরী ছিলেন উক্ত

গ্রামের প্রতাপশালী জমিদার। পিতৃগৃহে সামান্য লেখাপড়া শিখিবার পরে নাটোরের মহারাজা রামজীবনের একমাত্র পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইনি বিধবা হন। স্বামি-গৃহে আসিয়া বালিকাবধূ শ্বশুরের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সঙ্গে কূটরাজনীতিবিদ্যাও আয়ত্ত করেন এবং পরবর্ত্তী কালে সুবিস্তৃত জমিদারী-পরিচালনায় ইনি যেরূপ দূরদর্শিতার ও সূক্ষ্মবুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হন। কিন্তু রাণী ভবানীর চরিত্রের ইহাই একমাত্র পরিচয় নহে। দানশীলতা ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনই তাঁহার চরিত্রের একমাত্র গৌরব। দেশে-দেশে জলাশয়-খনন, তীর্থে-তীর্থে মন্দির-নির্ম্মাণ, অতিথিশালা-নির্ম্মাণ এই সকল মহৎ কর্ম্মে রাণী ভবানী অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১১৭৬ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে ইনি স্বীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু নাটোরের কেন, সমগ্র বাঙ্গালার তিনি ছিলেন রাজলক্ষ্মী; এই সমস্ত প্রজার ছিলেন তিনি করুণারূপিণী জননী। অল্পবয়সে বিধবা হইলেও তিনি ত্যাগে, দানে ও সেবায় সতীত্বের অক্ষয় আদর্শ রাখিয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রাণী রাসমণি—দক্ষিণেশ্বরে যে পুণ্যসাধনপীঠে কঠোর সাধনা করিয়া ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 'মায়ের' কৃপালাভ করেন, সেই সিদ্ধপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী এই রাণী রাসমণি। অখ্যাত দরিদ্রবংশে এই রূপবতী রমণী জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বজন্মের অশেষ সুকৃতিবলে এই জন্মে ইনি কমলার অযাচিত অজস্র কৃপা লাভ করেন। নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মে অর্থব্যয়ে ইনি মুক্তহস্তা ছিলেন, এবং নারায়ণজ্ঞানে আজীবন দীনদরিদ্রের সেবায় অকুণ্ঠা ছিলেন। ইহজীবনে তাই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদরূপে ইহার বংশধরগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের যথেষ্ট কৃপা লাভ করেন। রাণী রাসমণি একদিকে যেমন কোমলচিত্ত ও দানশীলা রমণী ছিলেন, অন্য দিকে তেমনই নির্ভীকা ছিলেন; তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতা উভয়েরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

লক্ষ্মীবাঈ—ভারতীয় নারীদের মধ্যে সাহসিকতা ও নির্ভীকতা এবং শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধর রাও-এর পত্নী। অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়া ইনি আনন্দরাম নামে একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন ডালহৌসির শাসনকাল এবং তাঁহারই সহিত রাজ্য-সম্পর্কে রাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা ঝাঁসী অধিকার করেন, সেই সময়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ তেজঃপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন—'মেরী ঝাঁসী নেহি দিউঙ্গী' এবং আলুলায়িতকেশে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেই সিংহবীর্য্যা এই রমণী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইতিহাসে ইঁহার নাম চিরদিন কীর্ত্তিত হইবে।

লীলাবতী—ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী। বিবাহের অল্পকাল পরেই লীলাবতী বিধবা হন। বৃদ্ধ পণ্ডিত স্বীয় বিধবা কন্যাকে এমন সযত্নে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া একান্ত পারদর্শিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী কালে বীজগণিতশাস্ত্রে পর্য্যন্ত লীলাবতী অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ প্রভৃতি জটিল শাস্ত্রে ভারতের নারী-প্রতিভা কতদূর উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হইতে পারে, লীলাবতী তাহার একমাত্র নিদর্শন।

শকুন্তলা—(১২৭ পৃঃ দেখ)।

শচীদেবী—শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জননী এই শচীদেবী। বালক নিমাইকে ইনি এমন-ভাবে লালনপালন করিতেন ও শিক্ষা দিতেন যে, তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত মুগ্ধ থাকিতেন। স্বামী জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পরে অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও সদাসর্ব্বদা অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, নারায়ণ পূজা প্রভৃতি শচীদেবীর বাদ যাইত না।

শাণ্ডিল্যা তপস্বিনী—বৈদিকযুগে পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানবিভূষিতা যে কয়টি ভারতের নারীর সাক্ষাৎ পাই তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যা অন্যতম। রাজর্ষি জনকের সভায় তিনি সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হইয়া ব্রহ্মবিদ্যাসম্পর্কে আলোচনা করিতেন। ইঁহার

তপস্যার প্রভাব এমনিই ছিল যে, একদা গরুড়-পক্ষী তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করেন। শাণ্ডিল্যা তপোবলে গরুড়ের মনোভাব জানিতে পারেন। অমনি গরুড়ের পক্ষ দুইটী খসিয়া পড়ে। তৎকালীন নারী-সমাজে শাণ্ডিল্যা সমধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

শৈব্যা—(১১৯ পৃঃ দেখ)।

সতী—(৯৯ পৃঃ দেখ)।

সত্যবতী—ব্যাসদেবের মাতা। ইনি বসুরাজের ঔরসে এবং মৎস্যরূপা অদ্রিকা অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মৎস্যজীবীদিগের দ্বারা প্রতিপালিতা বলিয়া ইনি মৎস্যগন্ধা ও দাসরাজকন্যা নামে বিখ্যাত। মহারাজ শান্তনুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কুমারী অবস্থায় পরাশরের ঔরসে ইঁহার গর্ভে ব্যাসদেব নামক পুত্রর এবং বিবাহের পরে শান্তনুর ঔরসে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হয়। পরিণত জীবনে সত্যবতী বনগমনপূর্ব্বক তপশ্চরণে দেহত্যাগ করেন।

সরমা—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিভীষণ-পত্নী সরমা স্বামীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। একমাত্র পুত্র তরণীসেন শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে পরে সতী সরমা বিন্দুমাত্র শোকপ্রকাশ করেন নাই। সতীত্বে ও বীর্য্যে সরমা রমণীকুলের আদর্শ।

সাবিত্রী—(১০৫ পৃঃ দেখ)।

সারদামণি—যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিষ্ঠাবতী পত্নী সারদা দেবী। ত্যাগ ও সেবায়, ধর্ম্ম ও পতিনিষ্ঠায় এই পুণ্যশ্লোকার জীবন হোমশিখার মতনই চির-উজ্জ্বল, চিরস্নিগ্ধ এবং চিরশান্ত। সেবাধর্ম্মপরায়ণা এমন মহিমময়ী অথচ করুণাময়ী নারীমূর্ত্তি খুব অল্পই দেখা গিয়াছে। স্বামীর তপস্যাকে সকল দিক্ দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য ইনি নিজের সমস্ত ঐহিক সুখভোগ চিরজীবনের মত ত্যাগ করেন। জাগ্রত দেবতাজ্ঞানে ইনি স্বামীর পূজা করিতেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পরেও তাঁহারই স্মৃতির অনুধাবনে ইনি জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন।

সীতা—(১১৪ পৃঃ দেখ)।

সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী সুভদ্রা দেবী। বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। সুভদ্রা শুধু বীরভগিনী নহেন, পরন্তু বীরপত্নী ও বীরমাতা। রোহিণীনন্দন বলরামকে পরাস্ত করিয়া অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করেন ও পরে ইঁহার গর্ভে বীর অভিমন্যুর জন্ম হয়। বীর্য্যে ও আত্মসংযমাদি-গুণে ইনি এমনই বিভূষিতা ছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে স্বীয় পুত্রের নিধন-সংবাদ শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

সুমিত্রা—মহারাজা দশরথের সর্ব্বকনিষ্ঠা পত্নী সুমিত্রা। ইনি মহাবীর লক্ষ্মণের জননী। জীবনাবধি স্বামিগতপ্রাণা সুমিত্রা পরম নিষ্ঠাসহকারে স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে ইনি স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণকে তাঁহার সঙ্গে অনুগমন করিতে আদেশ করেন এবং পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলেন—"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে তুমি পিতা দশরথের তুল্য জ্ঞান করিবে ও ভ্রাতৃজায়া সীতাকে আমার মতন মা বলিয়া ভক্তি করিবে।" মহারাজা দশরথের মৃত্যুর পর সুমিত্রা জীবনের অবশিষ্টকাল তপশ্চর্য্যায় অতিবাহিত করেন।

সুলভা—পৌরাণিক যুগের চির-ব্রহ্মচারিণী রমণী সুলভার পাণ্ডিত্য তৎকালে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষা পাইলে নারীও যে ব্রহ্মবিদ্যায় পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহা সুলভা কর্ত্তৃক রাজর্ষি জনকের শিক্ষা প্রদান হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিচারে সুলভা রাজর্ষি জনকের সভায় সুপণ্ডিত-গণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সুলভার মত নারী আজ এই দেশে বিরল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই ভারতনারী আজ তেমন পূজা ও শ্রদ্ধা পাইতেছেন না।

সংযুক্তা—জয়চন্দ্রসুতা সংযুক্তা দেবী মাত্র বীর্য্যশালিনী ছিলেন না—তাঁহার পতিপ্রেম ও পতিনিষ্ঠা ভারতনারীর আদর্শের বিষয়। সতীত্বের গৌরব অম্লান রাখিতে সংযুক্তা স্নেহময় পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংবর-সভায় চৌহানপতি পৃথ্বীরাজের মৃন্ময়মূর্ত্তির গলে বরমাল্য অর্পণ করেন ও পতির সহিত অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া যান। থানেশ্বরের যুদ্ধে পতি নিহত হইলে সতী সংযুক্তা স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করেন।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরাঙ্গত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতের নারী

(৪)

পরিশিষ্ট

(নারী-প্রগতি সম্বন্ধে বিজ্ঞ-মত)

"... মেয়েদের বাহিরের কাজে থাকিলে চলিবে না। আমাদের দেশের প্রত্যেক মেয়েকে গৃহিণী ও জননী হইতে হইবে।"

—হের হিটলার

১। বিবাহ ও পাতিব্রত্য

ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসেরই বশ, অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি-শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

* * * * *

বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।

* * * * *

স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন।

* * * * *

আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থলেই আমাদের প্রবৃত্তিসকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল।

* * * * *

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য-সুখ নহে; একাভিসন্ধি, সহৃদয়তা, ইহাই দাম্পত্য-সুখ।

* * * * *

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য।

* * * * *

হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

* * * * *

রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী;—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।

* * * * *

গৃহিণী ব্যজন-হস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্ম-পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে?

গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে, কিন্তু স্বামিসেবা আর কাহার সাধ্য করিতে আসে ? যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্ম্ম লোপ করিতেছে, হে আকাশ, তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই ?

* * * * *

যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপণা জানে, সে সংসারে কাহারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?

* * * * *

২। শ্রীঅরবিন্দের পত্র*

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

......................সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্রকামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই, ধীরচিত্তে সব দুঃখ-সুখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

এখন সেই কথাটী বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়, সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ

---

* স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা, ভারত-জাতীয়তার ঋষি, স্বদেশ-প্রেমের কবি, ভারত-স্বাধীনতার পুণ্যপ্রাণ নবযুগের শ্রেষ্ঠ সাধক, জগদ্গুরু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, ইং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে এই পত্র ও অন্যান্য পত্র গোপনে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষকে লেখেন। দৈবযোগে সেই গোপনীয় পত্রগুলি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে আলীপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ আদালতে উপস্থিত করে। একখানি পত্রের সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। শ্রীঅরবিন্দ ব্রাহ্ম-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিশুকাল হইতে বিলাতে শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থা হারান নাই। অধিকন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আজ তিনি শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের সভ্যতা-সাধনার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় চিন্তাশীল মনীষী জগতে খুব কমই জন্মিয়াছেন এবং বর্ত্তমান জগতে নাই বলিলেও চলে। তাই হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ-নির্ণয় পত্রখানি তাঁহার প্রথম যৌবনে লিখিত মতামত হইলেও আমাদের সকলেরই উহা পবিত্র রামায়ণ, গীতা ও মহাভারতের ন্যায় পাঠ করা উচিত। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিশেষ দুঃখের সংবাদ যে, দেবী মৃণালিনী স্বামিসেবায় বঞ্চিত হইয়া পরজীবনে স্বামীর সেবা করিবার জন্য স্বামি-প্রদর্শিত পথ ধরিয়া সাধন-ভজন করিতে করিতে ১৩২৫ সালের ২রা পৌষ ইহধাম ত্যাগ করেন।

মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামি বলে ; পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ-দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক বা মহাপুরুষই হোক, অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ পরমো গুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তিনি যে কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ বোধ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে, না নূতন সভ্যধর্ম্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ, সে তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচজনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামির পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুর্দ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্ম-স্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটী পাগলামি আছে। প্রথম পাগলামি এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান্ যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকী রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট হইতে ধন লইয়া ভগবান্‌কে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি, জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের পরিবারের উদর পুরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম।......এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া সত্যি সত্যি যাহা দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবান্‌কে দিব, এই আমার ইচ্ছা। তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলেছিলে 'আমার কোন উন্নতি হল না' এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামি সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে। পাগলামিটা এই যে, কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক, তাহা আমি চাহি না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সেই পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে নিজের শরীরে, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই। সে পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে; কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না। যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামি এই যে, লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে—ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান্ এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদ্‌লোক তোমার সরল, ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আরও শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবে। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি; তুমি উষার শিষ্যা হইয়া সাহেব-পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না, সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন; যে ভগবানের নিকট

আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশজনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধিই হইবে। আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি; মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিনই কি এইভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব, নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে তাহাই শোন; ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হ'বে, একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য ধরিয়া অবিচলিতচিত্তে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে—তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে; লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীরভাবে শুনিতে পারে না, ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়; ব্রাহ্ম-স্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হয়েছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত; দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ়মনে তাড়াইতে হয়; তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে; পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব; ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছুই নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মনে ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে।

তোমার—

৩। নারী জীবনের প্রকৃত আদর্শ
"জননী ও জায়া"

"নারী-প্রগতি সম্বন্ধে এযুগে অনেকে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, নারীর চিরন্তন আদর্শ হইল জননী ও জায়া। সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা এবং গৃহস্থালীকে জ্ঞান ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে গঠন করিয়া তোলা নারীর কর্ত্তব্য। **বাঁধাধরা নিয়মানুসারে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা নিতান্তই প্রাণহীন; এই শিক্ষা মানুষকে একমাত্র জীবিকা-অর্জ্জনেরই উপযুক্ত করিয়া তোলে।** নারীরা সৌন্দর্য্য ও ললিতকলার চিরন্তন অধিকারিণী, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতে পারেন এমন শিক্ষাই তাঁহাদিগকে দেওয়া উচিত। সৌন্দর্য্যই জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এবং একমাত্র নারীই মানুষের ভিতর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার জীবনযাত্রাকে সুখময় করিতে পারে।

"মানুষের জীবনযাত্রার আদর্শকে নারীই তাহার অন্তরের মাধুর্য্য দ্বারা উন্নত করিতে পারে। পারিবারিক জীবনের সমষ্টি হইল সামাজিক জীবন, সুতরাং এই পরিবারিক জীবনের মধ্যে নিখিল মানব-জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করা নারীর অন্যতম কর্ত্তব্য। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাহার ফলে নারীশক্তি সমগ্র মানব-পরিবারকে আপনার জন মনে করিবে এবং যাহাতে জীবনের প্রাচুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় সে বিধি-নিষেধও তাহাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে।

"যদি পরার্থে জীবন উৎসর্গীকৃত না হয় তাহা হইলে সেস্থলে নারীর প্রেমের সার্থকতা নাই; মানুষের ভিতর যে প্রেম, সর্ব্বজনীনতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়, শিক্ষিতা নারী-সমাজও সংসারে সে অভাব পরিপূরণ করিতে পারে। যে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠে, নারীই আপনার অন্তরের মাধুর্য্যবলে সে সঙ্কীর্ণতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে।

"নারী-মহিমার দ্বারাই সভ্যতার পরিমাপ হইয়া থাকে; তাহার গৃহই জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি। জীবনের মাধুর্য্য হইল সভ্যতা, এবং সভ্যতার পরিমাপ হইল সৌন্দর্য্য। একমাত্র নারীই তাহার জীবনে এই সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিয়া পুরুষদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুসভ্য করিয়া তুলিতে পারে।"

৪। মা ভৈঃ

চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে "নারী জেগেছে", ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেরী নেই ; আমি দেখ্‌ছি "নারী রেগেছে", তার সঙ্গে ভারত-উদ্ধারের কোন সম্বন্ধই নেই। কেউ কেউ বলবেন—রেগেই যদি থাকেন—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেগেছেন, পশ্চাৎ রেগেছেন, এমন ত হ'তে পারে ? হাঁ, তা পারে ; কিন্তু অনুগ্রহ করে যদি নিদ্রাই ভঙ্গ হ'য়ে থাকে ত রেগে কি লাভ ?

সতী একবার রেগেছিলেন—আশুতোষের অনুনয় উপেক্ষা ক'রে, দশমহাবিদ্যার বিভীষিকা দেখিয়ে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, পিতৃগৃহে অনাহুত হ'য়ে ছুটে গিয়েছিলেন—ফল হয়েছিল পিতার অজমুণ্ড, যজ্ঞপণ্ড, পরে আপনার দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল স্বামীর স্কন্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে চতুঃষষ্টি পীঠস্থানের সৃষ্টি ; কিন্তু ধ্বংসলীলার সেখানেই অবসান হয়নি—প্রত্যাখ্যাত স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় গিরিরাজগৃহে পুনরায় জন্ম-পরিগ্রহ এবং পরিত্যাগের পর পুনর্মিলন হ'য়ে তবে সে নাটকের পরিসমাপ্তি হ'য়েছিল। তবে তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্গড় ভোলা নয়, এমন কি আফিম-খোর কমলাকান্ত পর্য্যন্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে তাই লোকে ভেবে আকুল হচ্ছে।

* * . * * * *

মা-সকল যে-সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেছেন বা জেগেছেন যাই বলুন, তার মধ্যে মূল হচ্ছে—স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকার equality of the sexes, এই equality বা সাম্য আপাততঃ এমনই ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চল্‌তে পারে তা মনে আসে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই genus homo এই পর্য্যায়ভুক্ত ; তা ছাড়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমতা নেই বল্লেই হয়—সামাজিক বা পারিবারিক unit হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি ভিন্ন জীব।

ভিন্ন হ'লেও ছোট বড় হ'তে হবে তার কিছু মানে নেই ; বোম্বাই আম আর মর্ত্তমান কলা, দু'টা ভিন্ন ফল—কিন্তু কে ছোট কে বড় প্রশ্নের কোন মানেই হয় না ; ১০৲ টাকার এক মণ চাউল—১০৲ টাকা আর ১ মণ চাউল, দুই তুল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুল্য মূল্য বলে এক বা সমধর্ম্মী নাও হ'তে পারে, কিন্তু দু'টা এক বস্তু নয়। অতএব দেখা যায় ভিন্ন হ'লেও তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুল্য মূল্য ব'লে এক বা সমধর্ম্মী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা—ভিন্ন ধর্ম্ম ব'লে কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়, তুল্য মূল্যই যদি হয় তাহ'লেও এক নয়।

স্ত্রী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা-সকল একথা বলেন তা হলেই আমাকে বলতেই হবে, মা-সকল "রেগেছেন", জেগেছেন একথা বলতে পারব না।

তারপর স্বাধীনতার কথা ; মা সকলের আবদার এই,—কেন স্ত্রী, পুরুষের অধীন হ'য়ে আজ্ঞাবাহী

পুতুল নাচের পুতুল হয়ে থাকবে? এখানেও আমি "স্বাগারই" লক্ষণ দেখ্‌তে পাই—"জাগার" লক্ষণ দেখ্‌তে পাই না। প্রথম কথা গৃহস্থালীটা প্রাচীন Sparta রাজ্যের মত যুগ্ম রাজ্য হবে, না এক রাজার রাজ্য হবে? দুই-এ এক না হ'য়ে গিয়ে দুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) স্বতন্ত্র উন্নত হ'য়ে গৃহস্থালীকে যদি Democratic নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তাহ'লে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী সুখশান্তি লাভের আশা করা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, অধিকাংশ স্থলেই একের প্রাধান্যই বলবান্ হ'য়ে উঠে—তা সেটা স্ত্রীরই হ'ক, বা পুরুষেরই হ'ক, অথবা স্ত্রী-পুরুষ দুই-এ মিশে এক হ'য়েই হ'ক, কিন্তু যেখানে Dual Sovereignty সেইখানে বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ। মা-সকলের এটাও বুঝা উচিত যে, ঘরের বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তার চেয়ে কম স্বাধীনতা স্ত্রীগণ অন্তঃপুর মধ্যে উপভোগ করেন না।

তবে, মা-সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এইজন্য যে, পুরুষ ব্যভিচারী হ'লে তার সাতখুন মাপ, কিন্তু রমণীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য একটু পদস্খলন হ'লেই সে বেচারী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল, তা'র এতটুকু অপরাধের মার্জ্জনা নেই। মা-সকলের একথাটা একটু খোলসা করে বুঝতে চাই। পুরুষের পক্ষে আইনটাকে খুব কড়া করে দেওয়া যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তাতে আপত্তি নেই বরং আমি তার খুব পরিপোষণ করি। কিন্তু পুরুষের বেলা আইনটা যেমন আলগা, নারীর বেলাও সমানাধিকারের নিয়মে তেমনি আলগা কেন হবে না মা-সকলের যদি অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে নারী রেগেছে বল্‌ব না ত কি? আর রাগের সঙ্গেই ত বুদ্ধিনাশ, আর তারপর বিনাশ।

সাম্যবাদী বা বাদিনীরা যাই বলুন আর যাই করুন, ব্যভিচারের যদি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা করে দেখা যায়, তাহ'লে সে পরিণামকে কিছুতেই সমান বলা যায় না।

*   *   *   *   *   *

স্ত্রীগণের স্বাধীনতা-লাভের উপায় হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে উপায়ক্ষম হন, এবং তদনুযায়ী বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষা করুন। কমলাকান্তের গৃহ শূন্য—সে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পক্ষ হ'তে এইমাত্র বলবার আছে যে, এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট ক'রেও কোন দিন এ পর্য্যন্ত তার গৃহিণীকে বলেনি—"আর পারি না, তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটিয়ে সংস্থান করে নাও।" পুরুষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে যদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেটা ভালই বল্‌তে হবে, কিন্তু যদি ঐটে অছিলে মাত্র ক'রে নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে থাকে, তাহ'লে পুরুষ বেচারার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হবে।

তারপর মা-সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেড়িয়ে পড়লে, আর স্ত্রী-শিল্প আর পুরুষ-শিল্প ব'লে কোন পার্থক্য থাকবে না। ব্যাঙ্কের দারোয়ানী থেকে আরম্ভ ক'রে কোদাল পাড়া পর্য্যন্ত সবই করতে হবে। যে দেশ থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঢেউ এদেশে উপস্থিত এসে লেগেছে—সে দেশে Factory girl থেকে আরম্ভ ক'রে ছুতার, রাজমিস্ত্রী, Chauffeur, গাড়োয়ান—সব কাজই মেয়েরা করুচে, আবার Member of Parliamentও হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদে কার্য্যের ভেদাভেদ হয় নি, এবং স্ত্রী স্বাধীন ব'লে পুরুষের অধীনতা পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও পারেনি।

কেন পারেনি তার কারণ বলছি। স্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, সেটার নাম —মৈত্রী। এই মৈত্রীর ক্ষুধা কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েরেই হৃদয়ে চিরদিন আছে ও থাকবে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাধীনতার ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, অলীক—কিন্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কন্দর থেকে চিরদিনই প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনিত হচ্ছে, সে আহ্বানকে কানে তুলো দিলেও শুনতে হ'বে, কেননা সেটা বাহিরের আহ্বান নয়—সেটা ভিতরের ডাক।

৫। 'বাবা মেয়ে'

......সোজা কথায় —মেয়েমুখো পুরুষ আর মদ্দা মেয়েমানুষ এ দুটো কথাই গালাগাল।

মানুষ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নারীকে অবলা, দুর্ব্বলা, weaker vessel ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু নারী, নারী হিসাবে কোনদিন অবলাও নয়, weaker vesselও নয়। আমি প্রবলা তরবোলা হিড়িম্বা বহুত দেখেছি। তবে ও সকল খেতাব নারীকে যে দেওয়া হয়েছে, তার ভিতর দৃঢ় অভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় তদনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে। নাই বললে শুনেছি সাপের বিষও থাকে না। তোমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই অবলা হ'য়ে যাবে এই দুষ্ট অভিপ্রায়েই পুরুষ নারীকে ঐ সকল সুশোভন অভিধা দিয়ে থাকে। নারী প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই অবলা নয়।

তা'বলে নারী পুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয়।.........মনু, যাজ্ঞবল্ক্য হ'তে আরম্ভ ক'রে মেকলে পর্য্যন্ত সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ করেন নি।......

কিন্তু জীবন্ত পুরুষ ও জীবন্ত নারী দুইটা স্বতন্ত্র জীব, দুইটার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম যিনি স্ত্রীকে স্ত্রী করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণয় করেছেন। তাঁদের শরীর-মন সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনুযায়ী ক'রে গড়েছেন। নারী যদি পুরুষসুলভ গুণের কার্য্যের অধিকার চায়, সেটা নারী স্বভাবের বিকার বা অস্বাভাবিক পরিণতি বলতেই হবে।

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃ আখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক নিছক courtesy নয়, কেননা স্ত্রীর স্ত্রীত্ব আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের এই সনাতন ধর্ম্ম। ইউরোপের অন্য কথা।......... ... সিগারেট মুখে বা হুঁকো হাতে ক'রে বসলে (পরমহংসদেব যাই বলুন) মা না ব'লে বাবা বলাই ঠিক মনে হয় না কি ?

শুধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতেই যে মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে তা নয়। অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় মাতৃহৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গিয়ে, সন্তানধারণ-ক্ষমতা লোপ পেয়ে, গৃহস্থালী পরিচালনোপযোগী বৃত্তিসকল শুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় sex সৃজন হচ্ছে......আমি বেশ দেখছি, নারীর মাতৃত্বের বিকাশ

না হ'লে বা তার অবকাশ না পেলেই সে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বসতে চায়……ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে প্রাচীর তা ভেঙে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ করতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার বক্ষে শিশু 'মা' ব'লে তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে, তখন পুরুষত্বের দাবী (যাকে মানুষের দাবী ব'লে মনে করে) কোথায় ভেসে যায়। লণ্ডনের পথে পথে যখন suffragetteরা হৈ হৈ ক'রে অতি অশোভনভাবে তাদের মনুষ্যত্বের দাবী ঘোষণা ক'রে গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম—হে ইংরাজ, মা সকলকে ঘরবাসী কর, স্বামীর সোহাগ আর সন্তানের মুখচুম্বনের ব্যবস্থা করে দাও, মা-সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, মা-সকল আপনারি পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু ইংরাজ-সমাজ সেদিকে গেল না; তার উপর লোকবিধ্বংসী সমরবহ্নি তাহাদের যৌন-সংহতি লেহন করে নিয়ে গেল: সে ব্যবস্থা আরও সুদূরপরাহত হ'য়ে গেল। তাই আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তার ঢেউ এখানেও এসে পৌঁচেছে। আমি দেখেছি বিলাতে যেমন স্বামী মিলে না ব'লে স্ত্রীগণ পুংধর্ম্মী হয়ে উঠে, আমাদের দেশে স্বামী মিললেও যেখানে স্বামিসুখ মিলল না, বা সন্তানের কাকলীতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না, প্রায় সেইখানেই মনটা হঠাৎ বহির্ম্মুখ হ'য়ে উঠে; হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, সমাজসংস্কার ইত্যাদির দিকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটী বিড়াল আছে, সে কখনও কখনও আমার দুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভালবাসে; প্রসন্নর সে মার্জ্জার-প্রীতি, আমি বুঝতে পারি, তার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের সন্তান-প্রীতিরই রূপান্তর, আর কিছু নয়। অনেক স্ত্রীসুলভ বাতিক (Hobby) তাঁদের হৃদয়ের কোন না কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শূন্য কন্দর পূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব বজায় রাখবার জন্য, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যামাত্রেরই বিবাহ অর্থাৎ, স্বামী সম্পর্কের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। Courtship বা flirtation-এর অনিশ্চিত জুয়াখেলার উপর যৌনসম্মিলনের ইমারত তোলার ব্যবস্থা করেন নি। ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই flirtation অর্থাৎ বন্ধু-সম্মিলন বা বধূ-সম্মিলনের "বিষম ঘূরণ পাকে" হাবুডুবু খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে, মাতৃত্বে তথা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছেন।

আমি তাই বলছি—মা-সকল মা হও। Council বা court বল, সভা বল, সমিতি বল, বক্তৃতা বল, বৈচিত্র্য হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও ওসব পন্থা মা হওয়ার আগে নয়। 'বাবা মেয়ে'র পুষ্টি করে সংসারের সর্ব্বনাশ করো না। দেশের সর্ব্বনাশ করো না। আমি বলে রাখলুম পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী—the twain shall never meet.

৬। নারী-মঙ্গল

কুমারীত্ব, নারীত্ব এবং মাতৃত্ব—এই তিন শক্তির অভিব্যক্তির ধারা—শক্তিসঞ্চয়, শক্তিবিকাশ এবং শক্তিপ্রকাশের যুগ।

প্রথম অবস্থাটিকে শক্তিসঞ্চয়ের যুগ (Potential accumulation) বলা যেতে পারে। কুমারী-শক্তিকে আমরা হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করি, কেননা শক্তি-প্রস্রবণের অনন্ত গোমুখীধারা কুমারীত্বের ভিতর লুক্কায়িত -সে যে বর্ত্তমানের ভিতর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মোহন ছবি। এই সময় সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে সামান্য ক'জনকে নিয়েই তাঁর কারবার। তবে এই সময় থেকেই শক্তি সঞ্চিত ও সংযত হ'তে থাকে। আমাদের দেশে গৌরীদানের ফল এই দাঁড়াত যে, ভিত্তি ঠিক না ক'রেই আমরা তার উপর প্রাসাদ গড়বার কল্পনা করতুম্। সুখের বিষয় সেদিন চলে যাচ্ছে। আশা করি এখন থেকে শক্তি সঞ্চিত ও সংহত হ'লে তবেই কুমারী নারীত্বের তথা দেবীত্বের পথে যাত্রা করবেন্—নতুবা নয়। এই হ'চ্ছে Training period ; এই সময় আদর্শটিকে বেশ সুস্পষ্ট ক'রে কুমারীর প্রাণে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, আমরা হয়ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ব।

দ্বিতীয় স্তরটিকে শক্তিবিকাশের যুগ (Development) বলা যায়। এই স্তরে কুমারী নারীত্বের ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের তথা বিশ্বের পথে যাত্রা করেন। বিশাল বিশ্বের একখানি সম্পূর্ণ অপরিচিত গৃহ ততোধিক অপরিচিত পরিজনের ভিতরে কুমারী সামান্য একটুখানি স্থান দখল করবার জন্য উপস্থিত হন। অপরিচিতাটিকে সকলেই "দেবী" হিসাবে বরণ করে তোলেন। এই সব থেকেই শক্তি-লীলার পরিস্ফুরণ। পূর্ব্বসঞ্চিত শক্তিবলেই তিনি অপরকে আপন করেন, অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিতে সমর্থ হন, অপরিচিতকে যুগযুগান্তরের হারানিধিরূপে ফিরে পান। শক্তির এই আশ্চর্য্য বিকাশ তখনই সম্ভব'পর হ'য়ে ওঠে, যখন শক্তিময়ী দেবী একটী শক্তিময় কেন্দ্র খুঁজে পান—তখনই তিনি সেই স্থির কেন্দ্রের উপর দাঁড়িয়ে তার লীলাপরিধিকে ক্রমাগত বিস্তৃত করবার অবকাশ পান। এই কেন্দ্রেই হচ্ছে লীলার দোসর, "পতি"—কেননা তিনি পত্নীকে পতন থেকে রক্ষা করেন ; এবং দেবী নিজে "পত্নী"- কেননা তিনিও পতিকে পতন থেকে রক্ষা করেন কিন্তু "দোসরের' ভিতরে যে দ্বিত্বভাব, শক্তির পক্ষে তা অসহ্য। শক্তি চায় মিলন—একত্ব। মিলনের নিবিড় ব্যাকুলতায় উভয় কেন্দ্রের প্রাণ-মন আদর্শ প্রেমের সোণার কাঠি স্পর্শে এক হ'য়ে যায়। আর দ্বিত্বভাব নেই—তখন 'পতি' হয়ে যায় "স্ব—আমি", তখন স্থির কেন্দ্রের উপর তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠ। এই অবস্থা 'যদস্তি হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম'……এই সরল সুন্দর মন্ত্রটীর পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা। কুমারী-শক্তির এই প্রথম দেবীত্ব-সিদ্ধি, কেননা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতকে তিনি 'আপন হইতেও আপনার' করতে সমর্থ হয়েছেন। এই সময় থেকেই 'আমি পরিধির বিস্তৃতির আরম্ভ', কেননা কেন্দ্রভ্রষ্ট হ'বার সম্ভাবনা নেই।

শক্তি আবার সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। অসীমের বাঁশী তার প্রাণ-মন আলোড়িত ক'রে তাকে বিশাল বিশ্বে আহ্বান করে। তখনই বহু হবার বাসনাটি প্রাণে জাগে। এই বাসনা থেকেই সৃষ্টি। শক্তির এই যে একত্ব এবং বহুত্বের ভিতরে আনাগোনা এই ত সৃষ্টিলীলারহস্য। এই তৃতীয় স্তরটি হচ্ছে শক্তিপ্রকাশের

যুগ (R·alisation)—নারীত্বের চরম প্রকাশই হচ্ছে মাতৃত্ব। আজ তিনি সন্তানের ভিতর নিজেরই আত্মা প্রতিফলিত হয়েছে দেখতে পান। আজ তাঁর চোখে সমস্ত বিশ্বই মধুময়—আজ আর শত্রুতে মিত্রতে প্রভেদ নেই—তিনি বিশ্বজননী তোমার, আমার, সকলের মা। আর সেইজন্যই যে মুহূর্তে হিন্দু সন্তানকে নিজের আত্মারই মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে লাভ করেন, সেই মুহূর্তে পত্নী আর পত্নী নন—তিনি তাঁরও মা। এইজন্য তন্ত্রের উপদেশ—রমণীকে জননীতে পরিণত কর ; ভোগ-পিপাসা মিটে যাবে।

এখানে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা অধিকাংশই মুখে এবং লেখায় যাই বলি না কেন, কাজে এবং ব্যবহারে নারীর নারীত্বকে পদদলিত ক'রে শুধু দৈহিক সম্বন্ধটাকে বড় ক'রে তুলেছি। শিক্ষার ও যুগধর্ম্মের মারফতে যে সব নারীর জীবন সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে, তাঁদের অন্তর যে ক্রমে বিষিয়ে উঠেছে সে খবরও আমরা রাখি। অন্ধ "পতি-দেবতা"—মোহ এ দুর্ব্বার জলতরঙ্গ বেশীদিন রোধ করতে পারবে না। আজ নারী হাড়ে হাড়ে ভুগে দেবতা ও পশুর পার্থক্য বেশ ক'রে যাচাই ক'রে নিতে শিখেছেন। যেদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরি সহসা সংক্ষোভিত হ'য়ে উঠবে, সেদিন হয়ত বাংলা স্তম্ভিত হবে। সময় থাকতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নারী শুধু রমণী নন —তিনি নারী -এবং ভবিষ্যৎ বাংলার জননী। ভাই বাঙালী সাবধান !!

কিন্তু যা বলতে যাচ্ছিলাম তাই বলি। সমস্ত বিশ্বকে আপনার ক'রে প্রেম তৃপ্তি পায় না। অসীমের আহ্বান তাকে দূরে—আরও দূরে টেনে নিয়ে যায়। শক্তি মহাশক্তির মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তবেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। তখন স্বামী জগৎস্বামীতে পরিণত হয়।

* * * * * *

যা অসুন্দরকে সুন্দর করে, অপূর্ণকে পূর্ণ করে, বিচ্ছেদকে মিলনের রাগিণীতে ভরপুর করে দেয়, এবং অসামঞ্জস্যের ভিতর যা সুসামঞ্জস্যের ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারে, তাকেই আমরা শ্রী নামে অভিহিত করি। নারী সেই শ্রীরূপিণী মহাশক্তি। কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অন্যায় চাপে নারী আজ শ্রীভ্রষ্ট এবং আমরা শ্রীহীন—লক্ষ্মীছাড়া।

সেই সুপ্ত শ্রীটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য অন্ততঃ বাংলায় একটা অভিনব সাড়া পড়ে গেছে। সে শ্রী ফুটে উঠুক আমাদের পল্লীমায়ের বুকে, নবনাগরিক সভ্যতার অন্তরে, বঙ্গসমাজে এবং নির্ম্মম শাস্ত্রের "অচলায়তন" চুরমার করে। আমার বাংলার প্রত্যেক নরনারী শ্রী সম্পন্ন হয়ে এক অভিনব "দেবজাতি" গড়ে তুলুক। সেজন্য প্রত্যেক নরনারীকে স্বরাট এবং স্বাধীন হয়ে দাঁড়াতে হবে—পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। প্রবীণের দল হয়ত স্ত্রী-স্বাধীনতা শুনেই আঁৎকে উঠবেন। কিন্তু আমাদের মতে স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতা নয় স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের অন্তর-দেবতার অধীনতা।

আমাদের তথাকথিত স্ত্রী-স্বাধীনতার যে ব্যভিচার হয়নি, এমন কথা বলি না। আমরা জোর করে বাইরে থেকে স্বাধীনতা চাপিয়ে দিয়েছি, অথচ তখনও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। কাজেই দু'এক জায়গায় যে কুফল ফলবে সে ত জানা কথাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা দেবে বলে পুরুষ যে স্পর্দ্ধা করে, সেটা নিতান্তই মিথ্যা কথা—ফাঁকা চাল। স্বাধীনতা দানের বস্তু নয়, অন্তরের ভাবলব্ধ ধন, অন্ধকারের জীব

অতখানি আলোর সমারোহ সহ্য করচে কি ক'রে। প্রথমে জ্ঞানালোকে এই অন্ধকার অপসারিত করতে হয়, তখন স্বাধীনতাকে জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে হবে না, সে আপনি এসে তার স্বর্ণ সিংহাসন বিছিয়ে নেবে।

নারী, মনে রেখো তুমি সেই জগতের চিদাধার শক্তির একটি বিশিষ্ট অংশ। তুমি আত্মবিস্মৃত এবং একটু বেশীমাত্রায় বৈষ্ণবী হ'য়েছিলে ব'লেই তোমার এই দুরবস্থা। শক্তিহীনা না হ'লে কি তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে পারতুম? তোমার পায়ে শিকল পরিয়ে আমরাও আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল-বাঁধা—পদদলিত; শক্তির অভাবে আমরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছি। আজ আমাদের মত তোমাদেরও মনের শিকল কেটে ফেলতে হবে। 'আত্মানং বিদ্ধি' 'আত্মস্থ হয়ে নিজেকে জান, বুঝবার চেষ্টা কর, অন্তর্মুখ হয়ে আপনাকে মহাশক্তির অংশ ব'লে জান,—তারপর এস দুজনে মিলে একটা মহাসৃষ্টির সূচনা করি।

তবে এস সহধর্ম্মিণী, তোমার মাহেশ্বরী শক্তি নিয়ে যেখানে যত অপূর্ণতা, অক্ষমতা এবং অনুদারতা আছে, তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ড খণ্ড ক'রে দাও, যেখানে তোমার শক্তির অবমাননা দেখবে সেখানে তোমার তীব্র জ্যোতিতে অপমানকে পরাস্ত এবং লজ্জিত করে তোমার সহধর্ম্মীর অন্তরে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা দিয়ে বিশ্বের সমস্ত শুভকাজে তার পাশে এসে দাঁড়াও এবং তোমার বৈষ্ণবী শক্তি প্রেমে, গানে, আনন্দে বিশ্বে চিরবসন্ত আনয়ন করুক।

জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা আমার, তোমার ভিতর ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিত্রয়ের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য সংসাধিত হ'য়ে বিশ্বে এক নবযুগের সূচনা করুক। তোমার অপূর্ণ আশাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার জন্য তোমার সন্তানদের প্রাণে সেই মহান্ আদর্শের অঙ্কুরটি সযতনে রোপণ করে দাও—তুমি হয়ত দেখতে পাবে না—কিন্তু কালে সেই অঙ্কুরটি এমন এক মহামহীরূহে পরিণত হবে, যার শীতল ছায়ায় ব'সে বিশ্বমানবের তাপিত প্রাণ শীতল হবে, ধন্য হবে, পবিত্র হবে।

নারী নারী, নারী—বিশ্বজননী, নারী—জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের ত্রিবেণী, নারী শ্রী, নারী—শক্তি ও স্বাধীনতার উৎস। আমরা সেই বিশ্বাত্মিকা মায়ের জাতকে "নরকস্য দ্বারং" ব'লে ঘৃণা করে এসেছি। তাই আমাদের সাধনার ক্ষেত্র হয়েছে রুদ্ধঘর, চোরাগলি এবং পর্ব্বতের গহ্বর। সে আত্মদর্শন ছিল স্বার্থ-দুষ্ট, কাজেই ব্যর্থ; সেখান থেকে ফিরে এসে যদি এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে সেই 'আমি'কে মহত্তর ও বৃহত্তরভাবে পেতে তাঁরা চেষ্টা করতেন তা হ'লে সে ছিল স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু গহ্বর থেকে ফিরবার পথ তাঁরা খুঁজে পাননি, হয়তো সে চেষ্টাও তাঁদের ছিল না। এটা হচ্ছে সামঞ্জস্যের যুগ। বৈরাগ্যের ভিতর এবার নয়, এবার—

"অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

এবারকার অভিযান কাউকে বাদ দিয়ে নয়—কাউকে পিছনে ফেলে নয়, এবার চোরাগলিতে নয়—একেবারে বিশ্বের সদর রাজপথে। আনন্দবাজারে।

৭। সমাজে স্ত্রী-সমস্যা

*　*　*　*　*

স্ত্রী-লোকেরা মাতৃত্বের নিমিত্ত বড় লালায়িত, তাহাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া গঠিত। তাহারা মাতা হইতে না পাইলে তাহাদের জীবনই যেন ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং ইহা তাহাদের মুখ্য অভাবের ভিতর গণ্য। আমাদের অন্য সকল অভাবই গৌণ অভাব। আমাদের গৌণ অভাবের অন্ত নাই। সভ্যতা বিকাশের সহিত আমরা অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিতে পারি বলিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া আমরা অনেকেই মুখ্য অভাবের ন্যায় তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি। সেগুলি না পাইলেও আমরা সুখে থাকিতে পারি। সুতরাং প্রধানতঃ যাহাতে সমাজের সকলেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারে তাহা দেখা উচিত; এবং যে পরিমাণে যে সমাজ সকল লোকের সেই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে না পারে, সেই সমাজ তত অসম্পূর্ণ। কতকগুলি লোক তাহাদের অনেক গৌণ অভাব পূরণ করিবে আর বাকীগুলি তাহাদের মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিতে পারিবে না—ইহা ন্যায়সঙ্গতও নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। সকলেরই মুখ্য অভাবগুলি পূরণ করিয়া তবে গৌণ অভাব পূরণ করা ও অন্য নানা দিকে উন্নতির চেষ্টা করা উচিত। এই মূল তত্ত্বটি স্মরণ রাখিয়া নানা প্রকার সমাজগঠন-পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অনেক প্রকার সমাজগঠন পদ্ধতি এতাবৎকাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মূলতঃ ব্যক্তিতান্ত্রিক (Individualistic) সমাজ এতাবৎ পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রবর্ত্তিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্ত্যে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, এই ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজের চরম বিকাশ হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য-জগতের উন্নতি ও প্রভাব দেখিয়া আমরা সেই সমাজাদর্শ আমাদের সমাজগঠন-আদর্শ অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া আমাদের পুরাতন সমাজগঠন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। তাই একবার দেখা যাউক, তাহাতে আমাদের কোন বিশেষ সুবিধা হইবার প্রত্যাশা আছে কি না।

*　*　*　*

স্ত্রী-সমস্যাও কিরূপ ভীষণ হইবে ও পাশ্চাত্ত্যে কিরূপ হইয়াছে, তাহাও দেখাইতেছি। যেখানে সকল লোকেরই নিজের নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেখানে অনেক লোকই একেবারে বিবাহ করিতে পায় না; কারণ, সকল লোক কোন কালেই এত উপার্জ্জন করিতে পারে না, যাহাতে সে তাহার স্ত্রী-পুত্রদিগকে তাহার আকাঙ্ক্ষিতরূপে ভরণপোষণ করিতে পারে ও পরেও সেইরূপ করিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা থাকে। অনেক লোকই অধিকতর উপার্জ্জন ক্ষমতা পাইবার আশায় বহুকাল বিবাহ করে না। অনেকের ইতিমধ্যে যৌবনকাল দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, অনেকের প্রৌঢ়কালও অবিবাহিত অবস্থায় কাটিয়া যায়। যৌবনই উপভোগের সময়। সেই সময় যদি কাটিয়া যায়, তখনই যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সার জিনিষ ভালবাসা উপভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে জীবনের সুখ—বিশেষতঃ, গরীবদের—কি রহিল? ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি আছে? ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে এই দুর্ভাগ্য অধিক লোককেই ভুগিতে বাধ্য করা হয়।

পরিণত বয়সে আর্থিক সচ্ছলতা কি ক্ষতি পূরণ করিতে পারে? যৌবন ত আর ফিরিয়া আসিবে না। হয়তো সে তাহার মনোমত স্থানে অর্থাভাবেই বিবাহ করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে হয়তো সেই স্ত্রীলোক অন্যত্র বিবাহিত হইয়াছে। এইরূপ প্রায়ই ঘটে। তখন তাহার হৃদয়ের ক্ষোভ কত, তাহা কে দেখে? যদি বহু লোকই অবিবাহিত বা অনেক কালই অবিবাহিত থাকে, তাহা হইলে বহু স্ত্রীলোকও একেবারে অবিবাহিত বা বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। যখন তাঁহারা বহুকাল অবিবাহিত থাকেন, তৎকালে তাঁহাদের প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকায় প্রকৃতি তাহার পরিশোধ লয়। তাঁহাদের জীবন সরস রাখিবার মূল উৎস শুকাইয়া যায়—জীবনই শুষ্ক হয়। আবার বহুকাল অবিবাহিত থাকিতে হইলে অধিকাংশ স্ত্রীলোককে তৎকালে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিতে হয়। এইরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতার কর্ম্ম করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা প্রকৃতির নিয়মে পুরুষদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল। সুতরাং পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হইলে তাঁহাদিগকে বিষম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহার উপর মাসিক রজোনিঃসরণকালীন তাঁহাদের একটা স্নায়বিক উত্তেজনা আসে; শরীর দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়। তখন তাঁহাদের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, সকল চিকিৎসকই ইহা স্বীকার করেন। সেই সময়ে বিশ্রাম না পাইলে তাঁহারা নানারূপ পীড়াগ্রস্ত হয়েন; রজঃসংক্রান্ত নানারূপ ব্যাধি হয়। অথচ পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা সেরূপ বিশ্রাম পান না। তন্নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য করাইয়া তাঁহাদিগকে যে কত নির্য্যাতন করা হয় তাহা কেহ দেখে না। তাঁহাদিগকে এইরূপ কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়ায় আর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে ছেক্‌রা গাড়ী টানিবার অধিকার দেওয়ায় কোন প্রভেদ আছে কিনা—তাহা পাঠিকারা বিবেচনা করুন। প্রাচীন হিন্দুদের চক্ষে ইহাকে তুল্যাধিকার দেওয়া বলা একরূপ নির্ম্মম পরিহাস ও ভীষণ প্রতারণা বলিয়া প্রতিভাত হয়।

* * * * *

আবার স্ত্রীলোকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে বহু কর্ম্মপ্রার্থী হওয়ায় কর্ম্মীদের মাহিয়ানা কম হয়, কর্ম্ম-সময়েরও পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য আবার স্বাস্থ্যহানি হয়। একথা আমার কপোলকল্পিত নয়, পাশ্চাত্ত্যে ইহা হইয়াছে; এবং স্ত্রী-স্বাধিকার সম্বন্ধে একজন প্রধান নেতা Ellen Key এবং অন্য অনেকেও সে কথা বলিয়াছেন। এইরূপে যাঁহারা নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজেদের ভরণপোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের আর গৃহস্থালীর কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। পুরুষদের সহিত প্রতিযোগিতায় কর্ম্ম করিয়া তাহাদের প্রকৃতিতে পুরুষসুলভ কাঠিন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; স্ত্রী-পুরুষদের ভিতর একটা বিদ্বেষভাব আসিয়া উপস্থিত হয়—পাশ্চাত্ত্যে তাহা হইয়াছে এবং ক্রমেই ভীষণতর হইতেছে। এই সকল কথাও উক্ত Ellen Key তাঁহার বহু ভাষায় অনুবাদিত ***Love and Marriage*** নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্ত্রী-পুরুষদের পুরামাত্রায় আলাহিদা কর্ম্মবিভাগ যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, তাহা না হইলে এই প্রতিযোগিতা, এই বিদ্বেষভাব কিরূপ ভীষণ হইবে—তাহা বলা যায় না। ক্রমে স্ত্রীলোকদিগের মাতা হইবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতাই লোপ পাইবে—অন্য কোনরূপ মাঝামাঝি বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। এইরূপ কাঠিন্য ও বিদ্বেষভাব হওয়ার ফলে পরে তাঁহাদের বিবাহিত জীবনও সুখময় ও শান্তিময় হইতে পারে না। আবার বহুকাল এইরূপে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন; নূতন করিয়া গৃহস্থালী ও মাতৃত্বের উপযোগী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তদুপযোগী শিক্ষা ও পরের যত্ন করিবার

অভ্যাসের অভাবে তাঁহারা মাতা হইবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়েন। মাতৃত্বে আর তেমন সুখ পান না, সুতরাং পুত্রকন্যাদের সহিত বহুদিন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না। তদ্‌ভাবে অপত্যদেরও সেরূপ পিতৃ-মাতৃভক্তি উদ্দীপিত হয় না। সুতরাং বৃদ্ধবয়সেও পুত্রকন্যাদের আন্তরিক যত্ন ও সেবা পান না। তাহারা কাছেও আসে না। ভাড়াটিয়া সেবা ভিন্ন অন্য কিছু উপভোগের জিনিষ থাকে না। আমাদের গরীব দেশে অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে তাহাও পাইবে না, প্রায় সকলকেই নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য বৃদ্ধবয়স পাশ্চাত্যদের কাছে এত ভয়ঙ্কর। এ দিকে মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা ও অভ্যাসের অভাবে, মাতার যেরূপ যত্ন করা উচিত—সে জ্ঞানের অভাবে অপত্যদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, অধিক শিশুর মৃত্যু হয়। অনেকেই বিবাহের পরেও নানা কারণে পূর্ব্বের মত কর্ম্ম করিয়া উপার্জ্জন করিতে থাকেন। সেরূপ কর্ম্ম করায় অপত্যদের সম্যক তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। সুতরাং শিশুরা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়—শিশু-মৃত্যুর হার আমাদের দেশের অপেক্ষা কম বলিয়া পাঠকবর্গ এই কথাটা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। বিলাতে যেরূপ সকল লোককে নানারূপ শিক্ষা দেওয়া হয়—গরীবদের সুবিধার্থে যে নানারূপ প্রতিষ্ঠান ও সুবিধা আছে, তাহা আমাদের নাই এবং তাহা করিবার সাধ্যও আমাদের নাই। আমাদের দেশে শতকরা ৯৫ জন একান্ত গরীব, তাহা মনে রাখিতে হইবে। যখন বিলাতে গরীবের জন্য রাজকোষ হইতে এত খরচ হইত না, তখন তাহাদের শিশু-মৃত্যুর হার এখনকার দ্বিগুণ ছিল—যেখানে অবস্থাপন্নদের শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা আটটি ছিল, গরীবদের সেখানে ৩০টি ছিল (See Rev Usher's Book on *Neomalthusianism*)। আমাদের দেশে হাসপাতাল, শিশু-পরিচর্য্যালয় নাই বলিলেই হয়। সমস্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে মাত্র ৩,৯২৭টি হাসপাতাল আছে। তাহাও বেশীর ভাগ নামে মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে শিশু-মৃত্যু অনেক বাড়িয়া যাইবেই।

যে সকল স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা অর্থ বা সম্ভ্রম বা অন্য প্রলোভন সামলাইতে না পারায়, কিম্বা দুইজনের উপার্জ্জন ব্যতীত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসুবিধাজনক বলিয়া অনেকেই পূর্ব্বের মত উপার্জ্জন করিতে থাকে। তাহা করিলে স্বামী-স্ত্রীতে দুইজনে কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া জীবন-সংগ্রামের নানা ঝঞ্ঝাট ও ভগ্নাশা লইয়া যখন গৃহে ফিরিবে, তখন কে কাহাকে যত্ন করিবে? তখন পরস্পরের ব্যবহার ও যত্নে স্নিগ্ধ হইবার প্রত্যাশা থাকে না; সেখানে তাহাদের শান্তি, তৃপ্তি, ভালবাসার অবসর কোথায়? তখন গৃহ আর গৃহ থাকে না, রাত্রিযাপনের বাসায় পরিণত হয়। সামান্য কারণে কলহ উপস্থিত হয়—বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। পাশ্চাত্য দেশে তাহা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধি হইবার এবং বিবাহ সুখকর না হইবার আরও অনেক কারণ আছে।

* * * * *

সকল দেশেই জারজ সন্তানের ভিতর শিশু-মৃত্যু অধিক হয়—বিবাহিতদের সন্তানদের দ্বিগুণেরও অধিক। প্রথম কারণ, একা মাতা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারে না, তাহারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে নিদারুণভাবে নির্য্যাতিত হয়। যে-সকল পুরুষ অবস্থা ভাল নয় বলিয়া বিবাহ করেন না, অথচ অপর স্ত্রীতে সঙ্গত হয়েন, তাঁহাদের এই কার্য্যে কত কাপুরুষত্ব, কত নীচত্ব প্রকাশ পায়, তাহা একমাত্র পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পুরুষমানুষ হইয়া তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, দুজনের সমবেত চেষ্টায় অপত্য পালন করিতে সমর্থ নন বলিয়া বিবাহ করিলেন না, অথচ একটি স্ত্রীলোকের একার ঘাড়ে

সেই ভার অকুণ্ঠিতভাবে চাপাইলেন—সেই সন্তানের ও তাহার মাতার কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে, তাহাদের জীবন কিরূপ দুর্ব্বিষহ হইবে, তাহা ভাবিবার আবশ্যকতা বোধ করেন না। আমাদের দেশে ইহা মহাপাতকের ভিতর গণ্য ছিল। পাশ্চাত্যে এরূপ কার্য্য অনেকেই করে। অনেকে বলিয়া থাকেন যতদিন স্ত্রী-পুরুষদিগের সম্যক্ প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না হয়, ততদিন বিবাহ না করাই ভাল—তখন এইরূপ করাটাই বিধেয়; স্ত্রীকে নানারূপ গৃহকার্য্য—দাসিবৃত্তি করান, তাহাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের এই গরীব দেশে কয়জন বিবাহ করিতে পারে? শতকরা ৫ জনের অধিকও নয়। তখন বাকী ৯৫ জন কি করিবে? তাহারা সকলেই কি ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী থাকিতে পারে? নিজের স্ত্রীকে কেবল বিলাসে রাখা, আর অন্য স্ত্রীলোকেরা এইরূপ কষ্টভোগ করুক—তাহা কি স্ত্রীজাতির প্রতি অধিক সম্মান বা ভাল ব্যবহারের নিদর্শন, না নিজের অধিকতর স্বার্থপরতা বা অহমিকার নিদর্শন, পাঠকবর্গকে অনুধাবন করিতে বলি। পাশ্চাত্য সমাজ এইরূপ ব্যবহার করেন এবং আমরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করি বলেন, এবং তাঁহারা সসম্মান ব্যবহার করেন বলেন, এবং আমরা তাহা মানিয়া লই, আশ্চর্য্য!

* * * * * *

* * * * *

অধিক বয়সে যখন বিবাহ করা হয়, তখন দুইজনে বহু স্ত্রী ও পুরুষের সহিত মিশিয়াছে—অনেকের প্রতি আকর্ষণ হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অভাবে বা আর্থিক বা অন্য প্রতিবন্ধক থাকায় হয়তো আকর্ষণের স্থলে বিবাহিত হইতে পারে নাই। অনেকে এরূপ আকর্ষিত স্থলে উপগত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডেন্‌ভার সহরে শিশু-অপরাধের বিচারক লিণ্ডসে সাহেব তাঁহার লিখিত ***Revolt of Modern Youth*** নামক বিখ্যাত পুস্তকে তাঁহার ২৫ বৎসরের কর্ম্মোপলক্ষের অভিজ্ঞতার ফলে লিখিয়াছেন যে, ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের যুবতীদের ভিতর নিদেন শতকরা ২০টির চরিত্রদোষ হইয়াছিল। পূর্ব্ব-জার্ম্মানীতে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কোন ১৬ বৎসরের অধিক বয়স্কা যুবতীই অক্ষতযোনি নাই। ইহা **Havelock Ellis** লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংল্যাণ্ডের ষ্টাফোর্ডসায়ারে বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে হওয়া সেই প্রদেশের রীতির ভিতরই গণ্য। অন্যান্য অনেক স্থলে এরূপ হয় তাহাও লিখিয়াছেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল কি হয় তাহা একবার ভাবুন। আবার যদি সেরূপ উপগত না হয়েন, তথাপি সে ক্ষেত্রে সেই আকর্ষণকারিণীর ছায়া তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এই আকর্ষণটা অনেক স্থলে কত গভীর তাহা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎবাবু বহু পুস্তকেই দেখাইয়াছেন—সেইখানেই মিলিত না হওয়ার যে কি মহাদুঃখ, জন্মের মত জীবন কত বিষময় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়; এবং পরে যখন বেশী বয়সে বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে তাহাদের কিরূপ সুবিধা হইবে তাহা খতাইয়া দেখিয়া তাহারা বিবাহ করে। বিবাহিত জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কলহ অবশ্যম্ভাবী; বিশেষতঃ বেশী বয়সে সকলেরই পৃথক্ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইযাছে—অল্প বয়সের মতন পরের সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পায়। একত্র ঘর করিবার পূর্ব্বে কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ রকমে জানিতে পারে না—সুতরাং পরস্পরের স্বভাবের বা চরিত্রের নানাভাবে অজ্ঞাত বা অপ্রত্যাশিত রূপ-প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী—তন্নিমিত্ত কলহ আরও অধিক মাত্রায় হয়। তখন পূর্ব্বের আকর্ষণ-স্মৃতি জাগরিত হয়—নিজে বা অপরের দ্বারায় প্রতারিত হইয়াছে—এই রূপ বিশ্বাস সহজেই আসে—সুতরাং সামান্য কলহও ভীষণ ভাব ধারণ করে,—বিবাহ সুখময় ও শান্তিময় হয় না। এইজন্য দেখা যায় যে, সকল ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজেই বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে।

এক ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ সুখময় ও শান্তিময় না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। সেখানে দুইজনেই পরস্পরের সঙ্গে বহুক্ষণ কাটাইতে বাধ্য হয়। যেমন ভাল জিনিষ যাহা আমরা খাইতে বড় ভালবাসি, তাহা প্রত্যেক দিনই বহু পরিমাণে খাইলে অল্প দিনেই তাহাতে বিতৃষ্ণা আসে, সেইরূপ স্বামী-স্ত্রীতে প্রত্যেক দিনই দিবারাত্রির বহু অংশ পরস্পরের সঙ্গে কাটাইতে হইলে অল্প দিনেই উহা বিতৃষ্ণাকর হইয়া পড়ে। এমন কি বিবাহের পরেই উহারা যে মধুযামিনী যাপন (Honeymoon) করেন, তাহারই ভিতরে অনেক বিচ্ছেদ হইয়া যায়। যৌথ পরিবারে থাকিলে সেইরূপ পরস্পরের সঙ্গে অধিক কাল কাটাইতে আমরা বাধ্য হই না, সুবিধাও পাই না—তন্নিমিত্ত আমাদের ভিতর আকর্ষণটা বহুকাল স্থায়ী হইতে পায়—আমাদের বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি তজ্জন্য কত ঋণী, তাহা আমাদের তরুণ-তরুণীরা বুঝেন না। এই নিমিত্তই স্বামী-স্ত্রীতে বহু রকমের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, আমরা বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইয়া দিতে পারি, যাহা কেবল স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া আলাহিদা থাকিলে বিশেষতঃ পুত্র-কন্যাদি নিকটে থাকিলে সচরাচর সম্ভব হয় না।

এই সকল নানা কারণে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্ত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমা সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থলে প্রতি বৎসর যত বিবাহ হয়, তাহার অর্দ্ধেকের অধিক বিচ্ছেদ হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, অনেকে প্রকাশ্য কেলেঙ্কারীর ভয়ে, কোথাও বিবাহ-বিচ্ছেদ মোকদ্দমার অর্থব্যয়ের জন্য, কোথাও বা অপত্যদের মুখ চাহিয়া শান্তিময় গৃহেই বাস করেন বা কার্য্যতঃ পৃথক্ থাকেন—বিচ্ছেদ মোকদ্দমা হয় না; সুতরাং যত মোকদ্দমা হয় তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক বিবাহ দুইজনের পক্ষেই দুঃখদায়ক হয়; সুতরাং নিজেরা পছন্দ করিয়া বেশী বয়সে বিবাহ করিলে দেখা যাইতেছে যে, ফলতঃ সেরূপ বিবাহ সুখকর হয় না। স্ত্রীলোকেরা নিজের আকাঙ্ক্ষিত স্থানে বিবাহিত হইতে না পাইলে বহুকাল একা থাকিবার কষ্ট সহ্য করিতে না পারায় অনেক স্থলেই আর্থিক বা অন্য কোন সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিবাহিত হইতে বাধ্য হন। এইজন্য মহাত্মা টলষ্টয় তাঁহার *Krenser Sonata* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে দাস-দাসীরা যেমন বাজারে বিক্রীত হইত, এখন পাশ্চাত্ত্যে স্ত্রীলোকেরা সেইরূপ বিক্রীত হয়েন। আমাদের তরুণ-তরুণীরা ভাবেন, পরস্পরকে দেখিয়া জানিয়া বিবাহ করিলে বিবাহটা বড় সুখকর হয়, কিন্তু ফলতঃ যে তাহার ঠিক বিপরীত হয়, সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার তাঁহাদের সময় ও সুবিধা হয় নাই। অধিক বিবাহ-বিচ্ছেদ দেখিয়া অনেকে হয়ত বলিবেন দুইজনে চুলোচুলি করার অপেক্ষা ফারখৎ হওয়া ভাল। তাঁহাদিগকে এই বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর অপত্যদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলি—তাঁহারা মাতাপিতার ভিতর একজনকে হারাইবেই। একজনের পক্ষে অপত্য প্রতিপালন করিতে কিরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়,—বিশেষতঃ যাহারা গরীব—আমাদের শতকরা ৯০, ৯৫ জন গরীব—এবং অপত্যদের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এইরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। মাতাপিতারা পুনরায় বিবাহ করিলে শিশুদের দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া যায়।

* * * * *

আমরা দেখিলাম, ব্যক্তিতান্ত্রিক সকল সমাজেই অনেক যুবতী স্ত্রীলোককেই প্রথমতঃ বহুকালই অবিবাহিতা থাকিতে হয়। তাহাদের সংখ্যা শতকরা ২৫ হইতে ৪০টি। আমাদের ভিতর ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে

ইতিমধ্যে ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা ১০০০ স্ত্রীলোকের ভিতর ২০৭টি অবিবাহিত (See, *Census Report of Bengal, Bihar & Orissa*, 1911. p. 351)। যাঁহারা আমাদের বিধবাদের দুর্দশা দেখিয়া আমাদের সমাজকে স্ত্রীলোকদিগের নির্য্যাতনকারী বলেন তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্ত্যের এই সকল ব্যবস্থা—অবিবাহিতাদের অবস্থার কথাটা ভাবিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা কি যৌবনারম্ভ হইতেই সেই বৈধব্যদশা ভোগ করিতেছেন না? যৌবনে প্রকৃতি কি তাঁহাদিগকে যৌনমিলনের জন্য ব্যগ্র করিয়া তোলে না? সেই সময়ে তাঁহাদের মনোমত যুবকদের প্রতি কি তাঁহারা ধাবিত হন না? সেই সময়ে তাঁহাদের মনোমত স্থানে মিলিত হওয়ার সুখের স্বপ্ন কি তাঁহারা দেখেন নাই? তাঁহাদের অধিকাংশকেই কি বার বার বিফল-মনোরথ হওয়া বা ভগ্নাশার—অথবা প্রত্যাখ্যানের গুরুভার হৃদয়ের অন্তস্তলে গোপন করিয়া থাকিতে হয় না? অনেকের কি তন্নিমিত্ত জীবন বিষময় হয় না? এই সকল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকে বিধবাদেরই মতন কাম-উপভোগ ও যৌন-প্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়; অথচ বিধবাদের মতন সংযম ও ত্যাগ-শিক্ষার অভাবে তাঁহাদিগকে প্রকৃতি প্রতিদিন পুরুষদিগের সংমিশ্রণে প্রধাবিত করিতেছে। চতুর্দ্দিকে থিয়েটারে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, নভেলে, যৌন-প্রেমের উন্মত্ত উপভোগের চিত্র তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিতেছে, অথচ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, মনের মানুষ পাইবার আশায় আশায় ক্রমে ভগ্নাশায়—শেষে নিরাশায় যৌবন কাটিয়া যাইতেছে—অনেকের প্রৌঢ় কালও কাটিয়া যাইতেছে—জীবনও কাটিয়া যাইতেছে—ইহা কি গ্রীক্ পুরাণোক্ত Tantalus-এর নির্য্যাতন নয়? এইরূপে কিছুদিন কাটাইয়া সংসারের নীচতায়, শঠতায়, অবিশ্বাস্যতায়, অনভিজ্ঞা তরুণীদের কতকাংশ কখনও বা রূপে বিমোহিতা হইয়া—কখনও বা নিজের উদ্দাম কল্পনার্পিত গুণে আকৃষ্ট হইয়া নায়কদিগের দ্বারায় প্রতারিত হইতেছেন এবং কতক বা আত্মহত্যা, কতক বা জারজ সন্তান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কতক বা তাহাদের মমতা ত্যাগ করিতে না পারিয়া অবশেষে বারবনিতা হইতে বাধ্য হইতেছেন এবং যৌন-রোগাক্রান্ত হইয়া সমাজে যৌনরোগের বিস্তার করিতেছেন। কতকাংশ বা মনের মতন মানুষ পাইবার আশায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়—ক্রমে যৌবন কাটিয়া যায় দেখিয়া অবশেষে অর্থের বা অন্য কোন প্রলোভনে বা অন্যবিধ কারণে অমনঃপূত ও চরিত্রহীন পাণিপ্রার্থীদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে নিজেদের দুঃখভার গোপন করিয়া অশান্তিময় জীবন যাপন করিতেছেন; অথবা অসহনীয় হইলে—বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় লইতেছেন। কতকাংশ বা আশায় আশায় বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া ক্রমে ভগ্নাশায়—শেষে নিরাশায়—খিটখিটে মেজাজে, ভালবাসাবর্জ্জিত জীবনে শুষ্ক হৃদয়ে আজীবন কুমারী অবস্থায় বৃদ্ধবয়সে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিয়া জীবনলীলা শেষ করিতেছেন। পাঠকবর্গ এই চিত্র বিকৃতমস্তিষ্কের কল্পনা মনে করিবেন না—অনেক সহৃদয় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর সভ্য (Member of the French Academy) ইউজিন ব্রিঁও লিখিত *Damaged Goods, Three Daughters of M. Dupaunt* পড়িলে তাহা বুঝিবেন। এইরূপে পাশ্চাত্ত্যে বহু স্ত্রীলোক তাহাদের দুই অভাবে—মাতৃত্বের সুখ এবং ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়া—বহুকাল বা চিরকাল এই দুইয়ের অপূরণে নির্য্যাতিত হয়; তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হয়—তন্নিমিত্ত তাহারা আমোদ, উত্তেজনা ও বিলাসপ্রবণ হয়। আমরা তাহাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা দেখিয়া তাহাদিগকে সুখী মনে করি; কিন্তু তাহা যে বারবনিতাদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তার মতন হৃদয়ের হাহাকার চাপা দেওয়ার চেষ্টা, তাহা দেখি না। এই অবিবাহিতা-বহুল, প্রেমহীনবিবাহিতাবহুল পাশ্চাত্ত্যেই কেবল মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীজাতি দেখা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে জীবজগতে আর কোথায়ও তো এরূপ মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ, পুরুষবিদ্বেষী স্ত্রীজাতি দেখা যায় না। ইহা যে কত ভীষণ, কত বহুদীর্ঘকালব্যাপী নির্য্যাতনের ফলে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি না।

যেখানে যৌবনকালেও পুরুষেরা আর্থিক অস্বচ্ছলতার ভয়ে স্ত্রীলোকদের প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ তুচ্ছ করে ও তাহাদের তৎকালসুলভ সর্ব্বত্যাগী ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়—সেখানে পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের রূপ ও বাহ্যগুণসম্ভোগপ্রার্থী—যেখানে স্ত্রীজাতি যৌনরোগগ্রস্ত—সেখানে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসাপ্রবণতা, যাহা তাহাদিগের জীবন সরস রাখিবার মূল উৎস বহুকাল আশ্রয়াভাবে শুকাইয়া যায়, সেখানে যে প্রকৃতির প্রতিশোধে বহু স্ত্রীলোকই বিবাহে ও মাতৃত্বে বিতৃষ্ণ ও পুরুষবিদ্বেষী হইবে, অথবা অর্থদাস পুরুষদিগকে তাহাদের বিলাসসম্ভার যোগাইবার ও কাম-উপভোগের সহায়মাত্র বিবেচনা করিবে ও পুরুষেরা অপারগ হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকে আশ্রয় করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ? পাশ্চাত্ত্য স্ত্রীলোকদের প্রতি ব্যবহার – তাহাদিগের মুখ্য অভাব মাতৃত্ব ও ভালবাসা হইতে বহুকাল বা চিরকাল বঞ্চিত করিয়া পুরুষদিগের সহিত বিষম প্রতিযোগিতার কর্ম্ম করিতে অধিকার দেওয়া—আর আহার ও পানীয় না দিয়া তাহাদিগকে বিবিধ ভূষণে সজ্জিত করিয়া রাখায় কোন প্রভেদ আছে কি না তাহা পাঠিকাবর্গ বিবেচনা করুন। পাশ্চাত্ত্যের কি অপার মহিমা ! যেমন তাহাদের বাহ্যিক চাকচিক্যময় ভেজাল মাল এদেশে প্রচলন হইয়াছে ও তাহাতে আমাদের দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও আর্থিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তেমনই তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে আপাতমনোহর অসার মতবাদ আমাদের সমাজ-সংহতি ধ্বংস হইতেছে ও তাহাতে পারিবারিক সুখ-শান্তি নষ্ট হইতেছে ও আমাদের জীবন স্ফূর্ত্তিহীন, প্রেমহীন, দুর্ব্বিষহ হইতেছে।

৮। বর্ত্তমান যুগে ভারত-নারীর কর্ত্তব্য

এই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও দেখা দিতেছে, এর প্রয়োজনবোধ কোন একজনও হিন্দুনারীর মনে উদিত হইতে পারে ? সে অপরাধের প্রধান অংশ যাহা, তোমাদের সে কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবারও যদি—এর বাকি অংশও তোমাদের যে নয় তাও বলিতে পারি না। ছেলের শরীরের সব খবর মার জানা থাকা সঙ্গত ও সম্ভবও বটে। বিবাহের অনুপযোগী দুর্ব্বল, অক্ষম, রুগ্ন ছেলের বিবাহে যাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মে মার সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করা উচিত। দৈবাৎ পুত্রের স্ত্রী-বিয়োগ হইলে তাহাকে পুনর্ব্বিবাহে প্ররোচিত করা তাঁর কর্ত্তব্য নয়। ছেলে তার অসম্মতিতে উক্ত কার্য্য করিলে, সক্ষম হইলে ঐ বিবাহের বধূকে গ্রহণ না করা—এ সকল ক্ষমতা মায়েদের থাকে ; তাঁরা তার অপব্যবহার করেন বলিয়াই বিশ্বের দরবারে তাঁদের সন্তানগণ আজ মাথা নীচু করিতে বাধ্য হইতেছে এবং প্রতিফলিতরূপে তাহা তাদের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সকল সমাজের পক্ষেই, বিশেষ করিয়া এই অভাগা ভারতবাসীদের পক্ষে তাহা কালকূটস্বরূপই প্রাণান্তকর হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই।

যিনি যতই যাই বলুন, আর যত বড় আর্টিষ্টই হউন—যত সূক্ষ্মতম আর্টের মধ্য দিয়া যত রকমের রং চং লাগাইয়াই অঙ্কিত করুন, নারীর সতীত্বের খর্ব্বতাকে কোন কিছুরই খাতিরে আপনারা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন না। ভারত-নারীর বৈশিষ্ট্য ঐখানেই এবং তাদের অধিকাংশের জন্য ঐটুকুই বাকি থাকে; ভগবানের নিকট একজন স্বজাতিবৎসল ভারত-নারীর এই ঐকান্তিকপূর্ণ কামনা বলিয়া জানিবেন। এর চেয়ে বড় ধন তার পক্ষে জগতে আর কিছুই নাই এবং থাকিলেও সে তার কাম্য নয়। পাপ-পুরুষের পাপদৃষ্টি নারীর সতীত্বের প্রতি আবহমানকাল ধরিয়াই পতিত হইয়া আসিতেছে। পৌরাণিক রাবণ, জয়দ্রথ, কীচক আজিও সশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্যষ্টিভাবে যাহা ছিল, কলির পক্ষে যেমন চতুর্গুণের ব্যবস্থা, সেই হিসাবে সমষ্টিভাবেই তাহা সমাজগত করার ব্যবস্থা চলিতেছে, এইমাত্র প্রভেদ। যুগে যুগে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব বা দেবাসুরের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, ইহা আজ নূতন নয়। কোন যুগেই ভারত-সতী দুষ্টের দুষ্ট ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেন নাই, আজও তিনি পরাভব মানিবেন না এ ভরসা আমার আছে। এর জন্য আত্মশক্তির সমাবেশে ভারত-নারীকে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে। প্ররোচনায়, প্রলোভনে, প্রতারণায় ডুবিয়া মুগ্ধ হইলে চলিবে না। কি বড় কি ছোট কোন্ পথ শ্রেয়ঃ,—কোন্ মার্গ শ্রেয়ঃ,—তাহা নচিকেতার মতই স্থির-মস্তিষ্কে বিচার করিলেই নিজের পথ নিজেই দেখিতে পাইবেন—উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের দু'চারজন মেয়ে-পুরুষের জন্য যেটুকু প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তাহারই জন্য সমাজগতভাবে কোটী কোটী নর-নারীর মধ্যে কোন হীন প্রথাকে প্রচলিত করিবার জন্য জবরদস্তি চালানো কতখানি সঙ্গত?

*　　*　　*　　*

হিন্দু পরলোকবিশ্বাসী জাতি। হিন্দুধর্ম্ম জন্মজন্মান্তরে আস্থাবান্ করিয়া তাহাদের কর্ম্মফলে দৃঢ়বিশ্বাসী করিয়াছিল। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকেই তাঁহারা জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলসম্ভূত বলিয়া ধরিয়া লইয়া আগামী জন্মে যাহাতে আর দুর্ব্বিপাক না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে ধর্ম্মাচরণে সচেষ্ট থাকাতেই জীবনের আদর্শ করিয়াছিল। সংসারের নশ্বর সুখভোগ 'যেন তেন প্রকারেণ' করিতে পাওয়াকেই তারা জীবনের সার্থকতা বোধ করিত না। বিবাহিত জীবনকে চিরপুষ্পবাসর মনে করিয়া নব নব পুষ্পবাসরের জন্য লালায়িত হয় নাই। রাজরাণী যেমন অপর্য্যাপ্তবোধে তার সুখসম্পদ্ ফেলিয়া দেয় না, নিজেরই কর্ম্মার্জ্জিত ফল মনে করে, কাঙ্গালিনীও তাহাই করিয়া থাকে। সুপুরুষ-সুশীল ঐশ্বর্য্যবানের স্ত্রী, তার স্বামীর প্রতি স্বতঃই অনুরক্ত হয়, এ দেশের মেয়েরা ইহার বিপরীতেও তাদের চেয়ে পতিপ্রাণতায় কম হইত না। মনোনিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়া তাঁরা দুঃখজয়ী হইয়াছিলেন। এ সাধনা সহজ সাধনা নহে। সংসার যখন সুখদুঃখ লইয়াই পরিচালিত—নিছক সুখের আশায় মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে বৃথা ঘুরিয়া হতাশ হওয়ায় লাভ খুব বেশী নয়, শান্তিহীনতা লাভটাই প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে। আদর্শই নামিয়া পড়ে, আনন্দটাই অধিকাংশ স্থলে মেলে না। আমি পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, এখনও বলি, য়ুরোপের সমাজ ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজের তুলনায় শিশু—শিশুত্ব যদি নাও মানিলাম, কৈশোর বা নবযৌবন বলিয়া মানিতেই হইবে; তাহা হইলে বলিতে হয়, য়ুরোপীয় সমাজ-শিশুর সবেমাত্র এই শৈশব অতিক্রান্ত হইয়া নবোদ্ভিন্ন যৌবনকাল দেখা দিয়াছে; দৃপ্ত যৌবনের সহজ চপলতা ও উদ্দীপ্ত বাসনাময় আবেগে এখনও তার সমস্ত শরীর-মন উদ্দাম হইয়া আছে। কূলবিপ্লবী ভরানদী অনবরতই তট ভাঙ্গিতেছে। তাকে দেখিয়া আজ এই অপক্ষীয়মান প্রৌঢ়সমাজ যদি তাহাকে অনুসরণ করিতে যায়, শুধু সে বাতুলতা করিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, প্রাণে মরিবে। সে যৌবনের চঞ্চলতাকে বহুদিন পূর্ব্বেই সে পরিহার করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাতে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় তার কোনই সার্থকতা

নাই ; বরঞ্চ এই সুদীর্ঘদিনের কঠোর তপস্যায় লব্ধ সমুদয় তপঃফলটাকেই দুষ্টা সরস্বতীর দ্বারা অভিভূতবুদ্ধি কুম্ভকর্ণের মত ব্যর্থ ও নিরর্থক করিয়া দেওয়া হয়। তা ছাড়া বৃদ্ধ ইচ্ছা করিলেই কি আর যুবা হইতে পারে? মহা মহা রসায়ন তাকে তার বিগত যৌবন ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয় নাই। বৃদ্ধ অভিনেতা তরুণের অংশ অভিনয় করিতে গেলে যেমন সে কৃত্রিমতা দর্শকের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে, এ ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী ফললাভ হয় না। সমাজকে সংস্কার করিতে যুগে যুগেই হইয়াছে এবং এখনও হইবে, কিন্তু সংস্কার করা স্বতন্ত্র, আর তার ভিত্তিমূল ধরিয়া টান দেওয়া এক নয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ নারীর সতীত্বের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। নারীর মাতৃত্বেরও উপরে তাঁর সতীত্বের মাহাত্ম্য এদেশে সুপরিচিত, জগন্মাতা পার্ব্বতী তাঁর পূর্ব্বশরীরের সতীরূপে পতি অবমাননায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ; আর সেই সতীদেহের উপাদানেই এই ভারতের আসমুদ্রহিমাচল পরিপূরিত, তাই এদেশে নারীধর্ম্মের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। সকল সুসভ্য সমাজেই সতীত্বের সম্মান আছে, তথাপি এদেশে ঐ ধর্ম্মই শ্বাসবায়ুর মতই স্বতঃ উৎসারিত ও অবশ্য-পালনীয় প্রধান ধর্ম্ম।

ভারত-নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও আমার মতে সেই প্রাণবায়ুবৎ অবশ্য-গ্রহণীয় সতী-ধর্ম্মকে সম্মান ও অত্যাজ্যভাবেই পালন করার দায়িত্ব সমানভাবেই বর্ত্তমান রহিল, অধিকন্তু নানাবিধ সুযোগ পাওয়াতে ভারত-নারীদের তখনকার দিনে স্বামিসঙ্গলাভ ও স্বামীর সহায়তা করার আবশ্যকতা ও সুবিধা দুই-ই সমানভাবে ঘটিতেছে. উহার সার্থকতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ কি সাংসারিক বিষয়ে কি বাহিরের কাজে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, অথবা চেষ্টা করিলে সামর্থ্য-লাভ হইতে পারে, তিনি তাহাই প্রয়োগ করুন। অভাবগ্রস্ত ঘরে সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া কুটীর-শিল্প দ্বারা কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করা, নিজে লেখাপড়া শিখিয়া ছেলেমেয়েদের প্রথম শিক্ষার ভার হাতে লওয়া, দেশের কাজে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া, স্বামীকে সুপথে পরিচালিত করিয়া আপনার জন্য যিনি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী। খেলার পুতুলের মত যথাশক্তি সচেষ্ট থাকা—এ সকলই সহধর্ম্মিণীর কাজ নয়। ইহা পরলোকের উন্নতির জন্য। আত্মসমর্পণের অর্থ আর সহধর্ম্মিণীত্বের অর্থ এক নয়। পতির শুভের জন্য সতী, সেই পতিকেই আবশ্যকস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহারই ধ্যানে জীবনাতিপাত করিয়াছেন এ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে দু'একটি নয়। অসতী যিনি নিজের প্রেমের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যান, তার সঙ্গে এ ত্যাগের তুল্যমূল্য হইতেই পারে না, সতীর কর্ত্তব্য কত সুদূরপ্রসারী, সতী মায়েরা তাহা হৃদয়ে বুঝিয়া দেখিবেন। স্বল্পদৃষ্টির সম্মুখে শুধুই প্রতিভাত হইবে,—নির্ব্বোধ, সেবাপরায়ণা, অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা বঙ্গবধূ। সতী বলিতে এখন এঁরা এই-ই বুঝেন—ভাগা!

বর্ত্তমানের দুইটি প্রধান কর্ত্তব্যের সম্বন্ধেই আমার যা বক্তব্য ছিল বলিয়াছি। **সতীত্ব ও মাতৃত্ব —এর চেয়ে বড় কর্ত্তব্য যে জগতে আর কি আছে, আমি জানি না।** একজন বিখ্যাত দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে সব মেয়েরা আমাদের মধ্যে আসিতেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা কিভাবে চলিব বলুন দেখি?" আমি তাঁকে উত্তর দিই, "ছেলে যেমন মার সঙ্গে চলে, সেইভাবে। তাঁদের ডেকে বলুন, মা যখন অসুর-শক্তি সুর শক্তিকে পরাভব করেছিল, তখন তাদের দুর্গতি নাশ করতে দুর্গারূপে এসেছিল, আজও তেমনি করে তোমাদের মহাশক্তির সমাবেশ করে সন্তানদের সম্মুখে এসে দাঁড়াও। কার সাধ্য আছে কোন কথা বলিবার?"

মা যদি সতী, সত্য-নিষ্ঠাবতী, উন্নত-চরিত্রশালিনী হন, সন্তানপালনকেই (লালন নয়) তাঁর প্রধান

কর্ম্ম মনে করিয়া সেই ভাবেই আশৈশব তাকে সৎশিক্ষা দেন, সংসার হইতে কত না, পাপতাপ দূরীভূত হইয়া যায়।

এদেশের শাস্ত্রে এবং লোকাচারে নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার বাধা ছিল না, তাহা অনেকেই জানেন। ঠিক ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে এবং পরের যে যুগ, সে যুগটি এদেশের কতকটা অন্ধকার যুগ তা ভিন্ন কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত অনেক রকম কুসংস্কার থাকিতে পারে, প্রধানতঃ হিন্দুর মেয়েরা (উচ্চ শ্রেণীরই অবশ্য) কোন যুগেই আকাট মূর্থ ছিলেন না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নাম করিতে হইলে বাছা বাছা নামগুলি লোকে সকল বিভাগেরই নমুনাস্বরূপ দিয়া থাকেন এক ধরণের অনেকগুলি নাম সংগ্রহ করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন না। ইহাতে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত সকল বিভাগেই হিন্দুনারীর শক্তি-সামর্থ্যের ও সৎশিক্ষার কোন অভাব ঘটে নাই। যাহাতে জ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত, কর্ত্তব্যবোধ পরিমার্জ্জিত, দূরদর্শন ও নীতিচরিত্র গঠিত, ত্যাগ-সংযম চারিত্রিক দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয়, এ শিক্ষার তাঁদের কোনদিনই অভাব ছিল না। শিল্প, সাহিত্য, আতিথেয়তা বা সামাজিকতা যে-কিছু শিক্ষার অঙ্গ বা শিক্ষাসাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল সে সকলই প্রচুরতররূপে তাঁদের ভিতর বর্ত্তমান ছিল।

এদেশের মেয়েরা সকল যুগেই, এমন কি, ঘোরতর বিপ্লবময় জাতীয় দুর্দ্দিনে কূলগৌরব ও আত্মসম্মান রক্ষাপূর্ব্বক রাজ্যশাসন, জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের কর্ত্তৃত্ব--কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। অহল্যাবাঈ, ঝান্সির রাণী খুব বেশী দিনের নয়, অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর দূরপ্রসারী সূক্ষ্মদৃষ্টি যে অনেকানেক কূটরাজনীতিবেত্তার অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল, তাহা বাংলার ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের অজ্ঞাত নয়। বর্ত্তমানের এই যুগটিকে যদি অন্ধ তামসযুগ বলা যায়, খুব বেশী অত্যুক্তি করা হয় না। মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ খাড়া হইয়া উঠিতেছে বটে কিন্তু আসলে আমরা নীচের দিকেই নামিয়া চলিয়াছি। ভারতের শিক্ষা, সাধনা প্রবৃত্তিমূলক নয়, আমরা তার সেই মর্ম্মকথা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি বলিয়াই যত কিছু অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছি। যাত্রাগান এবং কতকথার দ্বারায় সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষা শুধু প্রাথমিক অক্ষর-পরিচয়ই নহে, নীতিধর্ম্ম পুরাণাদির প্রচারে এদেশের অতি নিম্নস্তরের মধ্যেও যেমন উচ্চাঙ্গের নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। পল্লীজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয়ই আজ ইন্দ্রজালবৎ অদৃশ্য হইয়াছে এবং তার স্থানে পড়িয়া আছে সমাজবন্ধনের বাহিরে সহরের ঠাসাঠাসির দায়িত্বহীন শিক্ষাসম্পদশূন্য অসার জীবনযাত্রা।

আমাদের আবার সেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্ত্তব্য ত করিবেনই, প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরও যাহাতে ঐভাবে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তার উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আপনাদের সমিতিতে এবং এইরূপ বহুতর নারীসমিতি সংগঠিত করিয়া সম্মিলিতভাবে এই সকল অবশ্যকরণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং ইহার মধ্যে মধ্যে সুচিন্তিত প্রবন্ধপাঠ অত্যাবশ্যক। ছেলেমেয়ে দুজনকেই সমান শিক্ষাদান করিতে যেন দ্বিধা করিবেন না। অবশ্য শিক্ষার বিষয় বিভিন্ন থাকুক, কিন্তু মেয়েদের যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে ছেলেদেরও সঙ্গে সমান অধিকার আছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের নারীদের ত উচ্চাধিকার ছিলই, মনু বলিয়াছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ'। উচ্চাঙ্গের জ্ঞানসমাবেশে যে এই সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গনারীদের অধিকার নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, তাহার প্রমাণের জন্য মিলাইয়া দেখুন দেখি

ভারতের নারী

আপনার শৈশবে দৃষ্টা বা যৌবনে পরিচিতা, অথবা আজিও বর্ত্তমানা পিতামহীর সহিত আপনার পৌত্রীটিকে। দু'চারটি সেমিজ, পেটিকোট, ব্লাউজ ও জুতা-মোজা পরিয়া, একতাড়া বইখাতার বোঝা বহিয়া সে কি তাঁর চেয়ে উন্নতহৃদয়া, উদারচিত্তবৃত্তিশালিনী ও ত্যাগপূত-চরিত্রসম্পন্না হইতে পারিয়াছে? স্কুলের শিক্ষা ছেলে-মেয়েকে দিতে হইবে দিন, কিন্তু আসল শিক্ষাই গৃহশিক্ষা। গৃহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলেমেয়েদের মা; মা নিজে শিখিয়া তাদের মানুষ হইতে শেখান। তাদের শেখান স্বদেশকে ভালবাসিতে, স্বধর্ম্মকে শ্বাসবায়ুর মতই গ্রহণ করিতে, স্বজাতিকে দেহের শোণিতবিন্দুর মতই প্রিয় ভাবিতে। তাদের শেখান—ত্যাগের ধর্ম্ম, সংযমের ধর্ম্মই বীরের ধর্ম্ম - মহতের ধর্ম্ম - ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম।

অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা বা ভোগস্পৃহাই জগতের প্রার্থিত বস্তু নয়, ত্যাগের বস্তু। সদাচার-পালন, স্বধর্ম্মের সেবা, শাস্ত্রার্থবোধের ইচ্ছা ও চেষ্টা—এ সকল প্রবৃত্তিও তাদের মনের ভিতর জাগ্রত করা মায়ের কর্ত্তব্য। অর্থাৎ হিন্দু মাকে তার সন্তানের ইহ-পরলোকের মঙ্গলবিধায়িনী হইতে হইবে। শুধু সাংসারিকতার প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মাতৃকর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে প্রতিপালিত হইবে না। এইভাবে যদি গৃহশিক্ষারূপ বাঁধনকষণ-প্রাপ্তি ঘটে, তবে পশ্চিমতটের ঢেউ যত বড় প্রবল হোক, পূর্ব্বতটের ক্ষয় তত সাংঘাতিক হইতে পারে না।

মায়েরা! আমাদের মধ্যে যাঁরা শাশুড়ী আছেন নিজ নিজ পুত্রবধূকে কন্যাস্থানীয়া করিয়া লইতে তাকেও যথাসাধ্য বিদ্যাশিক্ষা দিন, নৈতিক শিক্ষায় পূর্ণ দৃষ্টি রাখুন। স্নেহ দিয়া যত্ন দিয়া কুশিক্ষা থাকিলে তাহা শুধরাইয়া লউন। বধূ বলিয়া সে একটি স্বতন্ত্র জীব নয়, বরঞ্চ সে একটি জীব-জননী। ঐ গৃহলক্ষ্মী কল্যাণীর দ্বারায় একটি নূতন জগতের সৃষ্টি হইবে, এই মস্ত বড় কথাটিকে এক মুহূর্ত্ত ভুলিলে চলিবে না। ভুলিলে চলিবে না কার?—আপনার নিজের। আপনার শ্বশুরের ভাবী বংশ, তাঁদের স্বর্গ বা নরকবাস নির্ভর করিয়া আছে, ঐ বধূরূপিণী প্রাণীটির শিক্ষা[illegible]র উপরে 'আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুত'। আকর যদি ভাল হয়, পদ্মরাগমণিরই উদ্ভব হইয়া থাকে। কাচ কোথা হতে আসিবে? মা-বাপের পরিচয় সন্তানের মধ্য দিয়াই প্রধানতঃ পাওয়া যায়, ইহাই স্বাভাবিক। মহাত্মা ভূদেব লিখিয়াছেন, "ইহৈব নরকঃ স্বর্গ' এই কথাটি খুব ঠিক, আমাদের উত্তরপুরুষই আমাদের স্বর্গ ও নরক। যিনি যেমন সন্তান উৎপাদন করেন, জগতে তাঁর যশ বা অপযশ সেই অনুযায়ীই থাকিয়া যায়। অতএব কেবলমাত্র আজিকার দিনের বধূধর্ম্মই তাঁর প্রধান ধর্ম্ম হইতে পারে না। তিনিই ধার্ম্মিকা, নীতি-জ্ঞানশালিনী, বিদ্যাবতী, গৃহকর্ম্মাদিতে সুদক্ষ এবং শরীর ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের দ্বারা, সংক্রামক রোগাদি হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থা, এমনই গুণবতী হইলে তবেই আপনাদের পুন্নাম নরকত্রাণের জন্য পুত্ররূপী ভগবান্‌কে গৃহে আনিবার যোগ্যতালাভে সমর্থা হইবেন, এই বুঝিয়া তাঁকে সেই মতই গঠিত করিয়া নিন। আর অন্য ঘরের জন্য তেমনিভাবে তৈরী করে তুলুন আপনার ঘরের মেয়েগুলিকে। ভারত-নারীর বর্ত্তমানে এর চাইতে বড় কর্ত্তব্য আর কিছু আছে কিনা আমি জানি না। যদি থাকে, যারা সে পথের যাত্রী তাঁদের ডেকে, আপনারা যদি আপনাদের মন লাগে শুনে নেবেন। তবে একটি কথা আমি বিশেষ জোর দিয়েই বলবো, যিনি যতই বলুন সতীর একনিষ্ঠ প্রেম এবং তারই যে সুমহৎ আদর্শ—এর চাইতে বড় ও কল্যাণকর কোন কিছুই সংসারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। বিবাহের উদ্দেশ্যটা কেবলমাত্রই দেহসুখের জন্য নয়, তাহলে পৃথিবী হইতে এতদিন বিবাহ সংস্কারটা উঠিয়া যাইত এবং আজকালকার দিনে যাঁরা কল্পনার

রাজ্যে খুব জমকালো আসন পাতিয়া বসিতে অধিকার পাইয়াছে, সংসারের সমুদয় আসনগুলির অধিকার তাদের হাতে আসিয়া পড়িত। বিবাহে পতিপত্নীর একাত্মতার অঙ্গীকার, পুরুষদের দিক দিয়া কতক স্থলে ভঙ্গ হয় বলিয়াই যে তার প্রতিশোধে নিজ নিজ নাসিকা কর্ত্তন করিতে হইবে, তার প্রয়োজন নাই। যারা সতীধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তাদের কথা কানে শুনিলে গায়ে জ্বালা ধরিতে পারে বটে, তবে কান না দিলেও চলে, এতই ওটা অবান্তর কথা। যেদিন সংসার হইতে নারীর সতীত্ব বিলুপ্ত হইবে, সেদিন জানিবেন পৃথিবীরও ধ্বংসকাল সমুপস্থিত। মানুষ সেদিন পশুত্বে পশ্চাদা-বর্ত্তন করিতেছে জানা যাইবে। তবে সে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, কোন দিনও তেমন দুর্দ্দিন আসিবে না।

৯। নারীর স্থান—অতীতে ও বর্ত্তমানে

সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে অতীত আলোচনা অপরিহার্য্য। অধুনা আমাদের শিক্ষিতা মহিলাগণ একটি রব তুলিয়াছেন—"অতীত যুগে নারী পুরুষের সহিত সমানাধিকার প্রাপ্ত হইতেন; তাহা হইলে এ-যুগে তাহা সম্ভব হইবে না কেন?"

অতীত আলোচনায় আমরা যেন এইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করি যে, আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল নরনারী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আমাদের কতকটা থাকিতে পারে; আলোচ্য বিষয় তাহা হইলে অনেকটা সহজ হইবে।

বিগত যুগে হিন্দুসমাজ নারীকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে; যথা—১। পদ্মিনী, ২। চিত্রাণী, ৩। শঙ্খিনী, ৪। হস্তিনী। ইহা আকৃতিগত শ্রেণী। বর্ত্তমান যুগে আকৃতি-শ্রেণীবিভাগ প্রায় উপেক্ষিত হইয়াছে, সে স্থানে আকারগত তারতম্য সত্য হইলেও সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য নহে। নারীর প্রকৃতিগত গুণাগুণেই তাহার যথার্থ শ্রেণীবিভাগ সম্ভব। মানবজীবনে নারীর প্রভাব অসাধারণ; ভারতের কবিগুরুগণ তাঁহাদের অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা নারীর সর্ব্ববিষয় নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা—১। স্বীয়া, ২। পরকীয়া ও ৩। সামান্যা।

স্বীয়া তিন প্রকার - ১। মুগ্ধা, ২। মধ্যা ও ৩। প্রগল্ভা। ইহাদের মধ্যে মুগ্ধার তুলনা নাই। মুগ্ধা-নারী পুরুষের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলা হইয়া থাকেন। মধুরভাষিণী, উৎফুল্লহৃদয়া, সংযতমনা এই জাতীয় নারী গৃহে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী বলিয়া আখ্যাত হন। ইঁহাদের দেখিলে স্বয়ং শান্তি বলিয়া প্রতীত হয়; ইঁহারাই নারীত্বের পূর্ণপ্রতীক।

মধ্যা-চরিত্র অনেকটা পুরুষভাবাপন্না। ইহারা অল্প ক্রোধশীলা, অস্থির, বান্ধবী-সংসর্গ-কামিনী, কলহ-প্রিয়া এবং বাচাল। এই জাতীয় স্ত্রীলোক পৌরুষশালী পুরুষকে ঘৃণা করেন। বরং নারী-ভাবাপন্ন পুরুষদের প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন। মুগ্ধার চরিত্র ঠিক বিপরীত। তাঁহারা তেজস্বী পুরুষকে সমধিক পছন্দ করেন।

আত্মনির্ভরশীল এবং উদ্যোগী পুরুষ, নারীমাত্রেরই কাম্য, কিন্তু অনাবশ্যক উগ্রভাবশালিনী স্বাধীনমতাবলম্বিনী নারী পুরুষ মাত্রেরই কাম্য নহে। তেজস্বী পুরুষ মুগ্ধার অত্যন্ত অনুরাগী হয় এবং অধিকসংখ্যক পুরুষই শান্তস্বভাবা নারীর অনুরাগী হয়।

প্রগলভা প্রায় পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে না। ইহারা কঠিন-হৃদয়া, কর্কশভাষিণী, বহুভাষিণী এবং পুরুষের প্রতিকুলচারিণী। ইহাদের কল্যাণে সমাজকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মধ্যা এবং প্রগলভা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া (ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা) আধুনিকার ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন; সে যুগেও প্রগতিকামীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।......

অতঃপর পরকীয়া। রসসৃষ্টিতে স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়ার প্রাধান্য অনেক অধিক, যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজ-রক্ষাকল্পে স্বকীয়ার আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরকীয়া দুইপ্রকার—১। পরোঢ়া ও ২। কন্যকা। ইহাদের আবার তিন প্রকারভেদ আছে—১। গুপ্তা, ২। বিদগ্ধা ও ৩। লক্ষিতা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে পরকীয়া দুই প্রকার—১। প্রখ্যাতা ও ২। প্রচ্ছন্না। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাকে এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত করেন নাই। কারণ, বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, "যেমন অবিবাহিতা কন্যা ভার্য্যা হইতে পারে, সেই মত পুনর্ভু ভার্য্যা হইতে পারে। পুনর্ভু দুই প্রকার—১। অক্ষতযোনি ও ২। ক্ষতযোনি। অক্ষতযোনি পুনর্ভু সংস্কারার্হ বলিয়া কন্যকার মধ্যে অন্তর্ভুক্তা।" টীকাকার বশিষ্ঠস্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন যে, অপূর্ব্বা বা পৌনর্ভবা স্ত্রী সপ্তবিধ—বাগ্‌দত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুক-মঙ্গলা (মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দ্বারা আদান-প্রদান-নিষ্পাদিতা), উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা এবং অগ্নিপরিগতা ও পুনর্ভুপ্রভবা। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুইটী অক্ষতযোনি ও শেষোক্ত কয়টী ক্ষতযোনি পুনর্ভু। কামী পুরুষের পক্ষে আত্মদানেচ্ছু বিধবা পুনর্ভু বিবাহে কোন সামাজিক বা রাজকীয় বিধানও ছিল না, নিষেধও ছিল না। তবে উহা কখনই ধর্ম্মতঃ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইত না। উক্ত সপ্ত পৌনর্ভব-কন্যা বিবাহ ধার্ম্মিকের পক্ষে সর্ব্বদা ত্যাজ্য ছিল। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ঘটিলে কোন রাজদণ্ড হইত না।

সুতরাং শাস্ত্রমতে ক্ষতযোনি পুনর্ভু কিন্তু পরকীয়া নহে। সমাজে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও কাব্যে সাতশতবর্ষব্যাপী স্বকীয়া প্রাধান্যের জন্যই কুন্দ-রোহিণী বা সাবিত্রী-কিরণময়ীকে পুনর্ভু জানিলেও স্বকীয়া বলিতে পারা যায় নাই। সমাজের রূঢ় শাসনে তাহাদের পরকীয়াই বলিতে হইয়াছে।

পরোঢ়ার ও কন্যকার মধ্যে কবিকুল কন্যকার স্থান সর্ব্বাগ্রে দান করিয়াছেন। কারণ, রুচি এবং সমাজের শুদ্ধতা রক্ষা কল্পে কন্যকার বিবাহের পথ থাকে, পরোঢ়ার তাহা থাকে না।

উদ্বাহ-তত্ত্ব মানবসমাজের মূল বন্ধন-রজ্জু। যে যুগে বিবাহপ্রথা ছিল না, সে সময়ে পুরুষ বলপূর্ব্বক নারী হরণ করিত। নারীর ইচ্ছার কোনই মূল্য ছিল না। প্রাচীন ভারতে ঋষিগণ স্ত্রী-মাত্রেরই সকলের ব্যবহার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। তৎপরে অগম্যবাদ (Incest) প্রচলিত হইলে বিবাহপ্রথা আরম্ভ হয়। বিবাহপ্রথাই নারী-পুরুষের যৌনলালসার প্রতিবন্ধক। পুরুষের পরকীয়া-প্রীতির জন্য, পরস্পর নারী লইয়া হিংসাবিরতির জন্য দেশে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নারীর মনে সতীত্ব বা Chastity-র উদয় হয়; ব্রাহ্মণজাতি সমাজরক্ষার জন্য প্রাণপণে সহস্র বৎসর ধরিয়া এই পরকীয়াবাদ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সফলও হইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে সাহিত্যশিল্পিগণ সেই অস্থিমজ্জাগত

আদর্শের নাশ-কামনায় বদ্ধপরিকর। তাই "নষ্টনীড়" এবং "নৌকাডুবি" অথবা "শেষ প্রশ্ন" এর অবতারণা। পরকীয়া প্রেম নহিলে প্রেমই নহে এবং সামান্যা বা বেশ্যা এ যুগে নায়িকা শ্রেষ্ঠ।

শাস্ত্রমতে সামান্যা তিন প্রকার—১। বক্রোক্তি-গর্ব্বিতা, ২। অন্যসম্ভোগ-দুঃখিতা ও ৩। মানবতী। বৈশিকতার বাহুল্যে ইহারা বেশ্যা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, বেশপ্রিয়তাই বেশ্যা শব্দের মূল। নায়িকামাত্রেই অবস্থাভেদে অষ্টধা বিভক্ত হইয়া থাকে—১। প্রোষিতভর্ত্তৃকা, ২। খণ্ডিতা, ৩। উৎকণ্ঠিতা, ৪। কলহান্তরিতা, ৫। বিপ্রলব্ধা, ৬। বাসকসজ্জা, ৭। স্বাধীনপতিকা, ৮। অভিসারিকা।

এখন হইতে এই ত্রিবিধ নারীকে প্রাচীন হিন্দুগণ কোথায় স্থান দিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করা প্রয়োজন। বৈদিকযুগের ঋষি কর্ত্তৃক নারীস্তুতি গীত হইয়াছে। বিশ্ববারা, ঘোষা, রোমসার পুরুষোচিত সম্মানলাভ ঘটিয়াছে ; দেখা যায়—তাঁহাদের দার্শনিক গবেষণায় মহর্ষিগণ চমকিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, নারীই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা, "বাক্' স্বীয় আত্মাকে বিশ্বশক্তি জ্ঞানে যে স্তুতি লিখিয়াছেন, তাহাই "দেবীসূক্ত' নামে বিখ্যাত। একত্র যজ্ঞকার্য্যরত পতিপত্নীকে বেদ "দম্পতি" বলিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যজমান যজ্ঞের কুশগ্রন্থি স্বামীর অঙ্গুষ্ঠ হইতে পত্নীই মোচন করিবেন। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বৈদিকযুগে রমণীর অবাধ স্বাধীনতা এবং তৎপরিমাণ সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা ছিল।

পরবর্ত্তী আরণ্যক ও উপনিষদ যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদিও ঐ সময়ে বাচক্লীব ব্রহ্মবাদিনী গার্গীকে "ব্রহ্মিষ্ঠ" যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচার করিতে দেখা যায়, তথাপি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বলিতেছেন,—যে স্ত্রীর যজ্ঞে অধিকার আছে, তিনি পত্নী ; অথবা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে যিনি মুখ্যা, তিনিই পত্নী। স্ত্রীগণ মেখলা দ্বারা কটি সজ্জিত করিতেন যজ্ঞকল্পে। কিন্তু তৎপরেই কন্যাকে "কৃপণং" (দুঃখ করেন) বলিয়া সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—"যে স্ত্রীর যজ্ঞের অধিকার নাই তিনি জায়া।" সূত্রগ্রন্থে তাহার নাম "দারা" লিখিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বৈদিকযুগে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয়, তাহার অব্যবহিত পরেই কোন কারণে সে অধিকার বহু ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।

অতঃপর সূত্রযুগ। পত্নী-সাহায্যে যজ্ঞকার্য্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়। অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র—রমণীর বিদ্যা সমর্পণ করেন, নিত্য ঘরোয়া গৃহযজ্ঞে বিবাহিতা স্ত্রীকে অধিকার প্রদান করেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শ্রৌতযজ্ঞে সে অধিকার লুপ্ত করেন। গোভিল গৃহ্যসূত্র —স্ত্রীর প্রাতে বা সন্ধ্যায় গৃহে নিত্য-রক্ষণীয় অগ্নিতে আহুতির অনুমোদন করেন। বৌধায়ন গৃহ্যসূত্র - অত্যন্ত রুক্ষভাবে নারীর বেদে অনধিকার ঘোষিত করেন। নারীর বেদচর্চ্চায় কোন সুযোগ আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই।

দর্শনযুগে জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা দাবী করেন—"স্ত্রী-পুরুষ যখন সমান স্বর্গ কামনা করে, তখন সমান কার্য্যে অধিকারী। অধিকাংশ স্থানেই ইহার বিরুদ্ধ মত দেখা যায়।

স্মৃতিযুগে নারীর বিদ্যানুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কুমারীগণের সাবিত্রী (গায়ত্রী) বলা অভ্যাস ছিল। স্মৃতি বলিয়াছেন—পিতামাত্রেই পুত্রের ন্যায় কন্যাকে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করাইয়া বিবাহ দান করিবেন।

শাস্ত্রে অনভিজ্ঞার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, সুতরাং কন্যার বিবাহকাল দশ বৎসরেরও অধিক—ইহা বুঝা যায়, যেহেতু দশ বৎসরের নিম্নবয়স্কা মাত্রেই ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। যমসংহিতা বলিয়াছেন - "পুরাকল্পে হি নারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে"—অর্থাৎ কলির পূর্ব্বে কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধনে বেদানুশীলনে অধিকার ছিল। গৃহ্যসূত্রের কৃপায় অগ্নিহোত্রে নারী যে অধিকারলাভে সমর্থ হন, স্মৃতি যুগে মহর্ষি মনু বৌধায়ন অনুসরণে ধর্ম্মে কর্ম্মে নারীর সমস্ত অধিকার লুপ্ত করিয়া বলেন—"বিবাহ মহিলাগণের উপনয়ন, তদ্ভিন্ন পৃথক্ সংস্কার তাঁহাদের নাই।' পরিশেষে বলেন—"রমণীর স্বভাবই দুষ্ট, প্রয়োজন হইলে তাহাকে রজ্জু দ্বারা অথবা কোমল বেত্রদণ্ড দ্বারা তাড়না করাও ভাল।"—ইহা হইতে বুঝা যায়, ততদুর স্ত্রী-স্বাধীনতা সে যুগেও ঘটে নাই।

আর্য্যসমাজের শেষ যুগে দ্রৌপদীর বাক্‌পটুতা, সীতার বিদায়-সম্ভাষণ বা পিঙ্গলা-রচিত শ্লোকে রাজা সেনজিতের সান্ত্বনা লাভ দেখিলে বুঝা যায় যে, তখন নারীর স্বাধীনরূঢ় মনোভাব তিরোহিত হওয়ায় পুরুষের সহিত তাঁহারা অনেকটা সমতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগে উপাধ্যায়ী ও বাভুচির (ছাত্রী) সংখ্যা দেখিলে স্ত্রীশিক্ষার ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধমহিলা "ধর্ম্মদিনা" তত্ত্বজ্ঞানে উপনিষদের মৈত্রেয়ীতুল্যা ছিলেন। বিম্বিসারের পুরোহিতকন্যা "থেরী সোমা" শিক্ষাধর্ম্মে সাধারণের অনুকরণীয়া ছিলেন। রাজমহিষী "ক্ষেমা", রাজগৃহের বণিক্‌-দুহিতা অনুপমা, সুজাতা, বিশাখা, যশোধরা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি নারীর জাতক-সাহিত্যে যে প্রকার স্তুতি হইয়াছে তাহা আনন্দদায়ক। কিন্তু মেগাস্থিনিস বলেন তখন রমণীগণের উচ্চশিক্ষায় ভারত মনোযোগী ছিল না। বৌদ্ধভিক্ষুগণও অনেক পরীক্ষার পর রমণীকে অরক্ষণীয়া, সাধারণভোগ্যা এবং মোক্ষলাভের অন্তরায় বলিয়াছেন। অনেকে বলিতে পারে যে, সংসারবিরাগীমাত্রেই নারী-দ্বেষী হয়। কিন্তু তাহা হইলে, সেই যুগে গণিকা অম্বপালীকে ভিক্ষুগণই অর্হত্ব দান করেন কি করিয়া? স্বামী-স্ত্রীর অধিকারে দেখা যায় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী রাজ্যপালন করিয়াছেন। যেমন রাজা উদয়নের বৈমাত্রেয় ভগ্নী অথবা স্ত্রী রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যপালন করেন। বিবাহের পাত্র-পাত্রীও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পৌরাণিক যুগে তীব্রভাবে নারীর উপনয়নাদি অস্বীকার করা হইয়াছে। ভাগবতে (১০, ২৩, ২৪) বেদপাঠ ত দূরের কথা শুনিবারও আযোগ্যা বলিয়া বিবেচিতা হইয়াছে। এই যুগে নারীর অবনতি অত্যন্ত দ্রুতভাবে অগ্রসর হয়।

কাব্যযুগে কালিদাসপ্রমুখ কবিগণ সাহিত্যের মধ্যে নারীকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, শিক্ষা-নৃত্য-গীতাদি শিল্পমণ্ডিত করিয়া নারীর পদে লুণ্ঠিত হইয়াছেন। উত্তররামচরিতে আর্য্যা আত্রেয়ীর বেদপাঠের অভিলাষে নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস পাওয়া যায়। কবি রাজশেখর স্বীয় স্ত্রী অবন্তিসুন্দরীর অভিমত সসম্ভ্রমে ব্যক্তকালীন যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কবিযোগ্য এবং পুরুষোচিত। খনা, লীলাবতী, উভয়ভারতীর বিদ্যাবুদ্ধিমত্তা গর্ব্বের বটে, কিন্তু অপ্রামাণ্য। যেহেতু বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নের সভায় নারীর স্থান নাই। এমনও হইতে পারে যে, তাঁহারা কুলবধূ বলিয়া যশঃপ্রার্থিনী হইয়া সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত হন নাই।

ভাষ্যযুগে নারীর একবার পতন হয়। নারীর সর্ব্ববিধ গুণও সম্ভবতঃ এই সময়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শবর স্বামী-ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অতুল্যা স্ত্রী পুংসা,—স্ত্রী চ অবিদ্যা চ'—অর্থাৎ নারীমাত্রেই অবিদ্যা।

তান্ত্রিকযুগে নারীপূজার পুনঃপ্রবর্ত্তন হয়। নারীকে শক্তি বলিয়া স্তব করা হয়। এমন কি

আত্মাভিমানী পুরুষ নারীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সম্ভবতঃ এই সময়ে পুরুষ আপনাপন সদ্‌গুণ হারাইয়া ফেলিয়া নারী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি হইয়া পড়ে। আপনার আত্মবিশ্বাস, সৎ-চেতনার কোন সন্ধান না পাইয়া পুরুষ আত্মজগতেও নারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বৈষ্ণবগণও "রাধা নামে বাজায় বাঁশী।"

বর্ত্তমান একাকার যুগে নারীর স্থান কোথায় বলা শক্ত। এই দেখা গেল শুদ্ধাচারিণী স্বদেশবৎসলা সতী-শিরোমণি; কিছুদিন পরে তাহাকেই চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মুখাত্তমা শুনিতে পাওয়া যায়। এ হেন বর্ত্তমানযুগে নারী-প্রগতির যে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে, অথবা পুরুষমাত্রেই যে প্রকার নারীর দরদী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভারত-রমণী অতীত সম্মানের এক কপর্দ্দকও অর্জ্জন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানযুগে নারী উর্দ্ধমুখে আকাশ-কুসুম দেখিতে (স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম) ক্রমশঃ যে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বুঝিবার মত অবসর এখনও আছে। বিলাতের মন্ত্রিসভার বা ব্যাবস্থাপক সভার সভ্য হইবার অথবা লেডী জজ-ব্যারিষ্টার হইবার উপর যদি নারীর সম্মান নির্ভর করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আজ ভারতবাসী নিজেকে হিন্দু বলিবার কতটুকু স্পর্দ্ধা রাখে।

১০। ভারতের নারীত্বের আদর্শ

ভারতের নারীত্বের আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়া কেহই উচ্ছ্বসিত না হইয়া পারেন না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের পুরাণে, ইতিহাসে, নাটকে, পল্লীগাথায় ও কিংবদন্তীতে ভারতীয় নারীর যে মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কেবল ভারতবাসী নয়, মহিমা মহত্ত্বের ধারণা যাহারা করিতে পারে তাহারা সকলেই এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়। বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, জগতের কারখানায় জাতিগত অনেক আদর্শের ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, কিন্তু যুগান্তের বহু বিপ্লবের মধ্যেও এই আদর্শগুলি অম্লান দীপ্তিতে শোভা পাইতেছে—কেবল আদর্শ হিসাবে শোভা পাইতেছে নয়, ভারতবাসীর জীবনে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া এখনও—এই যুগ-সন্ধিক্ষণেও তাহার কর্ম্মজীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ভারতের নারীর আদর্শ সতী—যিনি পিতার মুখে পতিনিন্দা-শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ভারতের নারীর আদর্শ সীতা—যিনি সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত অশেষ দুঃখকষ্ট নীরবে নতশিরে বহন করিয়াছেন, অথচ একদিনের জন্য যাঁহার স্বামী-অনুরাগ ম্লান হয় নাই। ভারতের নারীর আদর্শ সাবিত্রী—যাঁহার প্রবল অনুরাগ মৃতস্বামীকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। মৃত স্বামীর কঙ্কাল কয়টি বুকে লইয়া গাঙুড়ের স্রোতে যিনি ভেলায় ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, সেই বেহুলা আমাদের দেশের নারীর আদর্শ। ভারতীয় নারীর প্রবল স্বামী-অনুরাগ, আত্মত্যাগ স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ সত্তার বিলোপসাধন ভারতীয় নারীগণের এতই মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল যে, অধিক দিনের কথা নয়, স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার চিতায় নারীর সুখসাধই কেবল পুড়িয়া ছাই হইত না, তাঁহার পার্থিব দেহও ভস্মীভূত হইত। যাঁহারা

স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মদান ও বীরত্ব ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবার সামগ্রী।

ভারতবর্ষে আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আখ্যা দেওয়া হয়। গৃহধর্ম্মচারিণী নারী এই গার্হস্থ্যাশ্রমের কেন্দ্রগত শক্তি। গৃহে নারীর সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের পরিচয় জননী ও জায়া। নারীত্বের চরম পরিণতি মাতৃত্বে—ভারতবর্ষে এই আদর্শই এতকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুগের নারীপ্রগতির প্রচুর ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও সাধারণের মন হইতে এই আদর্শ একেবারে বাতিল হইয়া যায় নাই। বর্ত্তমান যুগের নারী-প্রগতির অন্তরালে যে আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সাম্যের আদর্শ—স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা। নারী আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। অথচ আমাদের দেশে নারী আত্ম-প্রতিষ্ঠা চাহে নাই, বরং সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিলোপ করিতে চাহিয়াছিল। এই আদর্শের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর অনেক দেশেই অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে এবং বাহিরের এই বিপ্লবতরঙ্গ ভারতবর্ষকেও যে একেবারে আঘাত করে নাই, একথা বলিলে ভুল হইবে। নারীর আদর্শ কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কথা বলিবার সকলেরই সমান অধিকার আছে; কারণ ইহা মাত্র বুদ্ধিজীবীর কূটতর্কের বিষয় নয়, ইহার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে জড়িত আছে প্রত্যেকের জীবনের সুখদুঃখ, ধর্ম্মকর্ম্ম।

ইংরাজী সভ্যতার প্রথম আমলে রাজা রামমোহন রায় একটী নূতন ধর্ম্মভাবের বিপ্লবই শুধু আনিবার চেষ্টা করেন নাই, সামাজিক আদর্শের পরিবর্ত্তনের বীজও তিনি বপন করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়সাধন চেষ্টার নামে সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে আমরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছি। কোন যুগেই ভারত-রমণী আধুনিক পাশ্চাত্য মহিলার মত অবাধ বিচরণশীলা ছিলেন না, আবার অসূর্য্যম্পশ্যাও ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায় না। ইস্‌লাম সভ্যতার প্রভাবে নারী অধিকতর অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছে এ কথা মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। রাজপুতনায় মুসলমানপ্রভাব অধিক হইয়াছিল সেইজন্য সেখানে পর্দ্দানশীনতা বেশী; আবার মহারাষ্ট্রে ইস্‌লামের প্রভাব বেশী না হওয়ায় সেখানকার নারীগণের মধ্যে পর্দ্দার কড়াকড়ি নাই। প্রাচীন ভারতে রমণীবৃন্দ অবাধবিচরণশীলা না হইলেও বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছেদও ছিল না। সভামধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত গার্গী যেরূপ বিচার করিয়াছিলেন, অতিথি দুষ্মন্তের সহিত অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যেভাবে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই মধ্যযুগের কোন ভারত-মহিলার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার সহিত সংঘাতে ভারতের সামাজিক আদর্শ বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে সকল ভারত-মহিলা নানা যুগে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন, তাঁহারা নানা কারণে ভাবের উৎকর্ষ দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সংযুক্তা, পদ্মিনী ইহারা পাতিব্রত্যের জন্য, আত্মত্যাগ ও ধীরতার জন্য নমস্যা। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মীরাবাঈ তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির জন্য, দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈ তাঁহাদের বীরত্ব ও তেজস্বিতার জন্য, রাণী অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী দানশীলতার জন্য সকলের মাতৃস্থানীয়া হইয়া শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের সকল ভারত-রমণীই পতিব্রতা, সেবাপরায়ণা, উদারহৃদয়া, জননী, জায়া ও ভগ্নিরূপে পুরুষের কর্ম্মপ্রেরণাকে উদ্দীপিত করিয়াছেন এবং এই সকল গুণই আদর্শরূপে সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। নীতি, সংযম ও সেবার প্রতীকরূপে নারী ভারতের প্রতি গৃহে শুচিসুন্দর ভাব বিস্তৃত করিয়াছে।

আজ যুগ সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নারীর জীবন গৃহস্থালীর সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিবে—না সমাজের প্রত্যেকটী কার্য্য-ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত হইবে ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। সমস্ত জগতে যে নারী-আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রভাব হইতে ভারতবর্ষের মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে থাকা সম্ভবপর নয়, এ প্রবৃত্তি হয়ত প্রশংসনীয়ও নয়। জাতির জীবনগঠনে নারীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু গৃহে থাকিয়া সে যদি স্বামিপুত্রের কর্ম্মপ্রেরণাকে উচ্চ ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারে, তবে বাহিরে আসিলেই কি তাহা পারিবে? পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেই কি মঙ্গল হইবে? আর নারীকে পুরোভাগে রাখিয়া যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি পুরুষের পক্ষে কি যোগ্যতারই পরিচায়ক?

যথার্থ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, বহুকালের প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন হয় ধীরে, সকলের অজ্ঞাতসারে। তাহার জন্ম প্রচার ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা স্বাভাবিক, পরানুকরণে যে পরিবর্ত্তন জোর করিয়া আনিবার চেষ্টা করা হয় তাহা অস্বাভাবিক। আধুনিক ও প্রগতিবাদী বলিয়া পরিচিত হইবার মোহ আমাদের একটু অত্যধিক পরিমাণেই আছে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে মাতৃত্ব বা পত্নীত্ব ছাড়াও নারীত্ব বলিয়া একটা ব্যাপকতর ভাবের পরিচয় আমাদের বর্ত্তমান নাটক-উপন্যাস হইতে লাভ করিতেছি। এক্ষেত্রে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্ত বর্ব্বরতার লক্ষণ। কিন্তু একথা নির্ভয়ে বলা উচিত যে, ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতার বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে আধুনিক বিশ্বজনীন আদর্শেরও যদি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন হয়, তাহার জন্য যেন আমাদের মন প্রস্তুত থাকে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভারতীয় নারীর বাহিরের কাজে-কর্ম্মে-বেশভূষায় পরিবর্ত্তন আসিয়াছে; কিন্তু এই সমস্ত তুচ্ছ বাহ্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও ভারতীয় নারীসমাজ এখনও অবিচলিত নিষ্ঠায় প্রাচীন আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে। নবযুগের এই ভাববন্যা তাহার অন্তর-প্রকৃতিকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

১১। বর্ত্তমান যুগে নারীর দায়িত্ব*

জীবনে নারীত্ব সম্বন্ধে চেতনার প্রথম উন্মেষ হয় যখন, তখন থেকেই এক অব্যক্ত বেদনা আমার মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। ঘরে ঘরে দেখেছি নারীত্বের অকথ্য অবমাননা, দেখেছি লাঞ্ছনা ও অবহেলা। শুনেছি নারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাহিনী, স্বতঃই মনে উদয় হয়েছে কেবল একটি কথা, "এর জন্যে দায়ী কে?" পুরুষ? সমাজ? যুগ-পরিস্থিতি?...মধ্যযুগে নারী পেত না শিক্ষা—সেইজন্য পুরুষ ও সমাজকে দোষারোপ করা গেছে, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ নারীই তো শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাচ্ছে এবং বহুরকম পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তবুও নারীর অবনতির পথ রুদ্ধ হয়নি কেন এ

* ১৩৫৮ সালের ৩১শে চৈত্রের সুবিখ্যাত "কেশরী" সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

ভারতের নারী

প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? শিক্ষিতা হয়েও অনেক নারী অশিক্ষিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে সাংসারিক জীবনে। নারীর শিক্ষার মূল্য রইলো কোথায়? শিক্ষা তো মানব চিত্তবৃত্তিকে সংযত করে সুপথে চালিত করে। তবে? বর্ত্তমান যুগের নারী কলেজে, য়্যুনিভার্সিটিতে যায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে; তাদের অধিকাংশই হয় মুখরা, দর্পিতা ও কোমলতাহীনা। শুনতে পাই বয়স্ক ও বয়স্করা বলেন, "মাগো! মেয়েরা পুরুষ হচ্ছে দিনে দিনে, লজ্জা নেই, নম্রতা নেই, ইয়ারকিতে ওস্তাদ!" তাঁরা হয়ত কিছুটা রং মিশিয়ে বলেন, কিন্তু সবটা মিথ্যা নয়। এর কারণ কি তা আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়ে তো এসব নেই। প্রকৃত শিক্ষালাভ যাঁরা করেন, তাঁদের মন সত্যই সুন্দর ও উদার হয়, মিশলে আনন্দ লাভ করা যায়, এই ব্যতিক্রমদের সংখ্যাও অত্যন্ত অল্প, তাঁদের মন সত্যই দেশের সম্পদ। অবশিষ্ট অধিকাংশরা শিক্ষালাভ করতে যায়, কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করে না, শিক্ষার আবরণে থেকে কুশিক্ষা প্রচার ক'রে আসে। তাই আমাদের দেশের নারী ডিগ্রী পেয়েও অশিক্ষিতা থেকে যাচ্ছে। তাই নারী হয়েও বর্ত্তমান যুগের নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না।……শুনতে পাই আধুনিক শিক্ষিতা নারীর আজকাল সংসারে মনই বসে না। জানি, দুনিয়ার পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে, নারীকে পুরুষের মত বাইরে যেতে হ'চ্ছে অর্থোপার্জ্জনের জন্য। তাই বলে যে নিজেকে বাইরে দ্রষ্টব্য করে রাখতে হ'বে, তার তো কোন কথা নেই। নারীর জন্যেই গৃহের সৃষ্টি, সেই গৃহকেই যদি নারী অস্বীকার করে, তবে গৃহের আর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?……

আমি এমন কয়েকজনকে জানি যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও নম্র ও বিনয়ী। তাঁরা বাইরে কাজ করতে যান, কিন্তু সংযত চিত্তবৃত্তির দরুণ নিজেকে বহির্মুখী রাখেননি, গৃহে ফিরে স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে আনন্দেই গৃহকর্ম্ম করেন। গৃহের কোন কিছুরই প্রতি তাঁহাদের উদাসীনতা নেই, স্বামীর সুখ-সুবিধার প্রতি স্ত্রীর খরদৃষ্টির অভাব নেই, তাই স্বামীও স্ত্রীর প্রতি উদাসীন নন, সংসারও সুশৃঙ্খল-ভাবে চলছে। অনেক ক্ষেত্রে ডিগ্রীধারিণী স্ত্রী নিয়ে অনেক স্বামী সুখী হননি, এরূপ মন্তব্য শোনা যায়। তার কারণ সে স্ত্রী ডিগ্রীই তাঁর জীবনের চরম মূল্য ধরে রাখেন, তাই অশান্তি দেখা দেয়। মনে রাখতে হবে, সংসারে নারীর মূল্য ডিগ্রীর সংখ্যায় শুধু নয়, অন্তরের ঐশ্বর্য্যের পরিমাপে। প্রকৃত শিক্ষা অন্তরের ঐশ্বর্য্য এনে দেয়। আধুনিকা নারী বাইরের চাকচিক্যে নিজেকে মণ্ডিত করতে গিয়ে অন্তরকে অবহেলা করছে, তাই সংসার তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়।

কবি একদিন লিখেছিলেন,—

> "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেহ নাহি দিবে অধিকার।"

সেই অধিকার তো বর্ত্তমান নারীসমাজ পেয়েছে কিন্তু করেছে অধিকারের অমর্য্যাদা।

> "না জাগিলে সব ভারত-ললনা;
> এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেজন্য ভারতীয় নারীর আদর্শ তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তাঁর অপূর্ব্ব লেখনীমুখে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে নারী গৃহ ও বহির্বিশ্ব কোনটিকেই অবহেলার চক্ষে দেখে না। তারা সামান্যতম গৃহের কাজকেও হীন কাজ বলে মনে করে না, কিন্তু আমাদের দেশে দেখি অন্যরূপ। তারা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে এক দিকটা আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের সদ্‌গুণগুলিকেই উপেক্ষা করে যাচ্ছে। তাই স্বামীজির অনুকরণে আমিও বলবো যে, অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করে নিজের বিচারশক্তি খাটিয়ে কাজ করতে হবে। ভারতীয় নারীরা এক সময়ে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বাহিরের জগতে দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। বর্ত্তমান জগতেও সমাজের মুখ-উজ্জ্বলকারিণী নারী আছেন, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প, তাঁরা সাধারণ সমাজের ঊর্দ্ধেও বটে। আমরা চাই সাধারণ সমাজের প্রত্যেক নারী নিজের কার্য্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে অতীতের আদর্শ ভারতীয় নারীকে। স্বাধীন দেশের দায়িত্ব কতক মাথায় তুলে নেবে। যে শিশু ভবিষ্যতে একজন নাগরিক হবে, শৈশবে সে নারীর কাছেই পায় শিক্ষা আর শৈশবই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি গঠন করার দায়িত্ব নারীর উপর। তাই সর্ব্বাগ্রে আজ প্রতি নারীকে প্রত্যেক সংসারের সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। বহু সংসারের সুখের সমষ্টিই দেশের সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি আসলেই—

"ভারত আবার জগৎ সভায়—
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

এতে নারীর বহির্বিশ্বে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই হবে।

১২। নারী-বন্দনা*

নারী-বন্দনা লেখার প্রারম্ভেই মনে হয় এ বন্দনা যেন ভারতীয় নারীরই প্রাপ্য হয়। কারণ যুগের আদিকাল থেকে ভারতীয় নারীর যা বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ তা আশা করি বিশ্বের অন্যান্য নারী-সমাজের আছে বলে মনে হয় না। যদিও হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকার্য্য যে, "নারী তথা গৌরী" কিন্তু তবুও হিন্দু তথা ভারতীয় নারীই বোধ করি সে সম্মানের পাত্রী। ভারতীয় নারীর মধ্যে আছে সর্ব্ব গুণের সমন্বয়, সর্ব্ব চিন্তাধারার মূর্ত্ত-আদর্শ। কি কর্ত্তব্য পালনে, সংসার-চর্চ্চায়, সতীত্বে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ত্যাগে, যুদ্ধ-নিপুণতায়, জ্যোতিষশাস্ত্রে, প্রচার-আদর্শে, কূটনীতিতে, আত্মত্যাগে, দানে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, শিল্পকলায়, চরিত্র-মাধুর্য্যে প্রভৃতি সকল দিকেরই সর্ব্বতোমুখী মহান্ আদর্শের অধিষ্ঠাত্রী এই ভারতীয় নারী।

সীতার সতীত্ব, সাবিত্রীর এয়োতীর কথা ভারতকে শিখায়েছে সহনশীলতা আর অগ্রবর্ত্তিতা। দেবী কুন্তীর নৈতিক চরিত্রের অবধানতার কথা আজো ভারত তথা ভারতবাসী ভুলেনি। দ্রৌপদীর রন্ধনপদ্ধতি ভারতের পাকান্নের বিশেষ অঙ্গ। তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও সহনশীলতার মর্য্যাদা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন কৌরব-সভায়!

* "কেশরী সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

ভারতের নারী

যুদ্ধযাত্রায় পুরুষের সহযোগিতা, তাদের সাহসবর্দ্ধিতায় সহায়তা করেই রণসাজে সাজিয়ে অভিমন্যুকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন বীর্য্যবতী উত্তরা। কর্ণপত্নী স্বীয় পুত্রবধে বেদনা-ত্যাগী হৃদয়ে ভারতীয় ত্যাগ-দর্শনকে যে পর্য্যায়ে উন্নীত করে গেছেন, তা ভারত-নারীত্বের অমর নিদর্শন। শ্রীরাধার কামহীন প্রেম ভারতে বহিয়েছে শুদ্ধ মন্দাকিনীর ফল্গুধারা। বিদ্যাবত্তায় আর জ্ঞানগরিমায় গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী আমাদের বিদ্যানুরাগিতার প্রধান সহায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের জটিল জাল ছেদন করে ভারতকে শিখিয়ে গেছেন জ্যোতিষবিদ্যা।

মেবারের শত শত হাজার হাজার নারী দেখিয়ে গিয়েছেন আপৎকালীন মান আর মর্য্যাদা, তথা হিন্দু-নারীর সতীত্ব-রক্ষায় জ্বলন্ত ত্যাগপদ্ধতি। বিধর্ম্মীর ক্রুর কবল থেকে কিভাবে নারীত্বের সম্মান রক্ষা করতে হয়, কিভাবে অত্যাচারীর কর্ম্মদক্ষতা কূটকৌশলে পঙ্গু করে আত্মরক্ষা করতে ভারতনারী অগ্রগামী, তার নিদর্শন রক্ষা করে গেলেন সতী পদ্মিনী।

রণক্ষেত্রে নারীজাতি নিজ সম্মান বজায় করে লক্ষ লক্ষ সৈন্য চালনা করতে পারে, তার মহান্ ইতিচরিত্র আমাদের দান করে গেছেন রাণী দুর্গাবতী আর রাণী লক্ষ্মীবাঈ; লুন্ঠনকারী দস্যুতস্কর বিদেশীদের শায়েস্তা করে নারী-আদর্শের বিজয়পতাকা উড্ডীন করে গিয়েছেন নারীশ্রেষ্ঠা রাণী রাসমণি।

জীবনের সেবায় স্বীয় প্রাণাধিক পুত্র নিমাইকে জনসমাজের সেবায় বিলিয়ে দিয়ে শচীদেবী ভারত-সমাজের এক বিশিষ্ট ত্যাগী মহিলার আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন। যোগসাধনায় স্বামী-অনুগামিনী শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের সহায়ক, ধারক ও বাহক। এতগুলি অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শের যেখানে সমন্বয়, সেখানে কি করে যে বর্ত্তমান নারীসমাজে প্রাচীন অর্ব্বাচীনের কথা ওঠে তা ভাবা যায় না। আমরা দিব্যচক্ষেই লক্ষ্য করছি, অতি আদিম যুগ থেকেই ভারতীয় নারীই পরিচালনা করেছেন পুরুষদের; পুরুষসমাজের সকল কাজের সহায়তা করেছেন, যুগযুগান্তর থেকে—স্নেহে, জ্ঞানদানে, মাতৃরূপে, মনোরঞ্জনে, পতিপ্রিয়ারূপে সংসারের সকল কাজের পরিচালিকারূপে, অভয়দানে ভগ্নিরূপে। ভারতীয় নারী জন্ম দিয়েছেন—শিবাজী, রাণা প্রতাপের ন্যায় বীর্য্যবান্ পুরুষ; রামদাস, গুরুগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদী মহামানবদের—শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় কর্ম্মযোগীর। ভারতীয় নারী গর্ভে ধরেছেন বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, সাভারকার, লোকমান্য তিলক, রাসবিহারী প্রমুখ মানব-শ্রেষ্ঠদের। তাই ত রামপ্রসাদ মাতৃসাধনার মধ্য দিয়ে, তথা নারী-আরাধনার মধ্য দিয়েই কি মুক্তিপথ আছে, তারই সন্ধান দিয়েছেন ভারতবাসীদের। তাই আজ বড় দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকের নারীসমাজ পাশ্চাত্যের অনুকরণে গঠন করতে চান ভারত-নারীদের; তাই-ই নাকি প্রগতিবাদিতা। কিন্তু আমরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, অতীত ভারতে নারীপ্রগতির কাছে আজকের তথাকথিত নারীপ্রগতি কি পৌছাতে পেরেছে? সেই কারণেই আমরা আজও প্রার্থনা করি—পাশ্চাত্য-বাদের মোহান্ধতার প্রাচীন বেষ্টনী যেন ছেদন করে আজকের প্রগতিবাদী ভারতীয় নারীবৃন্দ। লক্ষ্য করুন অতীত ভারতের দিকে। গঠন করুন পুরাতনের ভিত্তিতে নূতনের সৌধমালা; আবার বিশ্ব উঠুক ভারত-নারীর বন্দনাগানে মুখরিত হ'য়ে।

১৩। নারীর অধিকার*

নারীর অধিকার লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে। ভারতবর্ষের নূতন শাসনতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকৃত হইলেও আমাদের দেশে কয়জন নারী তাঁহাদের জীবনের পূর্ণ-সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? মিশর প্রভৃতি দেশে নারীর ভোটাধিকার পর্য্যন্ত নাই। আমাদের দেশে ভোটাধিকার আছে, কয়েকজন নারী বিশিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক পদেও বহাল আছেন। বস্তুতঃ কাগজে কলমে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষের নারীসমাজ এখন সম্পূর্ণরূপেই পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করিতেছে।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, নারীর সম্মান ভারতবর্ষে চিরকালই স্বীকৃত। বর্ত্তমান ভারতে নারীর মর্য্যাদাবৃদ্ধির জন্য যাহা করা হইতেছে, তাহা অতীত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই। কিন্তু বাস্তব ঘটনা বিচারে আমরা কি নিঃসংশয়ভাবে এ কথা বলিতে পারি যে, সত্য সত্যই ভারতের নারী আজ তাহাদের বেদনার্ত্ত ইতিহাসকে পশ্চাতে ফেলিয়া আলোকের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? শহরের মুষ্টিমেয় উচ্চ-শিক্ষিতা নারীকে দেখিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলে চলিবে না। বাংলাদেশে কিংবা ভারতবর্ষ নগরে বাস করে না গ্রামেই তাহাদের পূর্ণসত্তার বিকাশ। গ্রামাঞ্চলে আমাদের যে লক্ষ লক্ষ মা-বোনেরা আছেন, তাঁহাদের অবস্থার দিকে আমাদের আজ দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। আমরা এতদিন জানিয়া আসিয়াছি, ঘরকন্না, সন্তান-পালন করাই নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা সত্য কথা, নারীকে গৃহের কর্ত্তব্যাদি এবং সন্তান-পালন করিতেই হইবে। কিন্তু ইহার বাহিরেও যে জগৎ রহিয়াছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুবিচিত্র কলরবমুখর পৃথিবী তাহার উপর কি কোন নারীর কোনই অধিকার নাই? এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা সভাসমিতিতে স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাষণ দিয়াও নিজের ঘরের স্ত্রী কিংবা মেয়ের সামান্যতম স্বাধীনতাটুকুও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন; এই সব পুরুষেরা স্ত্রীকে 'ভার্য্যা' হিসাবেই দেখিয়াছেন, 'সহধর্ম্মিণী' রূপে নয়। ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে স্ত্রীকে 'সহধর্ম্মিণী', কন্যাকে 'নন্দিনী' রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে; এই 'সহধর্ম্মিণী'র অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, স্বামীর ধর্ম্মকে স্বীয় ধর্ম্মরূপে যে নারী গ্রহণ করেন তিনিই 'সহধর্ম্মিণী' আখ্যালাভের যোগ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে বীরের পত্নী বিরোচিত গুণের অধিকারিণী হইবেন, বিদগ্ধ ব্যক্তির পত্নী বিদুষী হইবেন (অন্ততঃ জ্ঞানলাভের পিপাসা তাঁহার থাকিবে), ইহাই স্বাভাবিক। এই সহধর্ম্মিতার জন্যই স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সমাজে এই আখ্যার বহুলাংশে অপব্যবহার হইতেছে। নারীকে তাহার চরিত্র বিকাশের সুযোগই দেওয়া হয় না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও দেখা যায় বাড়ীর ছেলের পড়া-শোনার জন্য পিতা-মাতা যত সযত্ন দৃষ্টি রাখেন বাড়ীর মেয়েটির প্রতি ততখানি চেষ্টা বা যত্ন নাই। ভাবটা এই, ছেলে বিদ্যালাভ করিলে উপার্জ্জন করিয়া খাওয়াইবে। মেয়েকে দিয়া তো আর সেই আশা নাই। কিন্তু শুধু কি অর্থার্জ্জনের জন্যই সন্তান মানুষ করা। যে মেয়েটিকে আজ অবহেলার মধ্য দিয়া মানুষ করা হইতেছে, শুধু বেশভূষা আর খাওয়া-পরাতে সন্তুষ্ট করিয়া রাখা হইতেছে, কে জানে তাহার চিত্তবৃত্তি-বিকাশের সুযোগ লাভ করিলে সে মহীয়সী নারী

* "কেশরী" সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

হইয়া উঠিত কি না। মানবজীবন পুরুষের কাছে যেমন অমূল্য, নারীর কাছে তো তাহাই। শুধু প্রাত্যহিক জীবনের ও কর্মের গ্লানিতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা হয়। নারীর অধিকার আলোচনা করিবার সময় এই সত্যটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এ কথাও যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে, একদিন এই ভারতবর্ষেরই নারী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে চিরসত্যের বাণী আত্মঘোষণা করিয়াছিল—"যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্?" আজকালকার নারীও মৈত্রেয়ীর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিবে: শুধু দিনযাপনের গ্লানি নয়, এমন কোন মহত্তর জিনিষ চাই যাহা লাভ করিয়া নারীজন্ম সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

১৪। নারীর আদর্শ*

সৃষ্টির আদিম প্রভাতে সৃষ্টি হয়েছিল এক নর ও নারী। সেই সময় থেকেই নারী কল্যাণীরূপিণী। যুগের পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে, কিন্তু যুগে যুগে নারীর হৃদয় পুরুষের শক্তিকে মহিমান্বিত করেছে, দিয়েছে প্রেরণা, সুখে-দুঃখে আঘাতের ঝঞ্ঝাপাতের মধ্যে দিয়েছে শান্তির সুখস্পর্শ। কল্যাণী নারীর হৃদয়-মন্দিরে মাদকতাশূন্য শুভশ্রী প্রতিষ্ঠিত। অচল শান্তি ও ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে কল্যাণী থাকেন আপন কল্যাণব্রতে নিরতা। তাই কবি নারীকে দেবতার দূতীরূপে কল্পনা করে লিখেছেন:—

"ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃত বারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হ'য়ে তাহারি সন্ধানে তুমি নারী
দুবাহু বাড়ালে।"

ত্যাগের মহিমায়, অকৃত্রিম সহনশীলতায়, প্রেমের পরিপূর্ণতায় আপনার প্রয়োজনকে বিসর্জ্জন দিতে পারে যে নারী, তিনিই আদর্শ নারী। এই অতি পুরাতন শাশ্বত কথাটিকে বর্ত্তমান জগৎ ভুলেছে।…ভুলেছে নারীর সৃষ্টি কোন্ প্রয়োজনে।…নারী ভুলেছে তার নিজের সত্তাটিকে। মনে হয় অধিকাংশ নারীই, তারা যে নারী এ কথা চিন্তার অবকাশ পায় না বা চায় না। এ কথা বলতে চাই না, তারা যে স্ত্রীলোক এ কথা তারা ভুলেছে। দেখতে পাই যে তারা নিছক স্ত্রীলোক আর কিছুই নয়, তাই তারা প্রমাণ করেছে।…

…এরা উচ্ছল জীবনের রঙে ঝলমল করছে। শুধু যৌবন এরা বাঁধা রাখতে চায় কৃত্রিমতার মাঝে। এই সেদিনও সুদূর পল্লীগ্রামের নারীর প্রতি অঙ্গে দেখেছি স্নিগ্ধসুষমার টলটলে সৌন্দর্য্য। দেখেছি তাদের গড়া স্নিগ্ধ পরিবেশ, আর চিন্তা করেছি আলোক-প্রাপ্তা আধুনিকাদের কথা।…

স্বাভাবিকভাবে কৈশোরের চঞ্চলতা থেমে আসে যৌবনের স্নিগ্ধ পরিবেশে। এ সময়ে নারীর দেহে চাঞ্চল্য থাকে না, থাকে মনে, কিন্তু সংযম আসে বলেই সে আপনিই হয় ধীর, স্থির, সংযত। এ সময়ে নারীত্ব সম্বন্ধে চেতনা তার জাগে। এই চেতনা আসার সঙ্গেই নারীত্বের দ্বারগুলি খুলে গিয়ে, আসবে

* "কেশরী" সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে গৃহীত।

সহনশীলতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধাভক্তি। তখন সে হবে নারীরূপে অভিষিক্তা। আপনিই বাঁধতে চাইবে নীড়, ঘিরে রাখবে তাকে তার মধুর আবেষ্টনী দিয়ে। প্রত্যেকের মাঝে সে নিজেকে দেবে বিলিয়ে। এতেই তার চরম সার্থকতা। অন্যের সামান্য দুঃখ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ভয়ে সে অবলম্বন করবে কষ্টকে। এটা বলপূর্ব্বক আদায় করতে হয় না। এ নারীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত মনোবৃত্তি। আজকাল এই স্বাভাবিকতার স্থানে নারীর অস্বাভাবিকত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, তাই গৃহ হয়ে উঠেছে অশান্তির নীড়। অনেকে হয়ত এর প্রতিবাদ ক'রে বলবেন, নারীরা কেন পশ্চাতে প'ড়ে থাকবে? তারাও জগতের সব বিষয় দেখবে, শুনবে, জানবে। এ অত্যন্ত উঁচুদরের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘরের সঙ্গে যোগ না রেখে বাহিরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে যাওয়া মূর্খতা। ছোট ছোট জগতের সমষ্টিই বৃহত্তর জগৎ। এই ছোট জগতের একের সঙ্গে অন্যের সুসংযোগ থাকলে আসবে সন্তুষ্টি, তারপর আসবে শান্তি। শান্তি থেকে শৃঙ্খলার সৃষ্টি, তা থেকে নিয়মানুবর্ত্তিতা। এর দরুণ সময়ের অপব্যবহার হবে না। অবসর সময়ে বসে বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়। তবে—একটা কথা—স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতীত সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। ঘরে-বাইরে পুরুষ নারীর ও নারী পুরুষের প্রকৃত সহযোগী হ'লে সব সমস্যার সমাধান হয়।

আমরা পাশ্চাত্ত্য জগতের সাজ-সজ্জার অনেক অনুকরণ ক'রে থাকি, যেগুলি দ্বারা আমাদের কোনই লাভ হয় না। কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে কতকটা অনুকরণ করলে লাভবান্ হ'বে সন্দেহ নাই—যে সমস্ত গুণ থাকার দরুণ তারা জগতে এক শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হ'য়ে জগতে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

আমি এক পাশ্চাত্ত্যদেশীয় মহিলার সংস্পর্শে এসে জানতে পারি যে, তাঁদের দেশের অধিকাংশ পরিবারের মহিলারা সমস্ত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করেও বাইরের কাজ করে থাকেন। আমরা যদি বলি, আমাদের দেশে দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে ব'লেই বাইরে কাজ করতে যেতে হয় এবং এজন্য ঘরের কাজ করতে পারি না তবে পাশ্চাত্ত্য দেশে এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? তবে এ সমস্তের মূলেই সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রধান, আমি বলব।

অবশ্য স্বীকার করি, লিখে সমস্যা সমাধান করাটা যত সহজ, কাজে ততটা নয়। তা ছাড়া বর্ত্তমানে নারী তার সুদূরপ্রসারী (?) দৃষ্টি নিয়ে এত দূর চলে গিয়েছে যে, সহজ কথাটুকু ভেবে নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে আনতে পারাটা সহজসাধ্য হবে না। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, বর্ত্তমান যুগে নারী যে পূর্ব্বের মত সম্মান পান না, তার কারণ—নারীর প্রকৃত রূপ চাপা পড়েছে জৌলুষের নীচে। নারীর শান্ত, সংহত, কোমলতাভরা অথচ প্রতিভার উজ্জ্বল রূপকে মানুষ আপনা থেকে করে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ভারতীয় নারী পেয়ে এসেছে যুগ যুগ ধ'রে সেই শ্রদ্ধা আজ ধূলায় লুটিয়েছে।

আমি নিশ্চিত জানি, প্রত্যেক নারীই যদি একবার চিন্তা করবার চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে পারবে ত্রুটি কোথায়। অনুভূতি-শক্তির সাহায্য নিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করবে। উত্তর প্রত্যেকেই নিজের বিবেকের কাছেই পাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলে নারীসমাজ ধীরে ধীরে আবার অস্তমিতপ্রায় পূর্ব্ব-গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে জগতের মাঝে।

১৫। গৃহলক্ষ্মীর কর্ত্তব্য*

'গৃহলক্ষ্মী' ব'লে নারী চিরদিন সমাদৃত। সেই নারীকেই 'গৃহলক্ষ্মী' বলা চলে, যাঁর কল্যাণস্পর্শে শ্রী-মণ্ডিত হয়ে ওঠে গৃহ। শাস্ত্রে বলে, 'গৃহিণীই গৃহ'। যাঁর ঘরে স্ত্রী নেই, স্ত্রীর হাতের কল্যাণস্পর্শ যাঁর গৃহে প্রতিটি জিনিসে নেই, তাঁর গৃহ যদি অতি সুসজ্জিত হয়, তবু তাকে 'গৃহ' বলে সম্মানিত করতে প্রবৃত্তি হয় না। কেমন যেন একটা শূন্যতা বিরাজ করে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে।

বেশী বেলায় শয্যাত্যাগ করা মেয়েদের পক্ষে আরও অনুচিত। যাঁরা সুগৃহিণী, তাঁরা ভোর থেকে উঠেই ঘরদুয়ার ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করেন। যাঁরা নিজের হাতে না করেন, তাঁরা ঝি-চাকরকে দিয়ে করিয়ে নেন। রান্না-বান্না, হাট-বাজার, আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র, সকল বিষয়েই গৃহিণীর সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য থাকা দরকার। অনেকে রাঁধুনী রেখে থাকেন। কিন্তু নিজে উপস্থিত থেকে রান্নার তদারক করেন। কে কী খেতে ভালবাসে, কাকে কী খাবার দিতে হবে, সে-সব বিষয়ে তাঁরা এত সযত্ন দৃষ্টি রাখেন যে, বাড়ীর লোকের কোনও অসুবিধা হয় না। ঠাকুর বা ঝি-চাকরের হাতে রান্নার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে গেলে খাদ্যবস্তু তো 'অখাদ্য' হবেই, তা'ছাড়া স্নেহ-যত্নের স্পর্শ না পাওয়াতে পরিবারের সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়বেন। পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি বা সুস্থতা নির্ভর করে প্রধানতঃ খাদ্যের পুষ্টিকারিতা ও বিশুদ্ধতার উপর। সে বিষয়ে গৃহিণীর সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে।

এ-ছাড়া ঝি-চাকর বিশেষতঃ আজকালকার ঝি-চাকরদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা কঠিন। অনেক গৃহিণী বিশেষ বিপদে পড়েছেন এইভাবে বিশ্বাস করতে গিয়ে। এইভাবে নিজেই যদি কিছু সতর্ক লক্ষ্য নিয়ে চলেন, তবে সে গৃহিণীর গৃহে শ্রী ও শান্তি বজায় থাকবে, আশা করা যায়। এবং এই ধরণের গৃহিণীকেই 'গৃহলক্ষ্মী' আখ্যা দেওয়া যায়।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে অনেক সংসারেরই অবস্থা বা হালচাল, রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অর্থ উপার্জ্জনের নেশায় পেয়েছে যেন নারীদের। পুরুষের সঙ্গে সমানে তাঁরা ছুটেছেন বাইরে—কর্ম্মক্ষেত্রে। এতে যে ঘরের টান কমে যায়, এ কথা আশা করি কেউ অস্বীকার করবেন না। গৃহলক্ষ্মীর আসন ছেড়ে তাঁরা চলেছেন অর্থের তাগিদে এবং তাঁরা চাইছেন সেই অর্থের সাহায্যে গৃহকে শ্রী-মণ্ডিত করে তুলতে। এদিকে ঘরের কাজের ভার হয়ত থাকল বেতনভোগীদের উপর। অনেকে ঝি-চাকর—তার উপর রাঁধুনী বামুনও রাখেন ; সুতরাং সব কাজের ভার তাদের উপর দিয়ে গেলে গৃহিণীর সঙ্গে গৃহের সম্বন্ধ থাকে কতটুকু ?

সেকালের দিদিমাদের ভাঁড়ার ঘরের প্রতিটি জিনিষের যে পরিচ্ছন্ন-সৌন্দর্য্য ও যত্নের নিপুণতা দেখতাম, এ যুগের মেয়েদের ভাঁড়ারে সে-যত্ন বা সৌন্দর্য্যবোধ দেখি না। মা-দিদিমাদের আচারের হাঁড়িগুলি, বড়ির হাঁড়িগুলি, নিজের হাতে তৈরী শিকাগুলিরও এত যত্ন ছিল যে, ভাঁড়ারে ঢুকলে দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে ইচ্ছে হ'ত। তাঁদের আর্থিক অবস্থা হয়ত তেমন সচ্ছল ছিল না, তবুও তাঁদের সঞ্চয় বা সংগ্রহ করবার দিকে যেমন উৎসাহ এবং চেষ্টা ছিল, তেমনি সেগুলি যাতে সারা বৎসর ব্যবহারযোগ্য থাকে সেজন্য তাঁদের যত্নও ছিল যথেষ্ট। যেন তাঁদের রাজ্যপাট ছিল রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘর জুড়ে। এ-সব ঘর দুবেলা ঝাঁটা দেওয়া, সন্ধ্যাবেলায় "সাঁঝের প্রদীপ" ও ধুনো দেওয়ার রীতি ছিল এই সব ঘরে। এখন অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে। মানুষের আর্থিক অভাবে রুচিও বদলে গেছে। এবং মেয়েদের ও-সব বিষয় নিয়ে

* "আনন্দবাজার পত্রিকা" ২রা মাঘ, ১৩৬১ সাল।

মাথাখাটানোতে গৌরব বোধ হয় না, মনকে এ সব বিষয়ে লিপ্ত করাতে অযথা শ্রম বা সময় নষ্ট করা, মনে করেন হয়ত।

যে গৃহিণীরা স্বামীর সঙ্গে অর্থোপার্জ্জন করেন বাইরে গিয়ে, তাঁদের গৃহ এবং পরিবারের অবস্থা কি দাঁড়ায় সহজেই অনুমান করা যায়। মনে করুন ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মনে স্বামী ফিরলেন কর্ম্মস্থল থেকে। তখনও হয়ত স্ত্রী ফিরতে পারেন নি বা একসঙ্গেই হয়ত ক্লান্ত দেহ মন-নিয়ে ফিরছেন। সে অবস্থায় স্বামীকে যত্ন করে খেতে দেওয়া, তাঁর জামা-কাপড়-জুতা এগিয়ে দিয়ে একটু বাতাস করা কিংবা হয়ত হাসিমুখে দুটো মিষ্টি কথা বলা—এ ধরণের কোনও কাজই করবার মত সেই গৃহিণীর উদ্যম অবশিষ্ট থাকে কি? স্বামীর প্রতি তবে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হ'ল।

আমাদের বাংলায় মেয়েদের (বর্ত্তমান বাংলার) স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভারতের অন্য প্রদেশের মেয়েদের তুলনায় অনেক হীন, কাজেই ঘরের এবং বাইরের কাজ দুটোই যাঁরা প্রাণপণে সমানভাবে চালাতে চেষ্টা করবেন, তাঁরা ভবিষ্যতে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়বেন কিংবা হয়ত আরও শোচনীয়ভাবে অকালমৃত্যু বরণ করবেন।

সন্তান যাঁদের আছে, তাঁদের সন্তানদের লালন-পালনের ভার 'আয়া'র উপর দিয়েও অনেকে অর্থের জন্য চাকরি করে থাকেন। কিন্তু মা'র সান্নিধ্য না পাওয়ায় শিশুদের মন ভাল থাকে না এবং মা'র পরিচর্য্যা ও যত্ন না পেলে শিশুদের দেহ ভাল থাকে না। জননীর সুস্থ দেহ না থাকলে সন্তানও সুস্থ দেহ পাবে না; সুতরাং এক্ষেত্রে মাতার কর্ত্তব্যের ত্রুটি দেখা দেবে। ফলে যে সব নাগরিক তৈরী হবে ভবিষ্যতে তারা দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভ না করাতে সমাজের ক্ষতির কারণ হবে।

যাঁদের স্বামীদের অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা কম, অথচ সংসারের অভাব বেশী, সেক্ষেত্রে তাঁদের বাধ্য হয়ে উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু যাঁরা বাড়িতে ঠাকুর, চাকর, ঝি, আয়া এবং প্রাইভেট টিউটার (ছেলেমেয়েদের) ইত্যাদি রেখে মোটা টাকা খরচ করেন, অথচ স্বামীর সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা যে শুধু প্রয়োজনে পড়ে চাকরী করেন তা মনে হয় না। এটা হয় তাঁদের সৌখিন খেয়াল, কিংবা তাঁরা স্বামীর অর্জ্জিত অর্থকে ঠিক 'নিজের' বলে মনে করতে পারেন না।

অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের দেখেছি যাঁরা নিজের অর্জ্জিত অর্থকেই প্রকৃত নিজের বলে মনে করেন, স্বামীর অর্জ্জিত অর্থকে সেভাবে নিতে পারেন না বা স্বামীর কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ বোধ করেন। এটা মোটেই সংসারিক জীবনে বাঞ্ছনীয় নয়। আজকাল গ্রামে দরিদ্র মেয়েদের মধ্যে বাড়িতে বসে 'বিড়ি' তৈরী করে অর্থোপার্জ্জন করা একটি রীতিমত রেওয়াজ বা প্রথার প্রচলন হয়েছে। এর ফলে তাদের পুরুষেরা অনেকে অলস-প্রকৃতির হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর এবং কন্যার অর্জ্জিত অর্থে সংসার তাদের স্বচ্ছন্দে চলে যায়। পুরুষদের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে, অকালবার্দ্ধক্য দেখা দিচ্ছে।

মানুষের মন ঘরমুখী। পুরুষ বাইরে থেকে আনবে অর্থ উপার্জ্জন করে, ঘরে নারী সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করে পুরুষকে দেবে স্বাচ্ছন্দ্য। উভয়ে উভয়ের প্রতি কোনও না কোনও বিষয়ে নির্ভরশীল না হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয়। নিজেদের বিলাসপ্রসাধনের ব্যয় সঙ্কোচ করে, মিতব্যয়ী হয়ে সংসারের কাজ যথাসাধ্য নিজ হাতে করলে এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সাধ্যমত নিজে দিলে সংসারের অর্থের প্রয়োজন কমে, অথচ স্বামী ও সন্তান সকলেই কল্যাণীর কল্যাণ হস্তের পরিচর্য্যা পেয়ে ধন্য হয় এবং সংসারের শান্তি ও শ্রী অক্ষুণ্ণ থাকে। গৃহের শ্রী এবং শান্তিরক্ষাই গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্য এবং তাই ত' তাঁকে 'গৃহলক্ষ্মী' বলে শ্রদ্ধা জানান হয়।

১৬। নারী-প্রগতি*

আজকাল নারী-প্রগতি বলে প্রায়ই একটা কথা অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। তার প্রকৃত অর্থ ভেবে দেখা বিশেষ প্রয়োজন।

মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে—পাশ করবে, চাকুরী-স্থলে পুরুষের সঙ্গে নামছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, মাসের শেষে তার উপার্জ্জনের অর্থে সংসারে আসছে সচ্ছলতা, পরিচ্ছদের স্বল্পতায় অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা রুজ, লিপষ্টিক মেখে শীফন-জর্জ্জেট পরে আর কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে দশ-পাঁচটা অফিস করে যে মেয়ে সংসারের উপার্জন বাড়াচ্ছেন এবং কোন সিনেমা বা রেস্তোরাঁ যাঁর বাদ যাচ্ছে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনিই নারী-প্রগতির আদর্শস্থানীয়া বলে পরিগণিত হন। কিন্তু প্রগতির অর্থ এত সঙ্কীর্ণ করে দেখা তো ঠিক হবে না।

প্রগতি হচ্ছে অগ্রগতি। প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। যে জাতি যত সভ্য বা উন্নত হবে সে জাতি তত প্রগতিশীল বলে পরিচিত হবে। নির্দ্দিষ্ট কোন কালের মধ্যে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। এককালে যাকে প্রগতি বলে ধরা যায়, পরবর্ত্তী যুগে হয়ত সেটা হয়ে যায় অচল। আবার যে ব্যবস্থা এককালে অচল বলে হয় পরিত্যক্ত, অন্য যুগে তাকেই প্রগতির অনুকূল বলে ধরা হয়ে থাকে।

নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তা আছে। এই ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশই প্রগতি। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাইরে। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্য দিয়ে সবকিছু বাধা অতিক্রম করে বেঁচে থাকাই তার জীবনের সাধনা। সেখানে তার পৌরুষ। কিন্তু নারীর হৃদয় অন্তর্মুখী। ঘর বাঁধতে হয় নারীকে। এইজন্য তাকে করতে হয় গৃহসাধনা। দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে সমাজজীবনকে তার সংযুক্ত রাখতে হয়। এইজন্য তাকে দুঃখ-কষ্টের তপস্যাও করতে হয়। তার জন্য চাই তার শক্তির সাধনা। তাইতো "সর্ব্বংসহা" ধরিত্রীই নারীর আদর্শ সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের স্থান আলাদা, কিন্তু উভয়ে উভয়ের পরিপূরক।

আগেই বলেছি প্রগতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ নেয়। আমি অবশ্য নারী-প্রগতির কথা বলছি– আর বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা। বৈদিক যুগে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা আত্মিক, ধার্ম্মিক ও পারলৌকিক উন্নতিসাধনার চিন্তার মধ্যে মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। এই সাধন-পথে যিনি যত বেশী এগিয়ে যেতেন, তিনি তত প্রগতিশীল বলে খ্যাত হতেন। উপনিষদের যুগে মৈত্রেয়ী ছিলেন প্রগতিশীলা নারী। যে ধনে অমৃত লাভ হয় না, সে ধন হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি অমৃত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই এই প্রগতিশীলা নারীর মুখস্থিত বাণী—"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্?" আজও অমর হয়ে রয়েছে।

এরপরে কালিদাসের যুগে দেখতে পাওয়া যায়—আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়াও সে যুগে শিল্প, সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার চর্চ্চা হ'ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নারীসমাজ স্বীয় প্রতিভার পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্ত্তী মুসলমান যুগে অবশ্য নারীর ব্যক্তিত্ব সঙ্কুচিত হয়। আমাদের দেশের নারীরা মুখে মুখেই নানা নীতি ও ধর্ম্মকথা শুনে এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকেই নিজেদের গার্হস্থ্য জীবনের জন্য আদর্শ তৈরী করতেন। আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ মাতাই ছিল সে যুগের নারী-প্রগতির চরম কথা।

* "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে গৃহীত।

নারী-প্রগতি

ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের দায়িত্ব নারীর। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়ে থাকে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে যদি নারী নিজেকে যুক্ত করতে না পারে তবে সেটা হবে তার প্রগতির অন্তরায়। নারীর মূর্ত্তি শাশ্বত মাতৃমূর্ত্তি— সে সেবাময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী। কোন শিক্ষা যদি তার হৃদয়ের এই সহজাত কোমল বৃত্তিকে নষ্ট করে দেয়, তবে সে শিক্ষা পুরুষের পক্ষে শিক্ষণীয় হলেও নারীর পক্ষে অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আবার নারী যদি শুধুমাত্র তার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিই চর্চ্চা করে—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বা শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারে, তবে তার প্রগতি হবে ব্যাহত। তাই নারীর হৃদয়ের সহজাত কোমল বৃত্তিগুলির সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন ঘটাতে হবে নারীকে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারগণকে উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নারীর—আবার সংসারের শ্রী-শান্তি রক্ষার দায়িত্বও নারীর। তাই তার শিক্ষায় যদি সমন্বয় না আসে, তবে এ দায়িত্ব সে কখনই ঠিকমত পালন করে উঠতে পারবে না।

অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অগ্রগতির বিচার করতে হবে। বর্ত্তমান যুগে সমাজব্যবস্থা এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেছে, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত কর্ম্মের প্রয়োজন। জীবনের অর্থনৈতিক মান নেমে গেছে অনেকখানি। তাকে উঁচু করবার জন্য পুরুষের পাশে এসে অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হয় নারীকে। রাষ্ট্রের ও সমাজের অধিবাসী হিসাবেও নারীর কর্ত্তব্য আছে। এই সমস্ত কর্ত্তব্য যে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে সেই প্রগতিশীলা।

বর্ত্তমান নারী-সমাজ যে পথে চলেছে, তাকে আমরা ঠিক প্রগতি বলে মেনে দিতে পারি না; যদিও বৃহত্তর মানব-সমাজে শিক্ষায়, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে কোন ক্ষেত্রেই নারীর মূল্য কম নয় বা অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে তার স্থানও বড় কম নয়। সুযোগ ও সুবিধা পেলে সর্ব্বক্ষেত্রেই যে নারী তার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে তাও সর্ব্বজনস্বীকৃত। তবুও একটা কথা থেকে যাচ্ছে। নারী-হৃদয় মাতৃ-হৃদয়—স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, দয়া, মায়া, সেবা, সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। মানবের সমস্ত কোমলপ্রবৃত্তির আধার নারী-হৃদয়। বিধাতা তাকে এ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তাই বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নিতে যদি তার গৃহের সম্বন্ধ অস্বীকার করতে হয়, তার পারিবারিক পরিবেশ অশান্তির হাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তবে সে প্রগতি কল্যাণকর নয়। কল্যাণকর কিছু না থাকলে তাকে প্রগতি বলা চলে না।

নারীর কোন কাজ প্রগতি বা প্রগতি নয়, তার বিচার হবে তার কাজের উদ্দেশ্য দেখে। একই কাজ কাউকে প্রগতির পথে অগ্রসর করে দিতে পারে, কাউকে বা দিতে পারে পিছিয়ে। কোন রুগ্ন বা অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম স্বামীর স্ত্রী চাকুরি করে সংসার চালাচ্ছে বা কোন বিধবা নাবালক শিশুসন্তানদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সংসারের গণ্ডী পার হয়ে বাইরের জগতে এসেছে কর্ম্মসংস্থানের আশায়, বা কোন মেয়ে সংসারের অস্বচ্ছলতা দূরীকরণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করছে, অথবা কোন মেয়ে যার বিয়ে হল না। চাকুরিকেই সে জীবনের অবলম্বন ব'লে ধরে নিল—এদের এই কর্ম্মের মধ্যেই আছে ত্যাগ, আছে সংসারের জন্য মঙ্গল কামনা। আজকাল অনেক শিক্ষিতা নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে বৃহত্তম কর্ম্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের উন্নত ভাবধারা, সৃজনী-প্রতিভা বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। আবার কোন কোন নারীর সংসার কর্ত্তব্যের পরেও নিজস্ব যে সময় বা শক্তি থাকে, তা দ্বারা সে সমাজ-কল্যাণে সেবাব্রতী হয়। যে শক্তি বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, নারী তার সেই শক্তিকে সংসারের গণ্ডীতে আবদ্ধ না রেখে নিজেকে বিশ্বের দরবারে হাজির করছে, তা দ্বারা বৃহত্তর মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হচ্ছে—এ-সব ক্ষেত্রেই নারীর কর্ম্মকে প্রগতি বলা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র নিজেদের বিলাস-ব্যসন

চরিতার্থ করার আশায় নারীরা এসে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নেমেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাদের উপার্জ্জিত অর্থে না আসে সংসারের স্বচ্ছলতা, না হয় সমাজের কোন মঙ্গল। আচার, ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে প্রগতির ধ্বজা উড়িয়ে এঁরা চলেন সর্ব্বাগ্রে এবং প্রগতির গালভরা বড় বড় বুলিই এঁদের মুখে শোনা যায়, কর্ম্মক্ষেত্রে এর বিপরীত আচরণ করে থাকেন। এঁরা প্রগতিশীল না হয়ে প্রগতির পরিপন্থী হন।

আগেই বলেছি কর্ম্ম কল্যাণকর না হলে তাকে প্রগতি বলা চলে না। যে নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে, সে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার বিদ্যাও আয়ত্ত করতে পারবে। প্রগতির পথে চলাও তার পক্ষেই সহজ।

১৭। রন্ধনশালায় নারী*

বাঙ্গালী মহিলার জীবনে রান্নাঘর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অপরাহ্নের সামান্যতম অবসর বাদ দিলে তাকে প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এমন কি অনেক পরিবারে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্তও রান্নাঘরে কাটাতে হয়। আধুনিক শিক্ষিত পরিবারে অনেক তরুণীরা রান্নাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে বিরক্ত অনুভব করেন এবং অশিক্ষিত দাসদাসীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালী-সমাজের দৈহিক অবনতির যতগুলি কারণ আছে, এটিও তাদের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ। নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি ও প্রাণের দরদ দিয়ে সামান্য পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে গৃহস্থ মহিলারা যেভাবে পরিবারের সকল লোককে পরিতৃপ্ত করতে পারেন, ঝি-চাকরের দ্বারা তার সামান্যতম অংশও পূর্ণ হয় না। রান্নাঘরে ঝি-চাকরের প্রতিপত্তিতে না আছে প্রাণ না আছে তৃপ্তি।

পরিবারের সকলের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও প্রসাধনের মতই রান্নাঘরের দিকেও শিক্ষিতা মহিলাদের দৃষ্টি আরোপ করা উচিত।

পরিবারের কর্ণধার যেমন সকলের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্য আপনার শরীর ও প্রাণপাত করে চলেছেন, তেমনি পরিবারের সকল লোকেরই উচিত তাঁর দিকে কর্ত্তব্যপূর্ণ দৃষ্টি জাগ্রৎ রাখা। সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, ঐ একজনের কর্ম্মক্ষমতার উপরই সমস্ত সংসার নির্ভর করছে। তাই তাঁর শরীর, মন প্রভৃতি যাতে সুস্থ থাকে, তার প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

এই সমস্ত পরিবারে নারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ করে আহারাদির দিকে তাদের কতদূর সজাগ থাকা উচিত, সেই বিষয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব। "বাঁচবার জন্যই খেও, খাওয়ার জন্যই বেঁচ না।" এই প্রবাদ বাক্য থেকে স্পষ্টই খাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। উদর-পূর্ত্তিই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

* "আনন্দবাজার পত্রিকা" (৯ই বৈশাখ, ১৩৬৩ সাল) হইতে গৃহীত।

বাঁচবার জন্য, সত্যিকার জীবনীশক্তি নিয়ে পৃথিবীর কাজ করার জন্যই আহারের প্রয়োজন। তাই আহার্য্য দ্রব্য পরিবেশন ও গ্রহণের বিশেষ কতকগুলি ধারা আছে।

অনেক পরিবারেই শুনতে পাওয়া যায়, পরিবারের কর্ত্তা আজ না খেয়ে অথবা গত রাত্রের বাসি খাবার কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজে অফিসে রওনা হয়েছেন। কারণ অন্বেষণ করলে জানা যায় অনেক কিছু। হয়ত বা সময়মত বাজার এসে পৌঁছয়নি, অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় বা ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় খুব চেষ্টা করেও সমস্ত রান্না সময়মত সম্পন্ন করা যায় নি। অসুস্থতা বা অনুরূপ কোন জরুরী কাজের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক স্থানে আলস্য এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতাও এর জন্য দায়ী। কোর্ট-কাছারী, অফিস এবং স্কুল-কলেজের যাত্রীদের সময়মত স্নান-আহার করিয়ে নিয়মিত কাজে রওনা করিয়ে দেওয়া পরিবার-কর্ত্রীর একটা বিশেষ দায়িত্ব হওয়া উচিত। যার যে সময় রওনা হওয়ার কথা, তার অনেক আগেই রান্না সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। হাতের কাছেই কর্ম্মস্থল পাওয়া যায় না বা সকলের ভাগ্যে মোটরগাড়ী জোটে না। অল্প বিস্তর সকলকেই হাঁটতে হয় এবং ট্রেনে, ট্রামে, বাসে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে এবং ঝুলে ঝুলে জীবন বিপন্ন করে চাকুরীস্থলে পৌঁছিতে হয়। দেরী হলে লাল কালির দাগ পড়ার, মাইনে কাটার এবং বড়বাবুর কটু কথা শোনার সম্ভাবনা থাকায় যাত্রাকালে অফিস-যাত্রীদের কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। এ-হেন অবস্থায় পেটে কম ভাত পড়লে সারাদিন তার কি অবস্থা হয়, তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া সময় অভাবে উত্তপ্ত কতকগুলি খাদ্য মুখ পুড়িয়ে গোগ্রাসে গিলে ছোটার ফলও অতীব ভয়ঙ্কর। দুই একদিনে এই বিষক্রিয়ার ফল উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু যাকে বাকী জীবন এভাবেই চলতে হবে, তার ভবিষ্যৎ যে কতখানি বিষাদময় তা অনেক অফিস-যাত্রীই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবারের লোকেরা তিলে তিলে অনুভব করছেন। দুরারোগ্য রোগে ক্রমেই জীবনীশক্তি হারিয়ে চাকুরে সংসারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে আনেন। নির্দ্ধারিত সময়ের অল্প কিছুকাল আগে রান্না সম্পন্ন করতে পারলে, ধীরে-সুস্থে কম বা বেশী না খেয়ে রুচিমত এবং পরিমাপ-মত আহার করা যায় এবং আহারের পর বেশ কিছু বিশ্রাম নিয়ে ধীরে ধীরে রওনা হওয়া সম্ভবপর হয়; এই ব্যবস্থা পরিবার-কর্ত্তার পক্ষে যখন স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবার-কর্ত্রীর পক্ষেও তেমনি তৃপ্তিদায়ক। সমস্তদিন চাকুরে যেমন অভুক্ত না থেকে প্রফুল্ল মনে আপনার কাজ করতে পারেন, বাড়িতে মহিলারাও তেমনি মানসিক উদ্বেগ না রেখে নিশ্চিন্তে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

চাকুরেদের সকালে এই খাওয়াটা শুক্ত, চচ্চড়ি, ডাটা প্রভৃতি দিয়ে রাশিকৃত না করাই উচিত। কারণ, ওগুলো খেতে ভাল লাগলেও সময় বেশী লাগে। সে ধরণের সময় অনেকেরই হাতে থাকে না। তাই অবস্থানুযায়ী মাছ, ডাল, ভাজা, তরকারি প্রভৃতি সাধারণ খাবারের ব্যবস্থাই উপযুক্ত। এই খাবারগুলি সব সময়ই লঘুপাক হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাত্রে অথবা ছুটির দিনে আমোদ-আহ্লাদ করে সবাই মিলে নতুন কোন আহার্য্য গ্রহণ করা আনন্দদায়ক।

বিদ্যাশিক্ষার মত রান্নাও বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা করতে হয়। সঙ্গীত-পিপাসুকে গান শুনিয়ে যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, নিজ হাতে প্রস্তুত নূতন নূতন খাবার খাইয়েও অনুরূপ আনন্দ পাওয়া যায়। যত্নসহকারে ধীরে ধীরে চেষ্টা করলে অতি অল্প সময়েই একজন পাকা রাঁধুনী হওয়া যায়।

রোজ একই রকম খাবার খেতে খেতে মুখে অরুচি আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই বাড়ির মেয়েদের উচিত নূতন নূতন খাবার তৈরি শিক্ষা করা।

রান্নাঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারে এই ঘরটি অন্যান্য ঘর অপেক্ষা অনেক অযত্নে থাকে; ঝুল, কালি, কয়লা, ঘুঁটেতে এর রূপটি অতীব কুৎসিত। তাছাড়া তরিতরকারীর খোসা, ভাতের ফেন প্রভৃতি দ্বারা এর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত নোংরা

করে রাখা হয়। এ কাজটি করা মোটেই উচিত নয়, কারণ প্রত্যেকটি জিনিসের পরিচ্ছন্নতা পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে থাকে।

আহার পরিবেশনকালে রাঁধুনীকে অনেকভাবে সংযত থাকতে হয়। কোন প্রকার উত্তেজিত বা বিরক্তির ঘটনাও খাওয়ার সময় উত্থাপন করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানাপ্রকার সাংসারিক জটিল সমস্যা খাবার সময়ই আলোচনা করা হয়। ফলে অশান্ত মন নিয়ে খাওয়ার দরুণ পরিপাকক্রিয়ার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে থাকে এবং অন্যমনস্কতার জন্য জিভেতে কামড় লাগা, গলায় খাবার বেধে যাওয়ার বিপদ ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশী। তা ছাড়া তর্কের জন্য খাবার সময় বেশী কথা বলায় আহার্য্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয় না এবং হজম ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

এই তো গেল পুরুষদের আহারের প্রতি নারীদের কর্ত্তব্যের কথা। নারীদের নিজেদের প্রতিও তাঁদের অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাঁরা এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বা স্বাস্থ্যপ্রদভাবে সংসারের প্রতিটি কাজ করবেন, যাতে তাঁরা নিজেরাও প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে আনন্দ পান, শক্তি পান। নিজের বুদ্ধির দোষে বা অশিক্ষার জন্য এমন কুসংস্কার অনুসরণ করবেন না, যাতে তিনি নিজে ক্রমে ক্রমে হীনবল হয়ে অভাবের সংসারে সমস্যা বাড়িয়ে তোলেন। অবসরমত বিশ্রাম লওয়া, লঘু হাসি-ঠাট্টায় অংশ গ্রহণ করা, বাড়ীর বাইরে বেড়ান, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করা, সময়মত স্নান-আহার করা এবং সংস্কৃতিগত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা উচিত। উৎকৃষ্ট সাহিত্যপাঠ নারীজীবনের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে নারী তাঁর জীবনশক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের রুচি অনায়াসেই বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

১৮। নারী-সমস্যা*

আজ তোমাদের কাছে মেয়েদের সমস্যা সম্বন্ধে বলব: মানুষ যত প্রাচীন এ-সমস্যাও তার বাহ্যরূপে ততই প্রাচীন, কিন্তু মূলে গেলে তা আরও বেশী প্রাচীন। আর যে বিধি সে সমস্যার নিয়ন্ত্রণ করে ও তার সমাধানের সন্ধান দেয়, তাকে জানতে হলে যেতে হবে বিশ্বসৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিরও বাহিরে।

প্রাচীনতম ঐতিহ্যধারার কোথাও কোথাও, সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীনগুলিতেই বলা হয়েছে যে বিশ্বসৃষ্টির হেতু হল নিজেকে বাহিরে বস্তুভূত প্রকট করে দেখবার জন্য সেই একম্ সৎ এর ইচ্ছা; তার এই আত্ম-বিসৃজনের প্রথম ধাপ হ'ল চিৎশক্তির আবির্ভাব। তাই প্রাচীন সব ঐতিহ্য বলে থাকে যে, পরাৎপর হলেন পুরুষ এবং চেতনা স্ত্রী—এই রকমে সূত্রপাত প্রথম বিভেদের, সূচনা লিঙ্গভেদের; আর এই রকমেই এল নারীর আগে পুরুষের স্থান বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে যদিও দুজনে এক, অভিন্ন এবং যুগপৎ অস্তি, তবু পুরুষ প্রথমে সিদ্ধান্ত করলেন এবং তারপর প্রকৃতিকে প্রকট করে ধরলেন সে-সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে। এর অর্থ প্রকৃতি ছাড়া সৃষ্টি নেই, আবার কারণ হিসাবে পুরুষের ইচ্ছা ছাড়া প্রকৃতির প্রকাশ নেই।

* "শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বর্ত্তিকা" হইতে গৃহীত।

অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায় এই ব্যাখ্যা একান্ত মানুষী রচনা কিনা। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, যে ব্যাখ্যাই মানুষ দিক—অন্ততঃ তার প্রকাশের ভঙ্গিতে তা সর্ব্বদা মানুষী ভাবের হতে বাধ্য। ব্যক্তিবিশেষ অজ্ঞেয় এবং অচিন্ত্যের দিকে তাঁদের আধ্যাত্মিক উত্তরণে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন মানুষী প্রকৃতিতে একটা অপূর্ব্ব ও প্রায় অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধির মধ্যে যুক্ত হয়েছেন লক্ষ্যের সঙ্গে। কিন্তু যখন তাঁরা চেয়েছেন অপরেও সেই আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হোক, তখন জিনিসটিকে ভাষায় বাঁধতে হয়েছে, বোধগম্য করে তুলতে গিয়ে মানুষী করেই ধরতে হয়েছে, প্রতীকের আশ্রয়ে ধরতে হয়েছে।

কথা তোলা যেতে পারে আবহমানকাল ধরে নারীর উপর পুরুষ যে আশা পোষণ করে আসছে তার শ্রেষ্ঠত্ববোধ, তার জন্য কি দায়ী নয় এই সব অভিজ্ঞতা এবং তাদের বর্ণনা ? কিম্বা এত ব্যাপক বিস্তৃত যে শ্রেষ্ঠতাবোধ তাই জন্ম দিয়েছে এসব অভিজ্ঞতার সূত্রকে ?

মোটের উপর, মূল কথাটি তবু অবিসম্বাদী : পুরুষ নিজেকে ভাবে শ্রেষ্ঠ এবং চায় প্রভুত্ব করতে, নারী নিজেকে বোধ করে নিপীড়িত এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে করে বিদ্রোহ ; যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই নরনারীর দ্বন্দ্ব—নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ হলেও তার মূলে এই একই জিনিস।

অবশ্য পুরুষ সব দোষ চাপায় নারীর উপর, আর ঠিক তেমনি ভাবেই নারী সব দোষ চাপায় পুরুষের উপর ; প্রকৃতপক্ষে দু'জনেরই পাওয়া উচিত সমান দোষের ভাগ এবং কেউই অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। তাছাড়া যতদিন না এই ছোট আর বড়র চিন্তা মন থেকে মুছে যায় ততদিন এই যে অবোঝাবুঝি দুই পক্ষকে ঠেলে দিয়েছে দুই বিরুদ্ধ দলে, তার অবসানও নেই, সমস্যারও সমাধান নেই।

সমস্যাটি নিয়ে এত কথা বলা হয়েছে, এত কথা লেখা হয়েছে, এত বিভিন্ন দিক থেকে তার বিচার হয়েছে যে, সে সব কথা পুরোপুরি বলতে গেলে একখানি বইতেও সঙ্কুলান হবে না। মোটের উপর তত্ত্ব সব খুবই সুন্দর অন্ততঃপক্ষে সবই মূল্যবান তারা ; তবে কার্য্যতঃ ঠিক ততখানি সার্থক নয় ; বাস্তব লাভের দিক থেকে বলা চলে না আমরা সেই প্রস্তরযুগ ছাড়িয়ে খুব বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছি। কারণ পারম্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে নরনারীর সমান দুরবস্থা—প্রভুত্ব করেছে একজন, আর অন্যজনের দাসত্ব একটু শোচনীয় ত বটেই।

দাস ছাড়া আর কি, কারণ—লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য থাকলে তাদের দাস হতেই হয়, আবার যাদের উপর নির্ভর করে সে-সব ভোগসুখের চরিতার্থতা, তাদেরও দাস হতে হয়।

এই রকমে নারী পুরুষের দাসী—কারণ, তার আসক্তি পুরুষ ও তার বলবীর্য্যের প্রতি, কারণ—সে চায় একখানি নিশ্চিন্ত নীড়ে আশ্রয়, সর্ব্বোপরি রয়েছে তার মাতৃত্বের লোভ ; অন্যদিকে পুরুষও তেমনি আবার নারীর দাস, হেতু তার অধিকার-প্রবৃত্তি, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের স্পৃহা, যৌন সম্বন্ধের প্রতি আকর্ষণ আর বিবাহিত জীবনের ছোটখাট সুখ-সুবিধার উপর তার আসক্তি।

তাই কোন আইন-কানুন নারীকে মুক্তি দিতে পারে না, যদি না সে নিজেই নিজেকে মুক্ত করে ; তেমনি পুরুষেরাও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবে তখনই, যখন ভিতরের সব দাসত্ব থেকে নিজেকে ছাড়াবে।

একটা প্রচ্ছন্ন কঠিন সংগ্রামের অবস্থা সর্ব্বদাই রয়েছে অবচেতনার স্তরে—এমন কি, শ্রেষ্ঠ যারা তাদের মধ্যেও ; এরকম ঘটা অনিবার্য্য যদি না মানুষ সাধারণ চেতনার ঊর্দ্ধে উঠে যায়, পূর্ণ চেতনার সঙ্গে মিশে যুক্ত হয়ে যায়, পরম সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়। কারণ—ঊর্দ্ধচেতনা লাভ হলে দেখা যায়, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য শুধু দেহগত।

বস্তুতঃ হতে পারে, পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম দিকে ছিল একটী শুদ্ধ নর ও একটী শুদ্ধ নারীর রূপ—উভয়ের ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং পরিষ্কার পার্থক্য ; তারপর কালে গতি-প্রবাহের সঙ্গে নানা মিশ্রণের ফলে

ভারতের নারী

পুরুষানুক্রমে ধারার প্রভাবে সব ছেলেরা তাদের মাতার সাদৃশ্য পেল সব মেয়েরা পেল তাদের পিতার সাদৃশ্য। সামাজিক উন্নতিকল্পে একই রকম কাজ প্রভৃতির ফলে আজ আর সেই আদি রূপটাকে চেনাই যায় না; বহু পুরুষ বহু ভাবে, গুণে মেয়ের মতো, বহু মেয়ে বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বহুভাবে গুণে পুরুষের মতো। তবে দুঃখের বিষয়, শারীরিক আকৃতির দরুণ এই কলহের অভ্যাস আর গেল না বরং প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তির ফলে বেড়েই চলল বোধ হয়।

মানসিক অবস্থা ভাল যখন তখন নর ও নারী উভয়েই ভুলে যায় এই যৌন বিভেদ। তবে সামান্য উত্তেজনায় তা আবার দেখা দেয়—নারী বোধ করে সে নারী, পুরুষ বোধ করে সে পুরুষ, আবার শুরু হয় অন্তহীন কলহ—কখনো এ রূপে কখনো ও রূপে, খোলাখুলি অথবা প্রচ্ছন্নভাবে, আর সম্ভবতঃ যত প্রচ্ছন্ন ততই মর্ম্মান্তিকভাবেই। মনে হয়—এধারা চলবে সেদিন পর্য্যন্ত যেদিন পুরুষ ও নারী বলে কিছু থাকবে না, থাকবে যৌনলাঞ্ছনামুক্ত দেহের আধারে আদি ঐক্যকে প্রকট করে জীবন্ত আত্মা সব।

তাই তো আমরা স্বপ্ন দেখছি সেই পৃথিবীর—পরিশেষে সেখানে সব বিরোধের হবে অবসান, যেখানে দেখা দেবে সেই মানব যে হবে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমূহের সমন্বয়, নিজের একীভূত চেতনা ও কর্ম্মের মধ্যে মিলিয়ে ধরবে ভাবনা ও ক্রিয়াকে দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে।

সমস্যাটির এই সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান যতদিন না হয় ততদিন যে ভারত এবিষয়ে, অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ের মতো, মনে হয় দারুণ বিষম বৈপরীত্যের দেশ, সে-ই এনে স্থাপন করতে পারে এক বৃহৎ ও সর্ব্বগ্রাহী সমন্বয়।

ফলতঃ ভারত নয় কি সে দেশ যেখানে দেখি বিশ্বসৃষ্টিকারিণী, অসুরনাশিনী, সকল দেবতার সর্ব্বলোকের জননী সর্ব্ববরদাত্রী পরাশক্তি মায়ের উদ্দেশ্যে উঠেছে নিবিড়তম ভক্তি, পরিপূর্ণ পূজা আরাধনা।

এই ভারতেই আবার দেখি না কি নারীত্বের প্রতি তীব্র ঘৃণা—তারই নাম প্রকৃতি, মায়া, দুষ্টা ছলনা, সকল পতন ও দুর্গতির হেতু সেই প্রকৃতিই এনে দেয় ভ্রান্তি, মালিন্য, সেই ভগবানের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় দূরে।

ভারতের জীবন আদ্যন্ত এবং বৈপরীত্য ভরা; তারই ফলে অন্তরে ও চেতনায় তার বেদনার ভার; কত দেবীর কত মন্দির এখানে; এখানে দেবী দুর্গার কাছে তার সন্তানরা আশা করে তাদের সিদ্ধি ও মুক্তি; আবার এদেশেরই একজন বলেনি কি যে নারীদেহে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন না কখনো কারণ সেক্ষেত্রে কোনো বুদ্ধিমান ভারতীয় তাঁকে চিনতে পারবে না। সুখের বিষয় ভগবানের উপর এমন সঙ্কীর্ণ মনের এমন হীন ধারণার প্রভাব পড়ে না। তিনি যখন মানুষী তনু ধারণ করতে চান তখন কেউ চিনুক না চিনুক সে চিন্তা বিন্দুমাত্র তাঁকে বিচলিত করে না। অধিকন্ত যতবার তিনি এসেছেন এই এখানে মর্ত্যলোকে, ততবার মনে হয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের চেয়ে সরল শিশু এবং সহজ অন্তরকেই বেশি সমাদর দেখিয়েছেন।

একটা নূতন চিন্তা একটা নূতন চেতনা যতদিন না প্রকৃতিকে বাধ্য করে সৃষ্টি করতে এক নূতন শ্রেণীর জীব, যারা প্রজননের পাশব উপায় থেকে মুক্ত হবে, যারা যুগল যৌনসত্তা হিসাবে থাকবে না ততদিন সর্ব্বত্র সকল ক্ষেত্রে বর্ত্তমান মানবজাতির উন্নতির জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হবে এই দুই শ্রেণীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, তাদের দেওয়া একই শিক্ষা একই অনুশীলন, শেখানো সকল যৌন বিভাগের উর্দ্ধে স্থিত এক ভাগবত সত্যের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের মধ্য দিয়ে সব সম্ভাবনা, সব সুসঙ্গতির উৎসকে কি রকমে লাভ করা যায়।

মনে হয় বৈপরীত্যের দেশ ভারত নূতন ভাবের জন্ম দিয়েছে যেমন, তেমনি নূতন সিদ্ধিরও হবে অগ্রদূত।

১৯। ভারতের নারী

ভারতের ধূলি-কণা, ভারতের বায়ু-বহ্নি-বারি,
পূত করি' ভারতের নারী—
গৌরবের সিংহাসনে বিজয়িনী ছিলে অধিষ্ঠিতা,
স্নেহ, প্রেম, করুণায় শান্তিময়ী বিশ্বের পূজিতা !
শমন চমকি' গেছে তোমার সে দীপ্ত মহিমায়
জীবন্ত ভাষায়
লেখা তার ইতিহাস আজো সেই গাঙুড়ের জলে
গভীর কাম্যকবনে অন্ধকার ছায়া-তরুতলে।
তুমি ছিলে ভারতের সাধ্বী সতী, দময়ন্তী, সীতা,
অয়ি সুচরিতা !
মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত
আপনার গৃহ-রাজ্যে শৃঙ্খলায় অতন্দ্র নিয়ত ;
ছিলে তুমি শক্তিময়ী—ওগো রাজরাণী !
তোমারি সে বাণী
ছিল আজ্ঞা, উপদেশ, সান্ত্বনা ও প্রীতি-সম্ভাষণ,
নারীত্ব ও মাতৃত্বের কি অপূর্ব্ব মধুর মিলন !
তোমারি পবিত্র অঙ্কে করি তব বক্ষঃসুধা পান,
তোমারি সন্তান
কত সূরি, শিল্পী, কবি, বিশ্বজয়ী কত মহাবীর
তোমারি গৌরব বহি' পায়ে আসি নোয়ায়েছে শির
সে গৌরব দলি' দুটি পায়—
উন্মাদিনী ওগো নারী আজ তুমি চলেছ কোথায় !
তুষার-মণ্ডিত-শির উচ্চ-গিরি-শিখরের মত,
তুমি চলিয়াছ ধারা-নির্ঝরের প্রবাহে নিয়ত—

নিভৃত সে গুহার অঞ্চলে,
স্নেহময় অন্তঃপুর-তলে !
ধ্বসিয়া পড়িতে চাও সেই তুমি কিসের আশায়,
কিসের কাঙ্গাল তুমি মত্তা আজি কোন্ মদিরায় ?
স্বর্গ-চ্যুতি হেরি তব আজ
কত ক্ষোভ, কত লজ্জা জেগে ওঠে মরমের মাঝ !
ভবিষ্যের শিশু কাঁদে, স্নেহহারা গৃহের মাঝার ;
তুমি নির্ব্বিকার—
বিশ্ব জয়ে চলিয়াছ—মোহ ঘন অন্ধকার পথে,
ভাসায়ে গৃহের শান্তি অশান্তির দুর্নিবার স্রোতে ।
কোন্ বাঁশী আজ তোমা গৃহ হ'তে পথে নিল টানি,
ভেবেছ কি একবার হে জননি, বিশ্বের কল্যাণী !
সংসারের নিত্যকর্ম্মে, পুরুষের প্রতিযোগিতায়
এত ব্যগ্র কেন তুমি হায় !
হোক সে গো মহাশক্তিমান্
তুমি কেন ভুলে গেলে হায় নারী সে তোমারি দান ।
বিশৃঙ্খল গৃহাঙ্গনে জমে ওঠে অযত্ন জঞ্জাল,—
স্নেহ সে শুকায়ে গিয়ে আজি শুধু হয়েছে কঙ্কাল ;
লক্ষ্মীর সিন্দুর ক্ষোভে ম্লান হ'য়ে আসিছে কৌটায়,
মঞ্জরী ব্যথায় ঝরে দীপহারা তুলসী-তলায় !
গৌরবের মায়া-মরীচিকা—
তোমারে পরালো আজি অগৌরবে একি রজোটীকা ।
বুঝিবে না তবু নারী, অভিযানে মত্তা জয়রথে,
কি হারায়ে কি পেয়েছ আজিকার প্রগতির পথে ?

২০। কয়েকটী পরীক্ষিত টোট্‌কা ঔষধ

(কবিরাজ · আচার্য্য শ্রীইন্দুশেখর তর্কাচার্য্য, ন্যায়-তর্কতীর্থ)

আগুনে পোড়ায় ঃ—১। চূণসহ নারিকেল তৈল ফেনাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইবে। ২। পুড়িবামাত্র কেরোসিন তৈল দিলে ফোস্কা বা ঘা হয় না ; জ্বালাও তৎক্ষণাৎ দুর হয়। ৩। পোড়ার ঘায়ে কাঁচাদুধের পটী দিলে জ্বালা দুর হয় ; ক্ষত হইলে শুকাইয়া যায়। ৪। ডিমের সাদা অংশ পোড়ার ঘায়ে লাগান ভাল।

কাটিয়া যাওয়ায় বা রক্তপাতে ঃ—১। আয়াপান (বিশল্যকরণী) পাতা চটকাইয়া তাহা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলেও রক্ত বন্ধ হয়। ২। বরফ লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হয় ৩। গাঁদা ফুলের পাতা পিষিয়া বাঁধিলে রক্ত বন্ধ হইবে। ৪। দুর্ব্বা বা আপাং পাতার রস লাগাইলে রক্তপতন বন্ধ হয়।

ক্ষতে ঃ—যষ্টিমধু ও তিল একত্র পেষণ করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত পুরণ হইয়া শুকাইয়া যায়।

মচ্‌কান বা থেৎলান ব্যথায় ঃ—চুণ ও হলুদ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। আদা ও সজিনার ছাল পেষণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনা থাকে না। ৩। ঠাণ্ডা জলে বা বরফে স্থানটির বেদনা কমাইয়া দেয়।

কাঁটা, লোহা বা সূচ বিঁধিলে ঃ—১। কাঁটা তুলিয়া সেই স্থানে লবণ দিয়া রাখিবে। ২। গরম চুণ লাগাইলেও ব্যথা থাকে না। ৩। লবণের গরম সেক দিলেও অনেকটা শান্তি হয়।

কীটাদির দংশনে ঃ—১। মৌমাছি কামড়াইলে মধু দিয়া সেইস্থানে গরম লাগাইবে। ২। বোল্‌তা কামড়াইলে সরিষার তৈল বা কেরোসিন তৈল লাগাইবে। ৩। বিছা কামড়াইলে সদ্য গোবর গরম অবস্থায় লাগাইবে। চুণ ও লেবুর রস লাগাইলেও যন্ত্রণা সমূলে নষ্ট হয়। ৪। শুয়াপোকা লাগিলে ছুরি দিয়া ঘষিয়া চুণ লাগাইলে যন্ত্রণা থাকে না। ৫। বকুল বীচি ঘষিয়া চন্দনবৎ করিয়া প্রলেপ দিলে যে কোন কীটদষ্ট যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দুর হয়। সিংমাছ কাঁটা দিলে কাঁটানটের পাতার রস লাগানমাত্র যন্ত্রণা কমিয়া যায় [কাঁকড়া বিছা কামড়াইলে তোগ্‌লা পাতা পুড়াইয়া উহার ছাই ক্ষতস্থানে দিবামাত্র যন্ত্রণা দূর হয়।—সম্পাদক]

কুকুর বা শিয়াল কামড়াইলে ঃ—ইক্ষুগুড় খুব খাইবেন এবং ঘৃতপক্ক নিরামিষ তিন সপ্তাহ খাইবেন। শাক-অম্বল না খাইলে অবশ্য আরোগ্যলাভ করিবেন। ইহা বহু পরীক্ষিত।

বিষ খাইলে ঃ—প্রথমেই বমন করাইবে, নিদ্রা যাইতে দিবে না। ১। লবণজল তামা জলের সঙ্গে দিলে বমি হয়। লবণজল বা কলমীশাকের রস পান করাইলে বমন হয়। ২। ১ রত্তি

ভুঁতে চূর্ণ পুরাতন তেঁতুল ভিজান জলে কিছু চিনি দিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া যাইবে। ৩। স্বর্ণভস্ম ও মকরধ্বজ ১ মাত্রা দেওয়া ভাল। [তেঁতুল ও গোবর জল পান করিলে বিষ কাটিয়া যায়।—সম্পাদক]

সর্ব্বাঙ্গ-বেদনাযুক্ত নবজ্বরে :—সমপরিমাণে বেলপাতা ও আদার রস ১ ছটাক সৈন্ধব লবণসহ প্রাতে ও সন্ধ্যার খাইবে।

জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে :—কয়েক ফোঁটা আদার রস নাকের ভিতর দিলে মূর্চ্ছা থাকে না।

জ্বররোগীর হিক্কায় :—১। শুটচূর্ণ ও সৈন্ধব জলে গুলিয়া ৫ ফোঁটা নাকে দিলেই হিক্কা নষ্ট হইবে। শশার রস খাওয়াইলে হিক্কা ভাল হয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

জ্বররোগীর কাসে :—বাকসপাতার রস ২ তোলা ও বচচূর্ণ ৵০ আনা মধুর সহিত খাইলে অবশ্যই কাস নষ্ট হয়।

সর্দ্দিজ্বরে :—দ্রোণপুষ্প (দণ্ডকলস) পাতার রস ৫।৬ ফোঁটা গরম জলে দিয়া পান করিবে। ১ ঘণ্টার মধ্যেই সর্দ্দি নিঃসরণ হইতে থাকিবে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে :—তুলসীপাতার রস ১ তোলা ও বেলপাতার রস ১ তোলা মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ১ সপ্তাহ পান করিলে শরীরের ব্যথা ও জ্বর থাকে না।

আমাশয়ে :—রাত্রে চূণের জলে হলুদচূর্ণ দিয়া খাইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে। ২। নবোদ্গত পেয়ারার পাতা অর্দ্ধেক, আদা সিকি, চিনি সিকি, পূর্ণমাত্রায় ১ তোলা সকালে ২ দিন খাইবে। ৩। থানকুনি পাতা, কচি ঠোঁটে কলার সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

ক্রিমিতে :—১। আনারসের কচি পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক মধুর সহিত সেবন করিলে তিন দিনেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবে। ২। বিড়ঙ্গের ভিতরের সাদা অংশ ৵০ ও যষ্টিমধু অর্দ্ধ-তোলা রাত্রে শীতল জলে গুলিয়া খাইলে ক্রিমির কুল নষ্ট হয়।

যকৃতের দোষ বা কামলা রোগে :—১। ১ সপ্তাহ পটল পাতার রস ১ ছটাক মধুর সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ২। কাঁচা হলুদের রস কামলার খুব উপকারী।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে :—দূর্ব্বার রস বা পিঁয়াজের রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিবে।

হাঁপানি রোগের :—বচচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিলে সাময়িক অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়।

বমনের :—১। হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত চাটিলে বমি আর হয় না। ২। খালি পেটে বমনে—চিঁড়া বা মুড়ি-ভিজান জল পান করিলে বমি বন্ধ হয়।

বাতব্যাধিতে :—১। বেলপাতার রস ১ তোলা, নিশিন্দা পাতার রস অর্দ্ধ-তোলা ও আদার রস অর্দ্ধ-তোলা, সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৭ দিন পান করিতে হইবে ও পীড়িত স্থানে তারপিন তৈল বা পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া নেকড়ার উপর ভেরেণ্ডা পাতা পাড়িয়া তাহাতে গরম বালি ঢালিয়া পুঁটুলি করিয়া গরম গরম সেক দিবে। দু' দিনেই পক্ষাঘাতে পর্য্যাপ্ত উপকার পাওয়া যায়। নিশিন্দা পাতা গরম করিয়া যে-কোন ফুলার উপর রাখিয়া গরম কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। দিনে ৪।৫ বার দিলে একদিনেই সকল উপসর্গের উপশম হইবে।

।-যকৃৎবৃদ্ধিতে :—শুষ্ক মূলা, গুলঞ্চ ও কলমীশাকের রসে দেওয়ালের চূর্ণ ৵০ আনা ও নীল /০ আনা গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। সন্ধ্যায় কালমেঘের পাতার রস অর্দ্ধ-ছটাক মধুর সহিত পান করিবে। প্রাতে গোবৎসের চনা ৭ দিন সেবন করিবে।

শোথে :—আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার কাথ সেবন করিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

কর্ণরোগে :—কর্ণে উৎকট বেদনা হইলে, কানের ভিতর দপ্‌, দপ্‌, করিতে থাকিলে একটী কলিকায় আগুন দিয়া উহার উপর গুগ্‌গুল রাখিয়া অন্য একটী কলিকা তাহার উপর স্থাপন করিবে। ইহাতে ছিদ্রপথে ধুম নির্গত হইতে থাকিবে। সেই ধুম কর্ণরন্ধ্রে ২।১ বার লাগাইলে যত অসহ্য বেদনাই হউক না কেন মুহূর্ত্তেই উপশম হইবে।

চক্ষুরোগে :—১। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে রক্তচন্দন ঘষিয়া তাহাতে কর্পূর দিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিবে। শুকাইয়া আসিলেই আবার প্রলেপ দিবে। ৮।১০ বার দিলে একদিনেই চক্ষু পরিষ্কার হইবে ও যন্ত্রণা থাকিবে না। ২। পরিষ্কার রেড়ীর তৈল ২।১ বিন্দু চোখে দিলেও উপকার হইবে, জল পড়িবে না। ৩। ত্রিফলার জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে। ৪। ফট্‌কিরি জলে গুলিয়া সেই জলে চক্ষু ধৌত করিলে যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া যায়।

দন্তরোগে :—১। দাঁতের পোকায় বড় পানার শিকড় চিবাইয়া পোকা-দাঁতের গোড়ায় রাখিলে পোকা মরিয়া যায় ও বেদনা নষ্ট হয়। ২। দাঁতের বেদনায় ভেরেণ্ডার রসের চারি আনা, ফট্‌কিরি দিয়া গরম গরম দাঁতের গোড়ায় প্রলেপ দিতে হইবে। প্রত্যক্ষ কাজ করিবে।

ফোড়ায় :—১। ভেরেণ্ডা বীজ দুধের সহিত বাটিয়া ফোড়ায় লেপন করিলে পাকিবেই। ২। ময়না ফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। দ্রোণফুলের পাতা চূণের সহিত বাটিয়া লাগাইলে ফোড়া বসিয়া যায়। ৪। তেলাকুচা পাতা চিনিসহ বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায়। ৫। সাবানের ফেনা ও চূণ ফোড়ার উপর পানের বোঁটা দ্বারা ফোঁটা দিলে সেই স্থানে মুখ হইয়া পুঁয বাহির হয়।

পাঁচড়ায় :—১। নিম ও বাসকের পাতা গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ৭ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। ২। কাঁচা হলুদের রস গুড়ের সহিত সকালে খাইতে হইবে। থুলকুড়ির পাতা প্রলেপ দিলে অতি সত্বর পাঁচড়া নষ্ট হয়। পাঁচড়া বা কাটা ঘায় ডালিমের কচিপাতা ও খয়ের সমান মাত্রায় লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

বসন্তে ঃ—১। সকল অবস্থায় ২ রতি মকরধ্বজ উচ্ছে পাতার রস ও মধুসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইবে। ইহাতে জ্বর, বসন্ত, ঘাম আরোগ্য হইবেই। ডাবের জলে ধৌত করিলে বসন্তের দাগ উঠিয়া যায়।

শয্যামূত্রে ঃ—তেলাকুচা পাতার রস চিনিসহ রাত্রে পান করিলে এ রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

মূত্রবন্ধে ঃ—১। ঘৃতে স্থলপদ্ম পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিবে। ২। জলে-পচা আমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ৩। তিসি ভিজান জল খাওয়াইবে। ৪। শ্বেত পপটি জলসহ তলপেটে প্রলেপ দেওয়া বা নাভিতে দেওয়া ভাল। ৫। বরফ ২ মিনিট তলপেটে রাখিলে ভিতরে মূত্র থাকিলে অবশ্যই বাহির হইবে। ৬। রজনীগন্ধার শিকড় বাটিয়া জলের কলসীর তলাকার মাটি সমপরিমাণ মিশাইয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই প্রস্রাব হইবে (তারাণ কবিরাজ)।

অর্শে ঃ—১। মাখন ও তিল-বাটা - অর্শে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। ২। আদা ও আমাদার রস ১ ছটাক কিছুদিন সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণা থাকে না। ৩। গরম জলে ফটকিরি চূর্ণ মিশাইয়া শৌচ করিবে। ৪। হরীতকী ও সাদা চন্দন পিষিয়া মলমের মত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিবে, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া বলি শুকাইয়া যায়। মলত্যাগ করিবার সময়ে আঙ্গুল দ্বারা ঘৃত বা তৈল বলির ভিতর বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলে যন্ত্রণাবোধ একেবারেই থাকে না।

খুসখুসি কাসে ঃ—১। গোলমরিচ ১০টী, মিছরি ২ তোলা সহ পিষিয়া কাসের সময়ে মুখে দিলে কাসের বেগ কমিয়া যায়। ২। লবঙ্গ পোড়াইয়া গরম গরম চিবাইয়া খাইলে খুসখুস কাসের সত্ত্ব উপকার হয়।

অরুচিতে ঃ—ক্ষুধা থাকিতেও আহারে বিদ্বেষ জন্মিলেই তাহাকে অরুচি বলে। আহারের পূর্ব্বে আদা কুচি করিয়া সৈন্ধব লবণসহ বেশ চিবাইয়া খাইবে। ইহাতে অগ্নি ও রুচি উভয়ই বৃদ্ধি হয়।

পিপাসায় ঃ—১। সুস্থ শরীরে দুধের সহিত গুড় মিশাইয়া পান করা ভাল। চিনি ও মিছরির সরবৎ পান করিলে পিপাসা একেবারে নষ্ট হয় না। ২। অসুস্থ শরীরে মৌরী-ভিজান জলে মিছরির সরবৎ করিয়া লেবুর অল্প অল্প রস দিয়া পান করিলে পিপাসার বেগ কমিয়া যায়। বরফ মুখে রাখিলে পিপাসা কমিয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতায় ঃ—১। দুধসহ কিশমিশ সিদ্ধ করিয়া চিনিসহ গরম গরম খাইলে পরিষ্কার বাহ্য হইয়া যায়। ২। ইসবগুলের ভূষি ও চিনি জলে গুলিয়া বা গরম দুগ্ধে গুলিয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে হইবে নচেৎ শক্ত হইয়া উঠিবে, ইহাতে উপসর্গবিহীন বাহ্যে হয়, আমের ব্যথা থাকে না। ৩। গরম-দুধের সহিত চা চামচের ২ চামচ যষ্টিমধুর চূর্ণ খাইলে বাহ্য পরিষ্কার হয়। ৪। ক্রুর কোষ্ঠের জন্য সোনামুখীর পাতা, কিশমিশ, জঙ্গীহরীতকী ও মিছরি সমপরিমাণে লইয়া ৵০ আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত পান করিলে শরীরের গ্লানি নষ্ট হয়।

কয়েকটী পরীক্ষিত টোটকা ঔষধ

শিরঃপীড়ায় ঃ—১। শ্বেতচন্দন কর্পূরের সহিত প্রলেপ দিলে খুব উপকার হয়। ২। উর্দ্ধশ্লেষ্মাগত শিরঃপীড়ায় শুষ্ক বকুলফুল-চূর্ণ দ্বারা নস্য গ্রহণ করিবে। দীর্ঘকালেরও যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ায় পুরাতন তেঁতুলের সঙ্গে সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়া গরম করিবে এবং হাতে সহ্য হয় এরূপ অবস্থায় বেশ গরম থাকিতেই কপালে লাগাইবে। ইহাতে মশার কামড়ের মতই একটু যন্ত্রণা বোধ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিবোধ হইবে।

অনিদ্রায় ঃ—শুষুনী শাকের রস ।।৷০ তোলা, চিনি ৷৷০ তোলা সহ খাইলে ঘুম হয়। ২। বায়ুর প্রকোপে অনিদ্রায় পায়ে সরিষার তৈল মালিশ করিতে হইবে, সন্ধ্যার সময় শরীর ভাল করিয়া গরম জলে মুছিয়া রাখিতে হইবে, মাথায় তিল তৈল দিতে হইবে, এবং আহারের পরেই অন্ধকার ঘরে নিদ্রার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে শিথিল মনে করিবে।

স্ত্রীরোগে

প্রদরে ঃ শ্বেত প্রদরে কাঁটানটের (কাঁটাখুরিয়া) রস ১।০ তোলা, যজ্ঞ ডুমুরের রস ১ তোলা মধুসহ খাইবে। ২। অশোক ছালের ক্বাথ ১ ছটাক মধুসহ খাইবে।

বাধকে ঃ—উলট কম্বলের মূল ।০ সিকি ও গোলমরিচ /০ আনা বাটিয়া প্রাতে শীতল জলসহ সেবনে বাধক বেদনা আরোগ্য হয়। রক্তজবা দুইটীর রস চিনিসহ খাইলেও বেদনার উপশম হয়।

সূতিকায় ঃ—মধ্যাহ্নে কাঁচকলা সিদ্ধ চিনির দ্বারা মাখিয়া ভাত খাইতে হইবে, সঙ্গে কাঁচকলার ঝোলও খাওয়া চলে। আহারের পরে লেবুর আচার খাইতে হইবে। রাত্রে, বার্লি, খৈ খাইতে হইবে - সঙ্গে কবিরাজী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মুথার রসও মধুসহ খাইলে খুব উপকার হইবে।

গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন ঃ—১। শরীর সুস্থ থাকিলে শীতল জলে স্নান করা উচিত। ২। নিয়মিত সময়ে পুষ্টিকর আহার করিবে, তাহাও অল্পপরিমাণে। ৩। আলস্য করিয়া বসিয়া না থাকিয়া সামান্য পরিশ্রম অবশ্যই করিতে হইবে, ভারী জিনিষ বা জলের কলস বহন না করাই ভাল। ৪। বাহ্য পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিবে। ৫। মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। ৬। অসময়ে বেদনা উপস্থিত হইলে সরিষার তৈল কর্পূর দিয়া পেটে মালিশ করিলে তখনই বেদনা কমিয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় আমাশয় ঃ—গাঢ় মিছরির সরবৎ /৷০ অর্দ্ধপোয়া ও ইসবগুলের পোসা ৷৷০ অর্দ্ধতোলা একত্রে মিশাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইলে প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন।

প্রসবকালীন নিয়মাবলী

১। পোয়াতীকে জোলাপ দিতে হইবে। সাবানের গরম জলে ডুস বা এরণ্ড তৈলের (আধুনিক ক্যাষ্টর অয়েল) ডুস দিবে।

২। সর্ব্বদাই গর্ভিণীকে প্রবোধ দিবে যে, সকলেরই এরূপ হইয়া থাকে, কোন ভয়ের কারণ নাই।
৩। পানিমুচি ভাঙ্গার পর পোয়াতীকে উঠিতে দিবে না।
৪। পরিষ্কার হস্তে প্রসবদ্বারে ঘৃত মালিশ করিয়া দিলে প্রসবের যন্ত্রণা বেশী হয় না।

বালরোগে

(বালকমাত্রেই শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু হয়, সেইজন্য বালকের সঙ্গে সাধারণের চিকিৎসা এক হইতে পারে না, সেই কারণে পৃথকভাবে ব্যবস্থা লিখিতেছি।)

মাই না ধরা ঃ—প্রথমে স্তনদুগ্ধ ঝিনুকে গালিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে। পরে মুখে মধু দিয়া মিষ্ট স্বাদ পাইলে স্তনে ১ ফোটা মধু দিয়া মাই ধরাইতে হইবে।

ঘামাচী ঃ—বরফ, শীতল জল বা শ্বেতচন্দনের প্রলেপে খুব উপকার হয়।

নাভি পাকিলে ঃ—অনেকেই নেকড়া পোড়াইয়া ছাই লাগান, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় অপকার হয়, বরং শ্বেতচন্দন পুরু করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে।

তড়কায় ঃ—প্রায়স্থলেই শিশু ধনুকের মত বেঁকিতে থাকে। ইহার একমাত্র উপায় মাথায় ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়া এবং খুব গরম জলের পাত্রে পা ডুবাইয়া রাখা। এস্থলে অস্থির হইলে চলিবে না, মাঝে মাঝে চক্ষুতে জলের ঝাপটা দেওয়া, জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ও কাঁদিলে মুখে মাই দেওয়া উচিত। লজ্জাবতীর লতার শিকড় গলায় লাল সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ উপসর্গ সকল আর দেখা যায় না।

সদ্যোজাত শিশুর জন্য ঃ—১। স্তন্য দিবার পূর্ব্বে স্তন জলদ্বারা ধৌত করা উচিত। ২। শিশুকে ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। ৩। শিশুর জিহ্বায় ঘা হইলে মুখে মধু দিয়া দিবে। ৪। শিশু কাঁদিলেই প্রস্রাব করিয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ বিছানা ভিজিয়া গেলে ঠাণ্ডায় তাহারা কষ্ট পায়। ৫। শিশুপালন বৃদ্ধাদের নিকট হইতে শিক্ষা করাই ভাল।

যকৃতে ঃ—প্রলেপ (গঙ্গাধর যোগ)—লেবুর রসে সৈন্ধব লবণ তামার পাত্রে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর যকৃতের ব্যথা নষ্ট হয়।

যে সব পার্থিব জিনিষ ব্যবহার করা হয় তাহাদের অযত্ন করা হল অজ্ঞতা ও অচেতনতার লক্ষণ।
যদি যত্ন না কর তা'হলে কোন জিনিষই ব্যবহার করার অধিকার তোমার নেই। ওর প্রতি তোমার কোন আসক্তি আছে বলে নয়, ভগবৎ চেতনার কোন একটা অংশকে প্রকাশ করছে বলেই তুমি সে জিনিষের যত্ন নেবে। শ্রীমা—(পণ্ডিচেরী)